# জাফরুল আমানী ফী নজরিত তাহাভী র.

(যুক্তির আলোকে বিতর্কিত মাসায়েল বা নজরে তাহাভী র.)

মাওলানা নো'মান আহমদ
মুহাদ্দিস জামি'আ রাহমানিয়া, ঢাকা

শিবলী প্রকাশনী
সাত মসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল ঃ ০১৭১৬৭৬২৩১২

# জাফরুল আমানী ফী
# নজরিত তাহাভী র.


মাওলানা নো'মান আহমদ

মুহাদ্দিস জামি'আ রাহমানিয়া, ঢাকা



প্রকাশক

শিবলী প্রকাশনী

সাত মসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭





প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই-২০০৬

মূল্য : ২৬০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান ঃ জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
(শিবলী প্রকাশনী)
সাত মসজিদ মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১১৩৬৯০, মোবা ঃ ০১৭১৬৭৬২৩১২
ই-মেইল ঃ unionph@hecworks. com
an-nadil@yahoo. com
ওয়েব সাইট ঃ www an-nadil@org.

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
০১৯১৪৭৩৫৬১৫

কম্পিউটার কম্পোজ

বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা

## আল্‌-ইহ্‌দা

মুহতারাম রফিক আহ্‌মদ, শফিক আহ্‌মদ ও স্নেহভাজন হালিমার সুস্বাস্থ্য ও বরকতময় হায়াত কামনায়।

– নোমান আহমদ

# দু'টি কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

حامدا ومصليا ومسلما

জগতস্রষ্টা রাব্বুল আলামীনের দয়া অসীম। রহমতের কোন কুল কিনারা নেই তাঁর। বিশেষত অযোগ্য এ বান্দার প্রতি তাঁর যে কি অনুগ্রহ তা কলমের ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। জীবনের একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি এ নালায়েককে আকায়ে নামদার তাজেদারে মদীনা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুবারক হাদীসের খেদমতে নিয়োজিত রেখেছেন। সে সুবাদে তাহাভী শরীফের এ খেদমত আঞ্জাম দেয়ার সুযোগ হল।

শায়খুল ইসলাম ইমাম আবু জাফর তাহাভী হানাফী র. ছিলেন মিসরের শীর্ষস্থানীয় ফকীহ ও মুহাদ্দিস। রেওয়ায়াত-দেরায়াত, ফিকহ, ইজতিহাদ ও মাযহাব সংক্রান্ত জ্ঞানে তিনি ছিলেন বেনজির ব্যক্তিত্ব। ৩০ এর উর্ধ্বে মতান্তরে প্রায় ৮০টির মত মূল্যবান গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। তন্মধ্যে বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে মা'আনিল আছার (তাহাভী শরীফ), মুশকিলুল আছার ও আকীদাতুত তাহাভী।

শরহে মা'আনিল আছার ইমাম তাহাভী র.-এর দুনিয়াখ্যাত হাদীস গ্রন্থ। শতাব্দীর পর শতাব্দী এটি পাঠ্যগ্রন্থরূপে পঠিত হয়ে আসছে। এতে তিনি হানাফী মাযহাবের প্রমাণ হাদীসসমূহ ও অন্যান্য মাযহাবের মৌলিক প্রমাণাদি উল্লেখ করেছেন। পক্ষে বিপক্ষের প্রমাণাদি উল্লেখ করে বিতর্কিত বিষয়গুলোতে আকলী-নকলী প্রমাণ তথা রেওয়ায়াত ও যুক্তির আলোকে হানাফী মাযহাবের প্রাধান্য দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, এ গ্রন্থের যৌক্তিক প্রমাণ ও মাযহাব নির্ণয়ের বিষয়টি তুলনামূলক জটিল হওয়ার কারণে আমরা বাংলাভাষাভাষী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বক্ষমান গ্রন্থটি তৈরি করেছি।

যে সব অনুচ্ছেদে যৌক্তিক প্রমাণ আছে, সেগুলো উল্লেখ করে فذهب قوم وخالفهم فى ذالك اخرون এর মিসদাক নির্ণয় করেছি। যৌক্তিক দলীলের সারনির্যাস পেশ করেছি আমাদের ভাষায়।

নজরে তাহাভীর শুরু শেষ নির্ধারণ করাও ছাত্রদের জন্য জটিল। ফলে নজরের ইবারতগুলো সাথে সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। যেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে সেগুলো উত্তর সহকারে পেশ করেছি।

চেষ্টা করেছি বইটিকে ক্রটিমুক্ত করতে। কিন্তু শত চেষ্টার পরও তা সম্ভব হয় না। সম্মানিত পাঠক পাঠিকার চোখে কোন ভুল-ক্রটি নজরে পড়লে আশা করি আন্তরিকতার সাথে অবহিত করবেন। আমরা পরবর্তিতে সংশোধন করার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

সহযোগী সবার প্রতি আন্তরিক শুকরিয়া। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এই শ্রম কবুল করুন। উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য গ্রন্থটিকে উপকারী বানান। আমীন।

বিনীত

২৬/৬/০৬

নোমান আহমদ

## সূচিপত্র

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
| --- | --- |

# ইমাম তাহাভী র.ঃ জীবন ও বৈশিষ্ট্য

**নাম ও বংশ ঃ**

আবু জাফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামা ইবনে সালামা আয্দী হুজ্রী তাহাভী মিসরী। আয্দ ইয়ামানের একটি প্রসিদ্ধতম গোত্র। এর একটি শাখা হল হুজ্র। আর একটি শাখা ছিল শানুয়া। অতএব, শানুয়া ইত্যাদি থেকে পার্থক্যের জন্য হুজ্রী বলা হয়। মিসরে স্থানান্তরিত হওয়ার কারণে মিসরী বলা হয়।

**তাহাভী কেন বলা হয়?**

কেউ কেউ বলেন, তাহা হল মিসরের একটি গ্রামের নাম। ইমাম তাহাভী র.-কে ('তাহা'র অধিবাসী হিসেবে) সেদিকে সম্বন্ধযুক্ত করে তাহাভী বলা হয়। কিন্তু মু'জামুল বুলদান গ্রন্থকারের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হল– ইমাম তাহাভী র. 'তাহা' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন না। বরং এরই নিকটবর্তী একটি ছোট্ট গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। সে গ্রামে ছিল মোট দশটি বাড়ি। যাকে বলা হতো তাহতূত। এ গ্রামে ইমাম তাহাভী র. বসবাস করতেন। কিন্তু তিনি এ সম্বন্ধ (তাহতূতী) পছন্দ করতেন না। বরং নিজের গ্রামের নিকটবর্তী জনপদ 'তাহা'র দিকে সম্বন্ধ পছন্দ করতেন বলে তাকে তাহাভী বলে।

**জন্ম তারিখ ঃ** কারও কারও মতে ২৩৯ হিজরী (মুতাবিক ৮৫৩ ইংরেজি), আর কারও কারও মতে ২২৯ হিজরী, রবিবার রাত্রি ১০ই রবিউল আউয়াল ৮৪৪ ইংরেজি। এটি প্রসিদ্ধতম উক্তি হলেও আল্লামা হাকীম মুহাম্মদ আইউব মাজাহিরীর গবেষণা অনুযায়ী প্রথম উক্তিটি প্রধান। এটি ইবনে আসাকির, হাফিজ যাহাবী, ইবনে হাজার, সুয়ুতী, শাহ আবদুল আযীয র. প্রমুখ অতীত ও বর্তমান মনীষীর অভিমত। এটাই পরবর্তীকালীন প্রচুর ঐতিহাসিক ও জীবনী লেখকের উক্তি।

**ওফাত ঃ** সমস্ত ঐতিহাসিক একমত যে, তিনি ৩২১ হিজরী, ৯৩৪ ইংরেজিতে (১লা জিলকদ, বৃহস্পতিবার রাতে) ওফাত লাভ করেন। ইমাম শাফিঈ র. এর সামনে মিসরের প্রসিদ্ধ কবরস্থান কুরাফাতে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর কবর এখানেই অবস্থিত। ওফাতকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। অতএব, মুহাম্মদ (আয়ু ৯২ বৎসর) মুস্তফা (জন্ম সাল ২২৯ হিজরী) মুহাম্মদ মুস্তফা (ওফাত ৩২১ হিজরী) দিয়ে তাঁর যে জীবনীকাল বের করা হয়, তা সঠিক নয়।

**জ্ঞানার্জন ঃ** ইমাম তাহাভী র. এর শিক্ষা জীবন শুরু হয়, একটি পবিত্র ইলমী ও ধর্মীয় পরিবেশে। তাঁর পিতা ছিলেন বিশিষ্ট ভাষাবিদ ও মুহাদ্দিস। তাঁর জননী ছিলেন ধর্মপ্রাণ সুনামধন্যা বিদূষী। তাঁর মামা ছিলেন ইমাম শাফিঈ র.-এর বিশিষ্ট শিষ্য বিশ্বখ্যাত মুফাসসির ইমাম মুযানী র.। পারিবারিক অঙ্গণ থেকে তাঁর শিক্ষা জীবনের সূচনা। অতঃপর তিনি মসজিদে আমর ইবনে আসের বিভিন্ন পাঠচক্রে অংশগ্রহণ করেন। আবু জাকারিয়া ইয়াহইয়া র.-এর নিকট কুরআনে কারীম হিফজ করেন। ইমাম মুযানী র.-এর নিকট শাফিঈ মাযহাবের উপর লিখিত তাঁর মুখতাসার গ্রন্থটি অধ্যয়ন করেন।

মিসরের বহু বড় বড় আলিম ও মুহাদ্দিসের নিকট থেকে তিনি জ্ঞান অর্জন করেন। ২৬৮ হিজরীতে ৩০ বছর বয়সে শামও ফিলিস্তিনে শিক্ষা সফর করেন। বাইতুল মুকাদ্দাস, গায্যা ও আসকালানের বড় বড় শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। দামেশকের (বিশুদ্ধ হল দিমাশক্) বেনজির ও সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস প্রধান বিচারপতি আবু হাযিম আবদুল হামীদ হানাফী র. -এর নিকট ফিকহে হানাফী অর্জন করেন। আরও অন্যান্য আলিমের নিকট জ্ঞানপিপাসা নিবারিত করেন। ২৬৯ হিজরীতে মিসরে ফিরে এসে সেখানকার প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ ইবনে আবদুহুর ফিকহী সহকারী হন। কয়েক বৎসর পর আবু জাফর আহমদ (ওফাত ২৮৫ হিজরী) মিসরে বিচারপতি হয়ে এলে তাঁর নিকট থেকেও ফিকহে হানাফী অর্জন করেন। তাঁর জ্ঞানগরিমায় প্রভাবিত হয়ে অবশেষে ফিকহে হানাফীর অনুসরণ করেন।

মোটকথা, ২৬৯ হিজরী থেকে একাধারে ২০ বছরের অধিক কাল জ্ঞানের জগতে স্বতঃস্ফূর্ত বিচরণ করেন কঠোর সাধনার মাধ্যমে। বিদ্যার্জন করে যুগের প্রসিদ্ধ ইমাম হন।

### ইমাম তাহাভী র.-এর ব্যক্তিত্ব ঃ

মিসরের আমীর আবু মনসুর একবার ইমাম তাহাভী র.-এর দরবারে উপস্থিত হন। তার দৃষ্টি ইমাম সাহেবের প্রতি নিক্ষিপ্ত হলে তিনি প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েন। ইমাম সাহেব র.-এর সাথে খুব তাজীম ও ইজ্জত সম্মানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তার নিকট তিনটি আবেদন করেন।

১. জনাব! আমার মনের আগ্রহ আপনার নিকট আমার কন্যা বিয়ে দেব। উত্তরে তিনি বললেন, আমার এর প্রয়োজন নেই।

২. আমার নিকট আপনার কোন আর্থিক প্রয়োজন আছে কিনা? উত্তরে তিনি বললেন, না।

৩. আমি আপনাকে কোন এলাকায় জমিদারী দিতে চাই? উত্তরে তিনি বললেন, কখনো নয়।

অতঃপর আমীর বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। আপনি যা আমার নিকট কামনা করতে চান তাই করুন।

উত্তরে ইমাম তাহাভী র. বললেন, আপনি আপনার দীনের হেফাজত করুন। যেন দীন বিদায় না নেয়। (অর্থনৈতিক ব্যাপারে দীনদারীর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন।) মৃত্যুর পূর্বে নিজের মুক্তির জন্য আমল করুন। বান্দাদের প্রতি জুলুম নির্যাতন থেকে বেঁচে থাকুন। এতশ্রবণে আমীর সেখান থেকে ফিরে আসেন।

বলা হয়, এরপর মিসরের সে আমীর জুলুম নির্যাতন থেকে বিরত হন। আর মানুষের উপর নির্যাতন চালাননি।

**বিরল সম্মান ঃ**

একবার ইমাম তাহাভী র. আমীর আহমদ ইবনে তূলূনের মজলিসে উপস্থিত হন। মজলিসে বিয়ের আকদ ছিল। বিয়ের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত হল। এরপর এক খাদেম একটি চিনা মাটির পাত্রে করে একশত স্বর্ণমুদ্রা এবং সুগন্ধি নিয়ে উপস্থিত হয়। আরজ করে এ উপঢোকন কাজীর জন্য। কাজী তাহাভী র.-এর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এটি ইমাম তাহাভীর হক। এরপর দশটি চিনা মাটির পাত্রে করে সাক্ষীদের জন্য নিয়ে আসে। কিন্তু কাজী সাহেব বরাবর বলতেই থাকেন যে এটি ইমাম তাহাভী র.-এর অধিকার। অবশেষে স্বয়ং তাহাভী র.-এর ব্যক্তিগত হাদিয়াও এসে যায়। এমনিভাবে ইমাম তাহাভী র. একই মজলিস থেকে বার হাজার স্বর্ণমুদ্রা এবং সুগন্ধি নিয়ে বিদায় নেন।

**মাযহাব পরিবর্তনের কারণ ঃ**

এর নিম্নোক্ত কারণগুলো উল্লেখযোগ্য ঃ

১. ইমাম তাহাভী তাঁর মামা মুহাদ্দিস আল-মুযানীকে সর্বদা ইমাম আবু হানীফা র.-এর গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন করতে দেখেন। হানাফী মাযহাব গ্রহণ সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে ইমাম তাহাভী র. একবার বলেন, "আমার মামাকে সর্বদা ইমাম আবু হানীফা র.-এর রচনাবলী গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে দেখে আমি হানাফী মাযহাব গ্রহণ করি।"

২. ইমাম তাহাভী র. ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আবু হানীফা র.-এর অনুসারীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত অনেক জ্ঞানতর্কের সভায় উপস্থিত থাকেন এবং বিতর্কিত বিষয়গুলো মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করেন। এগুলো তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে।

৩. ইমাম তাহাভী র. শাফিঈ ও হানাফী উভয় মাযহাবের উপর লিখিত গ্রন্থাবলী গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। বিতর্কিত ধর্মীয় বিষয়াদির উপর লিখিত মামা ইমাম মুযানীর গ্রন্থ আল মুখতাসার পড়েন। এই গ্রন্থে লেখক কয়েকটি বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা র.-এর সমালোচনা করেন। এর উত্তরে কাজী বাক্কার ইবনে কুতাইবা একটি কিতাব রচনা করে ইমাম আবু হানীফা র.-এর পক্ষে ইমাম মুযানী র.-এর পাল্টা জবাব প্রদান করেন। ইমাম তাহাভী র. এই গ্রন্থখানা গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন।

৪. ইমাম তাহাভী জামে' আমর বিন আ'স মসজিদে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন মাযহাবপন্থী আলিমগণের শিক্ষাচক্রে নিয়মিত উপস্থিত হতেন। ফলে তিনি দলীল-প্রমাণাদিসহ বিভিন্ন মত-অভিমত অনুধাবন করার সুযোগ লাভ করেন।

৫. হানাফী মাযহাবের অনুসারী যে সব আলিম মিসর ও সিরিয়ায় এসে বিচারকের পদ অলংকৃত করেছিলেন, তাঁদের সংস্পর্শ ইমাম তাহাভী র.-এর উপর বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। তন্মধ্যে কাজী বাক্কার ইবনে কুতাইবা ইবনে আবু ইমরান ও আবু হাযিম র. বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অতএব, যারা ইমাম তাহাভী র.-এর মাযহাব পরিবর্তনের নিম্নোক্ত কারণ বর্ণনা করেন তাদের সে উক্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সেটি হল– ইমাম তাহাভী র. একবার ইমাম মুযানী র.-এর সাথে কোন একটি জটিল বিষয়ে জড়িয়ে পড়েন। তাহাভী র. প্রশ্ন করতে থাকেন, মামা মুযানী র. উত্তর দিতে থাকেন। অবশেষে মামা ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'আল্লাহর কসম তোমার দ্বারা কিছুই হবে না।' তখন তিনি তাঁর হালকায়ে দর্‌স ও মাযহাব পরিবর্তন করে হানাফী মাযহাব গ্রহণ করেন।

হাফিজ ইবনে হাজার র.-এর ন্যায় মনীষীও এরূপ কারণ বর্ণনা করেছেন। হাকীমুল ইসলাম আল্লামা ক্বারী তাইয়্যিব সাহেব র. এ উক্তিটি জোরালো প্রমাণের মাধ্যমে অবাস্তব ও ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেন।

**উস্তাদ ঃ**

তিনি প্রচুর সংখ্যক উস্তাদ থেকে শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম মুযানী র. সূত্রে তিনি ইমাম শাফিঈ র.-এর শিষ্য। দুই সূত্রে ইমাম মালিক ও মুহাম্মদ র.-এর শিষ্য। ইমাম আজম আবু হানীফা র.-এর শিষ্য তিন সূত্রে। যেসব মাশায়েখ থেকে মা'আনিল আছারে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের সংখ্যা ২৬। মুশকিলুল আছারে ১৩৫ জন উস্তাদ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। উক্ত গ্রন্থদ্বয় ছাড়া অন্যান্য কিতাবে তাঁর উস্তাদ সংখ্যা ২৩।

তিনি প্রায় ছত্রিশজন দুনিয়াখ্যাত ইমামের সমকালীন মুজতাহিদ ছিলেন।

**প্রসিদ্ধ কয়েকজন উস্তাদ ঃ**

১. ইবরাহীম ইবনে আবু দাঊদ, ২. যুরাইস বারলিসী, ৩. ইবরাহীম ইবনে মারযূক বসরী, ৪. কাজী আহমদ ইবনে আবু ইমরান হানাফী, ৫. আহমদ ইবনে শুআইব নাসাঈ, ৬. ইসমাঈল মুযানী শাফিঈ, ৭. কাজী বাক্কার বাকরাভী, ৮. সুলায়মান ইবনে শুআইব কায়সানী, ৯. প্রধান বিচারপতি আবু হাযিম হানাফী দিমাশকী, ১০. মুহাম্মদ ইবনে খুযাইমা বসরী, ১১. মুহাম্মদ ইবনে সালামা তাহাভী র.।

**শিষ্য ঃ**

জ্ঞানের জগতের বড় বড় দিকপাল তাঁর শিষ্যত্ব লাভে ধন্য হয়েছেন। কয়েকজনের নাম নিম্নে দেয়া হল–

১. কাজী ইবনে আবুল আওয়াম, ২. আহমদ ইবনে কাসিম বাগদাদী, ৩. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ দামিগানী, ৪. আবু মুহাম্মদ হাসান মিসরী, ৫. হাফিজ হুসাইন ইবনে আহমদ (হাকিমের উস্তাদ), ৬. আবুল কাসিম সুলায়মান তাবারানী, ৭. কাজী আবদুল আযীয তামীমী জাওহারী, ৮. আবুল হাসান আলী তাহাভী, ৯. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ, ১০. আবু বকর মুহাম্মদ বাগদাদী, ১১. আবুল কাসিম মাসলামা কুরতুবী, ১২. হিশাম ইবনে মুহাম্মদ র. প্রমুখ।

মোটকথা, বিশ্বখ্যাত প্রায় ঊনপঞ্চাশ জন শিষ্যের নাম পাওয়া যায়।

**ইমাম তাহাভীর সমকালীন হাদীসের ইমামগণ ঃ**

ইমাম তাহাভী র. বড় বড় ইমামগণের সমকালীন ছিলেন।

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন র.-এর | ওফাত | ২৩৩ হিঃ, | ইমাম | তাহাভীর | বয়স | ৪ বছর |
| " বুখারী র.-এর | " | ২৫৬ " | " | " | " | ২৭ " |
| " আহমদ ইবনে হাম্বল র.-এর | " | ২৪১ " | " | " | " | ১২ " |
| " মুসলিম র.-এর | " | ২৬১ " | " | " | " | ৩২ " |
| " আবু দাঊদ র.-এর | " | ২৭৫ " | " | " | " | ৪৬ " |
| " তিরমিযী র.-এর | " | ২৭৯ " | " | " | " | ৫০ " |
| " নাসাঈ র.-এর | " | ৩০০ " | " | " | " | ৭১ " |
| " ইবনে মাজাহ র.-এর | " | ২৭৩ " | " | " | " | ৪৪ " |

**মূল্যবান গ্রন্থাবলী ঃ**

ইমাম সাহেব র. বহু গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান অনেক গ্রন্থ রেখে গেছেন। ৩০ মতান্তরে ৮০টির মত মূল্যবান গ্রন্থ তিনি উম্মতের খেদমতে পেশ করেছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধতম কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হল–

১. মুখতাসারুত তাহাভী, ২. আকীদাতুত তাহাভী, ৩. বয়ানু মুশকিলিল আছার, ৪. শরহে মা'আনিল আছার, ৫. নাকযু কিতাবিল মুদাললিসীন, ৬. আত্‌তাসভিয়া বাইনা হাদ্দাসানা ওয়া আখবারানা, ৭. আহকামুল কুরআন, ৮. ইখতিলাফুল উলামা, ৯. কিতাবুল ফারায়িয, ১০. শরহে জামি'সগীর, ১১. শরহে জামি'কবীর ইত্যাদি। ২, ৩, ৪ নং গ্রন্থ সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাঁর সর্বপ্রথম রচনা হল মাআনিল আছার।

**ইমাম তাহাভী র. সম্পর্কে মনীষীদের অভিমত ঃ**

✪ ইমাম যাহাবী র. তাঁর প্রসিদ্ধ জীবন চরিত 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' (১৫/১৭) গ্রন্থে বলেন, 'ইমাম তাহাভী র. ছিলেন একজন ইমাম, আল্লামা, মহান হাফিজে হাদীস, মিসরের অন্যতম স্বনামধন্য মুহাদ্দিস ও প্রতিষ্ঠিত ফিকাহশাস্ত্রবিদ.....। এই ইমামের রচিত গ্রন্থাবলী যে পাঠ করবে সে তার জ্ঞানের প্রশস্ততা ও স্তর সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত হতে পারবে।'

✪ হাফিজ ইবনে আসাকির র. তাঁর বিখ্যাত ইতিহাসে (৭/৩৬৮) ইবনে ইউনুস র.-এর মন্তব্য উল্লেখ করে বলেন, 'ইমাম তাহাভী ছিলেন একজন নির্ভরযোগ্য ও প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিমান ফিকাহশাস্ত্রবিদ। পরবর্তীকালে তাঁর মত আর কেউ জন্মগ্রহণ করেননি।'

✪ ইবনে নাদীম তাঁর প্রসিদ্ধ 'ফিহরিস্ত' গ্রন্থে (২৬০ পৃঃ) বলেন, 'ইমাম তাহাভী জ্ঞান ও কৃচ্ছ্র সাধনে তাঁর যুগে একক ব্যক্তিত্ব ছিলেন।'

✪ ইবনে আব্দুল বার র. তাঁর 'আল জাওয়াহিরুল মুযীআ' গ্রন্থে বলেন, 'তিনি (ইমাম তাহাভী) সকল ফিকাহ্‌শাস্ত্রবিদের মাযহাবসহ কুফাবাসী আলিমদের জীবন, ইতিহাস ও ফিকাহশাস্ত্র সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞাত ছিলেন।'

✪ ইবনে কাছীর তাঁর বিদায়া (১১/১৮৬) গ্রন্থে বলেন, "ইমাম তাহাভী র. ছিলেন হানাফী ফিকাহশাস্ত্রবিদ, বহু মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা একজন প্রতিষ্ঠিত ও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস এবং অন্যতম হাফিজে হাদীস।"

✪ শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী র. তাঁর বুস্তানুল মুহাদ্দিসীনে (১৪৪-১৪৫ পৃঃ) বলেন, "ইমাম তাহাভী র. রচিত গ্রন্থাবলীর মাধ্যমেই তাঁর জ্ঞানের প্রশস্ততার সন্ধান পাওয়া যায়।" তাঁর রচিত মুখ্‌তাসারুত তাহাভী অধ্যয়ন

করলে প্রমাণিত হয় যে, তিনি হানাফী মাযহাবের একজন অনুসারেই ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একজন মুজ্‌তাহিদ মুন্‌তাসিব।"

✪ আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী র. বলেন– আমাদের পূর্ববর্তী সকল মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মাসায়েল উৎসারনে তিনি ছিলেন একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ মনীষী। হাদীসের বর্ণনা ও রিজালশাস্ত্রে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও সুনান গ্রন্থ রচয়িতাগনের ন্যায় তিনিও ছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত, নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য ব্যক্তিত্ব।

### মুজতাহিদগণের মধ্যে তাঁর মর্যাদা ঃ

আল্লামা শামী র. মুজতাহিদগণের ৭টি স্তর বর্ণনা করেছেন–

১. মুজতাহিদে মুতালাক, যেমন ইমাম চতুষ্টয়, ২. মুজতাহিদ ফিল মাযহাব, যেমন ইমাম আবু ইউসুফ র., ৩. মুজাতাহিদ ফিল মাসায়িল, যেমন ইমাম খাসসাফ র., ৪. আসহাবুত তাখরীজ যেমন আবু বকর রাযী র., ৫. আসহাবুত তারজীহ, যেমন ইমাম কুদূরী র., ৬. আসহাবুত তামঈয, যেমন কানয ও মুখতার গ্রন্থকারদ্বয়, ৭. বর্তমান যুগের সেসব মুকাল্লিদ লেখক, যারা আহকাম সংক্রান্ত ভাল-মন্দ পার্থক্য করার ক্ষমতা রাখেন না।

ইমাম তাহাভী র. ছিলেন মুজতাহিদ ফিল মাসাইল, যেমন ইমাম আহমদ ইবনে উমর খাসসাফ, আবুল হাসান কারখী, শামসুল আয়িম্মা হালওয়াঈ, শামসুল আয়িম্মা সারাখসী ও ফখরুল ইসলাম বযদভী র. প্রমুখ। অবশ্য কেউ কেউ তাঁকে মুজতাহিদ ফিল মাযহাব বা মুজতাহিদ মুনতাসিব গণ্য করেছেন।

সারকথা, ইমাম তাহাভী র. অধিকাংশ মূলনীতি ও শাখায় মুকাল্লিদ, কোন কোন মূলনীতি ও শাখায় মুজতাহিদে মুনতাসিব, কোন কোন মাসাইলে মানসূসায় মুজতাহিদ ফিল মাযহাব, আর কোন কোন মাসাইলে গায়রে মানসূসায় মুজতাহিদ ফিল মাসাইল।

### শরহে মা'আনিল আছার সংক্রান্ত তথ্যাবলী ঃ

### এ গ্রন্থ রচনার কারণ

ইমাম তাহাভী র.-এর যুগে ইউরোপিয়ান প্রাচ্যবিদ, মুলহিদ, হাদীস অস্বীকারকারী ও গায়রে মুকাল্লিদদের পক্ষ থেকে হাদীস সংক্রান্ত বিভিন্ন রকম প্রশ্ন উত্থাপিত হতে শুরু করে। তখন উলামায়ে কিরামের অন্তরে এ বিষয়টি অনুভূত হল যে, হাদীস শাস্ত্রে এরূপ একটি গ্রন্থ রচিত হওয়া উচিত, যেটি হানাফী মাযহাব প্রমাণিত করার সাথে সাথে উপরোক্ত ব্যক্তিদের প্রশ্নের উত্তর দানই যথেষ্ট হল। ফলে এ প্রসঙ্গে ইমাম তাহাভী র.-এর কিছু সংখ্যক বিশেষ

বন্ধু ও শিষ্য তার নিকট এরূপ একটি গ্রন্থ রচনার জন্য আবেদন জানালো। ফলে ইমাম তাহাভী র. তাদের এ দরখাস্ত মঞ্জুর করেন। গ্রন্থকার سألنى بعض اصحابنا من اهل العلم الخ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত কচ্ছেন।

**শরহে মা'আনিল আছারের বৈশিষ্ট্যাবলী**

১. মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদীস গ্রন্থাবলীকে ৮ ভাগে বিভক্ত করেছেন–

১. জামি' ২. সুনান, ৩. মুসনাদ, ৪. মু'জাম, ৫. জুয, ৬. আরবাঈন, ৭. ইলাল, ৮. আতরাফ। তন্মধ্যে শরহে মা'আনিল আছার হল সুনানের অন্তর্ভুক্ত। এটি ফিকহী ক্রমবিন্যাসের ভিত্তিতে রচিত।

২. এ গ্রন্থে এরূপ অনেক হাদীস পাওয়া যায়, যেগুলো অন্য হাদীসগ্রন্থে পাওয়া যায় না।

৩. একটি হাদীসের বিভিন্ন সূত্র পাওয়া যায়। ফলে হাদীস শক্তিশালী হয়।

৪. রেওয়ায়াতগুলোর বাহ্যিক বিরোধের উপর তাত্ত্বিক আলোচনা করা। যার ফলে প্রতিটি হাদীস স্বস্থানে সম্পূর্ণ মর্যাদাসম্পন্ন পরিলক্ষিত হয়।

৫. হাদীসসমূহের বিশদ বিবরণের জন্য সাহাবী ও ইসলামী আইনবিদগণের উক্তি বর্ণনা করেন।

৬. জারহ ও তা'দীলের ইমামগণের উক্তি বর্ণনা করেন।

৭. হানাফীদের প্রমাণাদির সাথে অন্যদের প্রমাণাদিও পেশ করেন। অতঃপর তাত্ত্বিক গবেষণামূলক সিদ্ধান্ত দেন।

৮. হাদীসগুলোর উপর গবেষণামূলক আলোচনার পর তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে যৌক্তিক প্রমাণ পেশ করে একদিককে প্রাধান্য দেন।

৯. বাহ্যিক সাংঘর্ষিক হাদীসগুলো পেশ করে কোন্‌টি রহিতকারী আর কোন্‌টি রহিত তা পার্থক্য করে দেন।

১০. শিরোনামের অধীনে কখনও এরূপ হাদীস আনেন যেগুলো বাহ্যত শিরোনামের সাথে সম্পর্কহীন। কিন্তু বাস্তবে তাতে সূক্ষ্ম যোগসূত্র থাকে। ফলে সূক্ষ্মভাবে প্রমাণ পেশ করেন।

**শরহে মা'আনিল আছারের স্তর ঃ**

১. আল্লামা আইনী র.-এর বক্তব্য অনুযায়ী এটি সুনানে আবু দাউদ, জামি' তিরমিযী, সুনানে ইবনে মাজাহ ইত্যাদির চেয়ে উঁচু স্তরের।

২. ইবনে হাযম-এর মতে সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে নাসাঈর পর্যায়ভুক্ত।

৩. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী র.-এর মতে সুনানে আবু দাউদের নিকটবর্তী। এরপর তিরমিযী, তারপর ইবনে মাজাহ।

### শরহে মা'আনিল আছারের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ঃ

শরহে মা'আনিল আছারের অনেক ব্যাখ্যা ও টীকা লিপিবদ্ধ হয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হল–

১. আলহাভী ফী তাখরীজি আহাদীসি মা'আনিল আছার– হাফিজ আবদুল কাদির কুরাশী র.।

২. মাবানিল আখবার (ছয় খণ্ড)– আল্লামা আইনী র.।

৩. নুখাবুল আফকার (৮ খণ্ড)– আল্লামা আইনী র.।

৪. মাগানিল আখবার ফী রিজালি মা'আনিল আছার (২ খণ্ড)–আল্লামা আইনী র.।

৫. তারাজিমুল আহবার ফী রিজালি মা'আনিল আছার (৪ খণ্ড)– মুফতী ইয়াহইয়া সাহারানপুরী র.।

৬. তাসহীহুল আগলাত (২ খণ্ড)– হাকীম মুহাম্মদ আইউব র.।

৭. আমানিল আহবার (৪ খণ্ড)– হযরতজী মাওলানা ইউসুফ র.।

৮. ঈযাহুত তাহাভী (৩ খণ্ড)– মুফতী শাব্বীর আহমদ কাসিমী, ভারত।

### বাংলাদেশী উলামায়ে কিরামের অবদান ঃ

বাংলাদেশের উলামায়ে কিরামও তাহাভী শরীফের উল্লেখযোগ্য খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তাহাভী শরীফের কেউ কেউ বঙ্গানুবাদ করেছেন, আবার কেউ কিতাবের সংক্ষিপ্ত বিষয়টি তুলে ধরেছেন। আবার কেউ শুধু নজরে তাহাভীর উপর আলোচনা করেছেন। অবশ্য কোনটিই এখনো পূর্ণাঙ্গ হয় নি। সম্ভবত পূর্ণ কিতাবটি পাঠ্য হয়নি বলে সবটুকুর উপর কাজ করা হয়নি। নিম্নে কয়েকটি গ্রন্থের নাম পেশ করা হল ঃ

১. তাহাভী শরীফের বঙ্গানুবাদ – শাইখুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ জাকির হোসাইন, মুহাদ্দিস জামি'আ নূরিয়া, টঙ্গি, গাজিপুর। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত।

২. তানকীহুল লাআলী ফী তাহকীকে নজরিত তাহাভী র. –মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফিকুর রহমান। মুহাদ্দিস জামি'আ মাদানিয়া ইসলামিয়া, সিলেট।

৩. নূসরাতুর রাবী – মাওলানা আতাউল হক জালালাবাদী। মুহাদ্দিস জামি'আ কাসিমুল উলুম, দরগাহ হযরত শাহ্ জালাল র., সিলেট। এ গ্রন্থটির মূল লেখক মাওলানা মুহাম্মদ তাহির রহীমী মাদানী। এর নতুন বিন্যাস ও সম্পাদনা হয়েছে মাওলানা জালালাবাদী কর্তৃক।

৪. জাফরুল আমানী ফী নজরিত তাহাভী (যুক্তির আলোকে বিতর্কিত মাসায়েল বা নজরে তাহাভী র.-বাংলা) –মাওলানা নোমান আহমদ, মুহাদ্দিস জামি'আ রাহমানিয়া, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# فى الطهارة

# পবিত্রতা পর্ব

## باب الماء تقع فيه النجاسة

## অনুচ্ছেদ ঃ যে পানিতে নাপাক পড়ে

### কুল্লাতাইন (মটকাদ্বয়) সংক্রান্ত মাসআলা

এ অনুচ্ছেদে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। প্রথম বিষয়টি হল– পানিতে নাপাক পড়লে অপবিত্র হবে কিনা? অবশ্য আমরা এ বিষয়টি নিয়ে এখানে আলোচনা করব না। কারণ, প্রথমটিতে নজরে তাহাভী তথা যৌক্তিক প্রমাণ নিয়ে আলোচনা হয়নি। غير ان قوما وقت فى ذالك شيئا فقالوا اذا كان الماء مقدار قلتين لم يحمل خبثا الخ থেকে দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়টি হল, যাদের মতে পানি নাপাক হওয়ার জন্য কম ও বেশি হওয়া ধর্তব্য তাদের মতে এ সংক্রান্ত দুটি মাযহাব রয়েছে।

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. ইমাম শাফিঈ, আহমদ, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, আবু সাওর, আবু উবাইদ, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, ইবনে খুযাইমা র. প্রমুখের মতে, যদি পানিতে নাপাক পড়ে তার তিন গুণের কোন একটিতে পরিবর্তন না আসে আর সে পানি দুই মটকা অপেক্ষা কম হয় তবে তা নাপাক হয়ে যায়। আর যদি দুই মটকা অথবা তার চেয়ে বেশি হয় তবে পবিত্র থাকবে। এতে বোঝা গেল তাঁদের মতে কম পানির পরিমাণ অনুমান নির্ভর নয়; বরং তাত্ত্বিক ও বাস্তবতানির্ভর।

২. হানাফীদের মতে কম পানির পরিমাণ তত্ত্বনির্ভর নয়; বরং অনুমান নির্ভর। মুবতালাবিহীর (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির) রায়ের উপর অর্পিত। তবে আল্লামা গাঙ্গুহী, হযরতজী মাওলানা ইউসুফ র. এবং আল্লামা বিন্নৌরী র. হানাফীদের তিনটি উক্তি বর্ণনা করেছেন।

(১) ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে পানি কম বেশি নির্ভর করে মুবতালাবিহীর মতের উপর।

(২) ইমাম আবু ইউসুফ র.-এর মতে এক দিকে নড়াচড়া দিলে অপর দিকে যদি নড়াচড়া হয়, তবে তা কম পানি, অন্যথায় বেশি পানি।

(৩) ইমাম মু'হাম্মদ র. এর মতে যদি ক্ষেত্রফল ১০ × ১০ অপেক্ষা কম হয়, তবে সেখানকার পানি কম, অন্যথায় বেশি।

উল্লেখ্য, ইমাম মুহাম্মদ র.-এর উপরোক্ত উক্তির তাৎপর্য হল, একবার তাঁর বিশিষ্ট শিষ্য ইমাম আবু সুলাইমান আলজাওযেজানী র. তাঁকে কম পানির পরিমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। উত্তরে তিনি বললেন, আমাদের এ মসজিদের সমান কূপ হলে তার পানি বেশি। আর এর চেয়ে কম হলে কম। অতঃপর সে শিষ্য এ মসজিদের ভেতর দিক মাপলে ৮ × ৮ হয় আর দেয়াল সহ মাপলে হয় ১০ × ১০। এ উক্তিটি বস্তুত তাত্ত্বিক নয়। বরং তাত্ত্বিক উক্তি হল, প্রথমটি। দ্বিতীয় উক্তিটিও কিছুটা তাহকীকী। কিন্তু পরবর্তী ইসলামী আইনবিদগণ জনসাধারণের জন্য সহজ করণার্থে তৃতীয় উক্তিটির উপর ফতওয়া দিয়েছেন।

এখানে প্রথম দলের প্রমাণ ও দ্বিতীয় দলের প্রমাণাদি ইমাম তাহাভী র. সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। আমরা প্রথম দলের হাদীসটি সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের উত্তর দেই। যেমন– এ হাদীসটি সনদ, মতন অথবা এ হাদীসে উদ্দেশ্য হল প্রবাহিত পানি। যেমন মিসদাকের দিক দিয়ে মুযতারিব। অতএব, এটি আমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হতে পারে না।

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমিরী র. ও বলেছেন, হাদীসে কুল্লাতাইনে উদ্দেশ্য হল প্রবাহিত পানি।

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَأَنتم قَد جَعَلتُم مَاءَ البيرِ نَجِسًا بِوُقوعِ النَّجَاسَةِ فِيهَا فَكَانَ يَنبغِيْ أَن لا تَطهَرَ تِلكَ البيرُ ابدًا لِأَنَّ حِيطَانَهَا قَد تَشَرَّبَتْ ذَالِكَ المَاءَ النجِسَ واستَكَنَّ فِيهَا فَكَانَ يَنبغِيْ أَن تُطَمَّ۔

এখানে বিরোধী পক্ষ থেকে আমাদের উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। সেটি হল, যেহেতু নাপাক করার কারণে কূপের পানি না পাক হয়ে যায়। তবে তো কূপ কখনো পাকই না হওয়ার কথা। যদিও সম্পূর্ণ পানিই তুলে ফেলা হোক না কেন। কারণ, দেয়ালে না পাক পানি প্রবিষ্ট হয়েছে। যখন তাকে পবিত্র পানি ফেলা হবে তখন না পাক দে''য়ালের সাথে লাগার কারণে সে পানিও নাপাক হয়ে যায়। অতএব, কূপকে সম্পূর্ণ পূর্ণ করে পানি ফেলে দিতে হবে।

قِيلَ لَهُ لَم نَرَ العاداتِ جرتْ علىٰ هٰذا قَد فعلَ عبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ ماذكرنَا فِى زمزَم بحضرةِ اصحابِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَلم يُنكِرُوا ذالكَ عليهِ ولاَ انكرَه مَن بعدَهم ولارأى احدٌ مِنْهُم طمَّها وقَد امرَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فِى الاناءِ الذىْ قَد نجِسَ مِن ولوغِ الكلبِ فِيه اَن يُغسلَ ولم يأمُرْ بِانْ يكسرَ وقد تشرَّبَ مِنَ الماءِ النجسِ فكَمَا لَم يؤمَرْ بِكسْرِذالكَ الاناءِ فَكذالكَ لاَيومرُ بطمّ تلكَ البيرِ -

**উত্তর ঃ** এর উত্তর হল, যমযম কূপে যখন একজন হাবশী গোলাম পড়ে মরে যায়, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. সাহাবায়ে কিরামের উপস্থিতিতে এর পানি তুলে ফেলেছিলেন এবং সবাই সর্বসম্মতিক্রমে পানি তুলে ফেলার ব্যাপারে মত দিয়েছিলেন। কিন্তু কেউ কূপ পূর্ণ করে পানি ফেলার নির্দেশ দেননি। কারণ, এর অর্থ হবে সাধ্যাতীত বিষয়ের দায়িত্ব চাপানো, কাজেই যেরূপভাবে পাত্রে কুকুর মুখ দিলে পাত্র ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয় না। এরূপভাবে কূপ পূর্ণ করে পানি ফেলার নির্দেশ দেয়া হয় না।

فَان قَال قائلٌ فانَّا قَد رأينَا الاِناءَ يغُسلُ فِلم لَا كانتِ البيرُ كذالكَ؟

**আরেকটি প্রশ্ন ঃ**

এখানে আরেকটি প্রশ্ন হয়, সেটি হল যে, আপনারা তো স্বীকার করেন, পাত্র নাপাক হলে তা ধৌত করতে হয়। অতএব, এটাও স্বীকার করতে হবে যে, পাত্রের ন্যায় কূপও ধৌত করতে হবে।

قِيلَ لَهُ اِن البيرَ لاَيُستطاعُ غَسلُهَا لِان مَايَغسلُ بهٖ يَرجعُ فِيها وليستْ كَالاناءِ الذىْ يُهراقُ مِنهُ مَايغسلُ بهٖ، فَلمَّا كانتِ البيرُ مِمَّا لاَ يستطاعُ غَسلُهَا وقَد ثبتَ طهارتُها فِى حالٍ مَّا- وكانَ كلُّ مَن اوجبَ نجاستَها بِوقوعِ النَّجاسةِ فِيها فقدْ اَوجبَ طهارتَها بِنَزحِها وَانْ لمْ ينزحْ مَا فِيهَا مِن طينٍ -

**উত্তর ঃ** এর উত্তর হল, পাত্র ধুয়ে তার পানি ফেলে দেয়া সম্ভব। বাস্তবে তাই করা হয়। যতবার পাত্র ধৌত করা হয়, ততবার তার পানি ফেলে দেয়া হয়। আর যদি কূপ ধৌত করা হয় তবে এর দেয়াল ধৌত করার সময় দেওয়াল ধৌত করার পানি কূপের নিচে জমা হয় এবং কূপকে পাত্রের ন্যায় পরিপূর্ণ করে পানি ফেলা সম্ভব নয়। তাছাড়া যাঁরা নাপাক পড়ার কারণে কূপ অপবিত্র হওয়ার প্রবক্তা তাঁরা এটাও বলেন যে, শুধু কূপের পানি বের করে দিলে কূপ পবিত্র হয়ে যায়। যদিও কাদা বের করা না হোক না কেন। যেহেতু কাদা ইত্যাদি নতুন পানির নাপাকির কারণ নয়। অতএব, দেয়াল উত্তমরূপেই নাপাকির কারণ হবে না।

وَلَو كَانَ ذالِكَ مَأخوذًا مِن طرِيقِ النظرِ لَمَا طهرتْ حتّٰى تُغسَلَ حِيطانُها ويخرجَ طينُها ويُحفرَ فلمَّا اجمعُوا اَن نَزعَ طِينِها وحفرَها غيرُ واجِبٍ كانَ غسلُ حيطانِها احرٰى اَن لَايكونَ واجبًا وهٰذا قولُ ابيْ حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمَهم اللهُ تعالٰى ـ

### যৌক্তিক প্রমাণ ঃ

ইমাম তাহাভী র.-এর যৌক্তিক প্রমাণের সারমর্ম হল, যুক্তির দাবি, যতক্ষণ পর্যন্ত কূপের দেয়াল ধৌত না করা হবে, কাদা বের না করা হবে এবং কূপ আরোও খনন না করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কূপ পবিত্র হওয়ার কথা নয়। কিন্তু যেহেতু সমস্ত উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, কাদা বের করা এবং কূপ আরো খনন করা ওয়াজিব নয়, অতএব, প্রাচীর ধৌত করা উত্তমরূপেই ওয়াজিব হবে না। এটাই যুক্তির কথা।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আমানিল আহবার ঃ ১/৪, আলকাওকাবুদ দুররী ঃ ১/৯১, বযলুল মাজহুদ ঃ ১/৪১, আওজাযুল মাসালিক ঃ১/৫৩, ঈযাহুদ তাহাভী ঃ ১/৮৬-৯৭।

## باب سور الهرة

## অনুচ্ছেদ ঃ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট

### মাযহাবের বিবরণ ঃ

১. হযরত ইমাম শাফিঈ, মালিক, আহমদ, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, সুফিয়ান সাওরী, আওযাঈ র. এর মতে বিড়ালের ঝুটা বিনা মাকরূহ পবিত্র। ইমাম আবু ইউসুফ র. এর প্রসিদ্ধ রেওয়ায়াত এটিই।

২. ইমাম আবু হানীফা, যুফার, হাসান ইবনে যিয়াদ, হাসান বসরী সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিবও মুহাম্মদ র. এর মতে একদম নাপাকও নয় আবার স্বাভাবিক পাকও নয়, বরং মাকরূহ। এ মাকরূহ সম্পর্কেও দুটি উক্তি রয়েছে–১. মাকরূহে তাহরীমী, ২. মাকরূহে তানযীহী। এটি ইমাম কারখী র. এর মত। অধিকাংশ মুতাআখখিরীন এই দ্বিতীয় উক্তিটির উপরই ফতওয়া দিয়েছেন। আর ইমাম তাহাভী র. প্রথম উক্তিটি অবলম্বন করেছেন। স্বীয় নজর তথা যুক্তির মাধ্যমে এটাই সাব্যস্ত করেছেন।

وَقَدْ شَدَّ هٰذا القولَ النظرُ الصحيحُ، وذالكَ أنا راينَا اللُّحمانَ علٰى اربعةِ اوجهٍ فمِنهَا لحمٌ طاهرٌ ماكولٌ وهُو لحمُ الابلِ والبقرِ والغنمِ، فسورُ ذالكَ كلُّه طاهرٌ، لِانه ماسَّ لَحمًا طاهرًا، ومِنها لحمٌ طاهرٌ غيرُ ماكولٍ وهُو لحمُ بنِى اٰدمَ وسورُهم طاهرٌ لِانه ماسَّ لحمًا طاهرًا، ومِنهَا لحمٌ حرامٌ وهو لحمُ الخنزيرِ والكلبِ، فسورُ ذالكَ حرامٌ، لِانه ماسَّ لحمًا حرامًا، فكانَ حكمُ ماماسَّ هٰذه اللُّحمانَ الثلاثةَ كما ذكرنَا يكونُ حكمُه حكمَها فِى الطهارةِ والتحريمِ۔

ومِنَ اللحمانِ ايضًا لحمٌ قد نهِىَ عَن اكلِه وهوَ لحمُ الحمُرِ الاهليةِ وكلُّ ذِى نابٍ مِن السباعِ ايضًا مِن ذالك السنورِ ومَا اشبهَ، فكانَ ذالكَ منهيًّا عنَه ممنوعًا مِن اكلِ لحمِه بالسنةِ وكانَ فِى النظرِ ايَضا سورُ ذالك حكمُه حكمُ لحمِه لِانه ماسَّ لحمًا مكروهًا، فصارَ حكمُه حكمَه كمَا صارَ حكمُ ماماسَّ اللحمانَ الثلاثةَ الاُولَ حكمَها، فثبتَ بذلكَ كراهةُ سورِ السنُّورِ، فبهٰذا نأخذُ، وهو قولُ ابى حنيفةَ رحمهُ اللهُ عليهِ۔

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

ইমাম তাহাভী র.এর যৌক্তিক প্রমাণ হল, যদি কোন প্রাণী কোন কিছুতে মুখ দেয়, তবে সে জিনিসটির সাথে সে প্রাণীর গোশ্তের সাথে স্পর্শ হয়। কাজেই সে গোশ্ত পবিত্র হলে ঝুটাও পবিত্র থাকবে। অপবিত্র হলে, ঝুটাও

অপবিত্র হবে। এ কারণেই আমরা দেখি, গোশ্‌ত চার প্রকার– ১. পবিত্র, ২. অপবিত্র। অতঃপর গোশ্‌ত যদি পবিত্র হয়, তবে সেটি ভক্ষণযোগ্য হবে, অথবা ভক্ষণযোগ্য হবে না। অনুরূপভাবে নাপাক হলেও, তার অপবিত্রতা ও হারাম হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ্‌র কিতাব দ্বারা প্রমাণিত হবে, অথবা সুন্নতে রাসূল দ্বারা। এভাবে মোট চারটি প্রকার হয়ে যায়।

১. (শরঈ মতে) ভক্ষণযোগ্য পবিত্র গোশ্‌ত। যেমন– উট, গাভী ইত্যাদির গোশ্‌ত। এগুলোর ঝুটা সর্বসম্মতিক্রমে পবিত্র।

২. অভক্ষণীয় পবিত্র গোশ্‌ত। যেমন– মানুষের গোশ্‌ত। বস্তুতঃ মানুষের গোশ্‌ত সর্বসম্মতিক্রমে পবিত্র।

৩. নাপাক গোশ্‌ত। যার অপবিত্রতা ও হারাম হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ্‌র কিতাব দ্বারা প্রমাণিত। যেমন–শূকরের গোশ্‌ত। এর ঝুটা সর্বসম্মতিক্রম নাপাক।

৪. নাপাক গোশ্‌ত যার অপবিত্রতা ও হারাম হওয়ার বিষয়টি সুন্নতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা প্রমাণিত। যেমন– গৃহপালিত গাধা ও দাঁতালো হিংস্র প্রাণীর গোশ্‌ত। এবার প্রথম প্রকারের ঝুটা যেহেতু পবিত্রতা ও অপবিত্রতার হুকুমে সর্বসম্মতিক্রমে গোশ্‌তের অধীনস্থ, সেহেতু চতুর্থ প্রকারেও এটি গোশ্‌তেরই অধীনস্থ হওয়া উচিত। যেহেতু গৃহপালিত গাধা ও দাঁতালো হিংস্র প্রাণীর গোশ্‌ত নাপাক, সেহেতু এগুলোর ঝুটাও নাপাক হবে। পক্ষান্তরে বিড়ালও দাঁতালো হিংস্র প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত–

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السنور سبع ـ

– হাকেম, দারাকুতনী, বায়হাকী

অতএব, বিড়ালের ঝুটাও নাপাক (মাকরূহে তাহরীমী) হওয়া উচিত। এটাই যুক্তির দাবি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

انها ليست بنجسٍ انها من الطوافينَ عليكم والطوافاتِ ـ

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে–

كنتُ اغتسلُ انا ورسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ مِن الاناءِ الواحدِ

عن عائشةَ رض عن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم كانَ يصغِى الاناءَ للهرةِ ويتوضأُ بفضلِهِ ـ

এসব রেওয়ায়াতের কারণে বিড়ালের ঝুটার অপবিত্রতায় কিছুটা হালকাপনা এসে গেছে। অতএব, মাকরূহে তাহরীমী হবে। কিন্তু ইমাম কারখী ও অন্যান্য ইমামএর হালকাপনা শক্তিশালী মেনে মাকরূহে তানযীহী বলেন। ফতওয়া এর উপরই।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বিদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ ১/২৮০, ঈযাহুদ তাহাভী ঃ ১/৯৭-১০৫

## باب سور الكلب

## অনুচ্ছেদ ঃ কুকুরের ঝুটা

### মাযহাবের বিবরণ ঃ

কুকুরের ঝুটা সংক্রান্ত দুটি ইখতিলাফ রয়েছে– ১. ইমাম মালিক (প্রসিদ্ধতম উক্তি অনুযায়ী) বুখারী আওযাঈ র. ও আহলে জাহিরের মতে কুকুরের গোশ্ত পবিত্র। অতএব, এর ঝুটাও পবিত্র। যে পাত্রে এটি মুখ দিবে সেটিও পবিত্র। বাকি রইল– বিভিন্ন হাদীসে এটিকে ধৌত করার যে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, সেটা পবিত্র করার জন্য নয়, বরং এটি একটি তাআব্বুদী (ইবাদতমূলক বিষয়) ও চিকিৎসাজনিত ব্যাপার।

কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ ও আহমদ র. ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিসের মতে কুকুরের ঝুটা অপবিত্র। পাত্র ধোয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে।

২. দ্বিতীয় ইখলিতাফ হল, সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কিরামের মধ্যে পরস্পরে পবিত্রকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে মতবিরোধ হয়ে গেছে

ইমাম শাফিঈ ও আহমদ র. এর মতে, সাতবার ধোয়া ওয়াজিব।

ইমাম আহমদ র. এর (এক উক্তি) মতে, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, আবু সাওর, আবু উবাইদ, উরওয়া ইবনে যুবাইর ও ইবনে আব্বাস রা. এর মতানুযায়ী অষ্টমবার মাটি দিয়ে ধোয়াও আবশ্যক।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফীদের মতে, অন্যান্য নাপাকের মত এটাও তিনবার ধৌত করাই যথেষ্ট।

وَاَمَّا النظرُ فِى ذالِكَ فقدْ كفانَا الكلامُ فِيه مابيَّنَّا مِن حكمِ اللحمانِ فِى بابِ سورِ الهرِ -

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ** ইমাম তাহাভী র. প্রথম ইখতিলাফটি অনুচ্ছেদের শেষে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। এর উপর যৌক্তিক প্রমাণ পেশ করেননি। দ্বিতীয় মতবিরোধটি অনুচ্ছেদের শুরুতে এনে এর যুক্তি বিড়ালের ঝুটা সংক্রান্ত যুক্তির উপর কিয়াস করে ছেড়ে দিয়েছেন। যার বিস্তারিত বিবরণ হল– ইমাম তাহাভী র. সেখানে ঝুটার অপবিত্রতাকে গোশ্তের অপবিত্রতার সাথে সংশ্লিষ্ট ও নির্ধারিত করেছেন। কুকুরের গোশ্তের অপবিত্রতা শূকরের গোশ্তের অপবিত্রতার চেয়ে বেশি নয়। অতএব, কুকুরের ঝুটা শূকরের ঝুটার অপবিত্রতার চেয়ে বেশি হবে না।সুতরাং যেহেতু শূকরের ঝুটার নাপাকী তিন বার ধৌত করার ফলেই দূরীভূত হয়ে যায়, সেহেতু কুকুরের ঝুটার নাপাকীও উত্তমরূপেই তিন বার ধৌত করার মাধ্যমে দূরীভূত হবে।

তাছাড়া কুকুরের রক্ত প্রস্রাব পায়খানা পাত্রে পড়লে প্রতিপক্ষও তিনবার ধুইলে পবিত্র হয় বলেন। অতএব, কুকুরে মুখ দিলেও তিনবার ধুইলে উত্তমরূপে পবিত্র হয়ে যাবে। কারণ ঝুটাতো পেশাব পায়খানা ও রক্ত অপেক্ষা মারাত্মক নাপাক নয়।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বযলুল মাজহুদ ঃ ১/৪৬ ঈযাহুত তাহাভী ঃ ১১১, ১১২, ১১৫, ১১৬

## باب سور بنى ادم

## অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের উচ্ছিষ্ট

১. ইমাম আহমদ ও ইসহাক র. এর মতে, মহিলার পবিত্রতা শেষে অতিরিক্ত পানি দ্বারা পুরুষের জন্য ওযু বা গোসল করা জায়েয নেই। এর পরিপন্থী ছুরত জায়েয আছে। জাহিরীদের মাযহাব এটাই।

২. কোন কোন আহলে জাহিরের মাযহাব হল, উভয় ছুরতে নাজায়েয।

৩. সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমাম, তথা আবু হানীফা. শাফিঈ ও মালিক র. এর মতে, উভয় ছুরতই জায়েয। অবশ্য পরনারীর পবিত্রতা অর্জনের পর অতিরিক্ত পানি পরপুরুষের জন্য ব্যবহার করা মাকরূহ।

**সতর্কবাণী ঃ** নারী ও পুরুষের জন্য একই সাথে ওযু অথবা গোসল করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। ইমাম তাহাভী র. এর উপর ভিত্তি করেই নজর তথা যৌক্তিক প্রমাণ পেশ করেছেন।

فقدْ روينَا فِي هٰذه الآثار تطهرُ كلِّ واحدٍ مِنَ الرجلِ والمرءةِ بسورِ صاحبِه فضادَّ ذالكَ مارَوينَا فِي اولِ هذا الباب فوجَبَ النظرُ هٰهنا لِنستخرجَ بِه مِن المعنيين المتضادَّين معنىً صحيحًا فوجدنَا الاصلَ المتفقَ عَليهِ اَنَّ الرجلَ والمرأةَ اِذا اَخذا بِايديهمَا الماءَ معًا مِن اناءٍ واحدٍ اَن ذالكَ لايُنجِّسُ الماءَ ورأينَا النَجاساتِ كلَّها اِذا وقعتْ فِي الماءِ قبلَ ان يتوضأَ مِنه او مَعَ التوضِئ منهُ اَن حكمَ ذالكَ سواءٌ، فلمَّا كانَ ذالكَ كذالكَ وكانَ وضوءُ كلِّ واحدٍ مِن الرجلِ والمرأةِ مَع صاحبِه لَايُنجِّسُ الماءَ عليهِ كانَ وضوءُهُ بعكه مِن سورِه فِي النظرِ ايضًا كذالكَ، فثبتَ بهٰذا مَاذهبَ اليهِ الفريقُ الاخرُ وهو قولُ ابِي حنيفةَ وابِي يوسفَ ومحمدِ بنِ الحسنِ رحمهُم اللهُ تعالىٰ -

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ** নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য একসাথে পানি ব্যবহার করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। এদিকে সমস্ত নাপাকের অবস্থা হল, চাই সে নাপাক ওযু করার পূর্বে পানিতে পড়ুক অথবা ওযু করার সময়, উভয় অবস্থাতেই তা পানিকে নাপাক করে দেবে। এই মূলনীতির বর্তমানে এ কথা বলা বিস্ময়ের ব্যাপার যে, নারী-পুরুষ এক সাথে হলে, পানি অপবিত্র হবে না, আর ক্রমানুসারে হলে, নাপাক হয়ে যাবে। অবশ্যই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, নাপাক ওযুর পূর্বে পড়লে পানি নাপাক হয়ে যায় আর ওযুর সময় পড়লে পানি নাপাক হয় না! অতএব বলতে হবে, এক সাথে নারী-পুরুষ ওযু করলে যেমন পানি নাপাক হয় না, এমনিভাবে একজনের ওযুর পরও অবশিষ্ট পানি অপরজনের জন্য নাপাক হবে না।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/৩১, আমানিল আহবার ১/৯৮, ১২১

## باب التسمية على الوضوء

## অনুচ্ছেদ ঃ ওযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ্ পাঠ

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. আহলে জাহিরের মতে এবং ইমাম আহমদ র.এর একটি রেওয়ায়াত অনুযায়ী ওযুর সময় (শুরুতে) بسم الله الرحمن الرحيم পড়া ফরয।

২. অধিকাংশ ইমাম তথা আবু হানীফা, শাফিঈ ও মালিক র. এর মতে, বিসমিল্লাহ্ পড়া ফরয নয় বরং সুন্নত। ইমাম আহমদ র. এর প্রসিদ্ধ রেওয়ায়াত এটিই। ইমাম তাহাভী র. এ বিষয়টিতে দুটি যৌক্তিক প্রমাণ পেশ করেছেন।

وامّا وجهُ ذٰلكَ مِن طريقِ النظرِ فانّا رأينَا اشياءَ لايدخلُ فِيهَا الِابكلامٍ مِنها العقودُ التِىْ يعقدُها بعضُ الناسِ لِبعضٍ مِن البياعاتِ والاجاراتِ والمناكحاتِ والخلعِ ومَا اشبهَ ذالكَ، فكانتْ تلكَ الاشياءُ لاتجبُ اِلا باقوالٍ وكانتِ الاقوالُ منهَا ايجابٌ لِانه يقولُ قَد بِعتُك، قَد زوَّجتُكَ، قدخَلعتكَ وتلكَ اقوالٌ فيهَا ذكرُ العقودِ ـ

واشياءَ يدخلُ فيهَا باقوالٍ وهِى الصلٰوةُ والحجُّ فيدخلُ فِى الصلٰوةِ بالتَّكبيرةِ وفِى الحجِ بالتلبيةِ فكانَ التكبيرةُ فِى الصلٰوةِ والتلبيةُ فِى الحجِّ ركنًا مِن اركانِها ثُمَّ رجعنَا اِلى التسميةِ فِى الوضوءِ هَل تشبهُ شيئًا مِن ذالكَ فرأينَاهَا غيرَ مذكورٍ فيهَا ايجابُ شئٍ كمَا كانَ فِى النكاحِ والبيوعِ فخَرجتِ التسميةُ كذالكَ مِن حكمِ ماوصفْنَا ولَم تكنِ التسميةُ ايضًا رُكنًا مِن اركانِ الوضوءِ كمَا كانَ التكبيرُ ركنًا مِن اركانِ الصلٰوةِ وكمَا كانتِ التلبيةُ ركنًا مِن اركانِ الحجِّ فخرجَ ايضًا بِذالكَ حكمُها مِن حكمِ التكبيرِ والتلبيةِ فبطَلَ بذالكَ قولُ مَن قالَ انه لَابدَّ مِنهَا فِى الوضوءِ كَما لَابدَّ مِن تلكَ الاشياءِ فِيهَا يعملُ فيهِ ـ

**প্রথম যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

যে সব বিষয়ে কথাবার্তার দখল হয়ে থাকে, সেগুলো দুই প্রকার-

১. কোন কোন বিষয়ে কথাবার্তাই সেটিকে প্রমাণিত করে। কথাবার্তা ছাড়া এ বিষয়টির অস্তিত্বই সম্ভব নয়। যেমন- বেচাকেনা, ইজারা, বিয়ে, খুলা ইত্যাদি চুক্তিতে কথাবার্তা ছাড়া অন্য কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না। একজন 'আমি বিক্রি করলাম' অপরজন 'ক্রয় করলাম' বললেই ক্রয়-বিক্রয় হয়ে যাবে। এই চুক্তিটির জন্য অন্য কোন কাজের প্রয়োজন হয় না।

২. কোন কোন জিনিস আছে, সেগুলোতে প্রবেশের জন্য কথাবার্তা কারণের পর্যায়ভুক্ত থাকে। অর্থাৎ, কথাবার্তা ছাড়া সে বিষয়টি আরম্ভ করা সহীহ হয় না। যেমন– নামায ও হজ্জ। তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত নামায এবং তালবিয়া ব্যতীত হজ্জ শুরু করা সহীহ নয়। এই তাকবীরে তাহরীমা ও তালবিয়া হল, রোকন তথা শর্তের পর্যায়ভুক্ত। আমরা বিসমিল্লাহ্র ব্যাপারে চিন্তা ফিকির করে দেখলাম, এর সাদৃশ্য না প্রথম প্রকারের সাথে, না দ্বিতীয় প্রকারের সাথে। কারণ, বিসমিল্লাহ্র মধ্যে না কোন কিছুর ইজাব রয়েছে, না তাতে প্রকৃত ওযু হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। যেরূপভাবে চুক্তিগুলোতে হয়ে থাকে, তথা বিসমিল্লাহ্ ছাড়াই ওযু আদায় হয়ে যাওয়া, হাতমুখ ধৌত করা ইত্যাদি কাজের প্রয়োজন না হওয়া। বিসমিল্লাহ্ বলা ওযুর রোকনের যোগ্যতাও রাখে না। কারণ, ওযু হল পবিত্রতার অন্তর্ভুক্ত। অতএব, পবিত্রতা সংক্রান্ত জিনিস যেমন– ধোয়া ও মাসেহ্ করাই এর রোকন হতে পারে। তাসমিয়া হল, আল্লাহ্র যিকিরের অন্তর্ভুক্ত, পবিত্রতার অন্তর্ভুক্ত নয়। যেহেতু তাসমিয়ার সাদৃশ্য চুক্তিগুলোর সাথেও নয়, আবার তাকবীরে তাহরীমা ও তালবিয়ার সাথেও নয়, সেহেতু এটি ওযুতে কিভাবে আবশ্যক হতে পারে?

فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ فَاِنَّا قَدرأَيْنَا الذبيحَةَ لابدَّ مِن التسميةِ عندَها ومَنْ تركَ ذالكَ متعمدًا لَم توكَلْ ذبيحتُه فالتسميةُ ايضًا علٰى الوضوءِ كذالكَ -

قِيلَ لهُ ماثبتَ فِى حكمِ النظرِاَن مَن تركَ التسميةَ علٰى الذبيحةِ متعمدًا اَنها لاتوكَلُ لَقد تنازعَ الناسُ فِى ذالكَ فقالَ بعضُهم توكلُ وقالَ بعضُهم لَاتوكلُ، فامَّا مَن قالَ توكَلُ فقَد كَفينَا البيانَ لِقولهِ وامَّا مَن قالَ لاتُوكلُ فاِنَّه يقولُ اِنَّ تركَها ناسيًا تُوكلُ وسواءٌ عندَه كانَ الذابحُ مسلمًا اوكافرًا بعدَ اَن يكونَ كتابيًّا فجعلتِ التسميةُ هٰهنا فِى قولِ مَن اوجبَها فِى الذبيحةِ اِنمَا هِى لبيانِ الملَّةِ فاِذاَ سمّٰى الذابحُ صارتْ ذبيحتُه مِن ذبائحِ الملةِ الماكولةِ ذبيحتُها واِذا لَم يسمِّ جعلتْ مِن ذبائحِ المِللِ التىْ لَاتوكلُ ذبائحُها -

**প্রশ্ন ঃ** উপরোক্ত যৌক্তিক প্রমাণের উপর একটি প্রশ্ন হয় যে, আমরা এরূপ কিছু কিছু জিনিস দেখি, যেগুলোর সাদৃশ্য না চুক্তির সাথে, না সালাত ও হজ্জের সাথে। তা সত্ত্বেও তাতে বিসমিল্লাহ্ বলা জরুরি। যেমন– জবাই কালে বিসমিল্লাহ্ বলা। যদি কোন ব্যক্তি জবাইকালে ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ্ পাঠ পরিহার করে, তবে জবাইকৃত জন্তু হারাম হয়ে যায়, অথচ না তাতে ইজাব রয়েছে, আর না রোকন হওয়ার বিষয়।

**উত্তর॥** প্রথমততো এ বিষয়টিই বিতর্কিত। কারণ, উলামায়ে কিরামের মতে, ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ্ পাঠ ছেড়ে দিলে জবাইকৃত জন্তু হারাম। যেমন– ইমাম শাফিঈ র. বলেন। অতএব, এই প্রশ্ন শুধু তাদের ক্ষেত্রে হতে পারে, যারা ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ্ বর্জিত প্রাণীকে হারাম সাব্যস্ত করে।

অতএব, এই প্রশ্নের উত্তর হল, ওযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ্ পড়াকে জবাইয়ের সময় বিসমিল্লাহ্ পড়ার উপর কিয়াস করা সহীহ নয়। কারণ, জবাইকালে বিসমিল্লাহ্ পাঠ জরুরি। আর এই প্রয়োজন তাঁদের মতে, মিল্লাতের বিবরণের জন্য, যাতে চেনা যায় যে, জবাইকারী মুসলমান, আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি বিসমিল্লাহ্ বলে নেয়, তবে বুঝা যাবে সে তাওহীদে বিশ্বাসী। তার জবাইকৃত জিনিসকে হালাল সাব্যস্ত করা হবে। অন্যথায় নয়। এর পরিপন্থী ওযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ্ পাঠ। কারণ, এটা হল তাবাররুকের জন্য, ধর্মের বিবরণের জন্য নয়। যার ফলে এর ব্যবধানের প্রয়োজন হয় যে, ওযুকারী তাওহীদের ধর্মে বিশ্বাসী কিনা। কাজেই ওযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ্কে জবাইয়ের শুরুতে বিসমিল্লাহ্র উপর কিয়াস করা সহীহ নয়।

والتسميةُ على الوضوءِ ليستْ لِلملةِ انمَا هِى مجعولةٌ لِذكرٍ علٰى سببٍ من اسبابِ الصلٰوةِ فرأينَا مِن اسبابِ الصلٰوةِ الوضوءَ وسترَ العورةِ فكانَ مَن سترَ عورتـه لابِتسميةٍ لم يضرَّه ذلكَ. فالنظرُ علٰى ذلكَ ان يكونَ مَن تطهَر ايضاً لَابتسميتِه لم يضرَّه وهذا قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدِ بنِ الحسنِ رحمَهم اللهُ تعالٰى

**দ্বিতীয় যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

দ্বিতীয় যৌক্তিক প্রমাণ হল, ওযু হল নামাযের আসবাবের (শর্তের) অন্তর্ভুক্ত। আমরা দেখি, নামাযের অন্যান্য আসবাবে বিসমিল্লাহ্ পাঠের প্রয়োজন হয় না,

যেমন– ছতর ঢাকা নামাযের একটি শর্ত। যদি কোন ব্যক্তি বিসমিল্লাহ্ পাঠ ছাড়া ছতর ঢাকে, তবে কোন অসুবিধা নেই। অতএব, নামাযের অন্যান্য আসবাবের ন্যায় ওযুতেও বিসমিল্লাহ্ পড়ার জরুরত নেই। এটাই যুক্তির আবেদন।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আমানিল আহবার ঃ ১/১১৯, ১২৩, বযলুল মাজহুদ ঃ ১/১৬৩, আল কাওকাবুদ দুররী ঃ ১/২৪, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ১/১২১, ১২৮

## باب فرض مسح الرأس فى الوضوء

## অনুচ্ছেদ ঃ ওযুতে মাথা মাসেহ্ করা ফরয

### মাযহাবের বিবরণ ঃ

মাথা মাসেহ করা ফরয। এই মাসআলাতে কারও কোন মতবিরোধ নেই। অবশ্য কতটুকু পরিমাণ মাসেহ করা ফরয, এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে।

১. ইমাম মালিক, আহমদ, মুযানী, ইবনে উলাইয়্যা র. এবং আবু আলী জুববাইর মতে, পূর্ণ মাথা মাসেহ্ করা ফরয। فذهب ذاهبون দ্বারা তাঁরাই উদ্দেশ্য।

২. ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ, আহমদ র. ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে, অংশত মাসেহ করা ফরয, وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

শাফিঈ র.-এর মতে ন্যূনতম যতটুকুর উপর মাসেহ্ শব্দের প্রয়োগ হয়, ততটুকুই ফরয। সেই পরিমাণ হল, দুই অথবা তিনটি চুল।

হানাফীদের মতে, ললাট পরিমাণ ফরয। হাম্বলী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিসের মতেও মাথার কোন অংশ মাসেহ করা ফরয। সেটা হল, মাথার চার ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ, চার আঙ্গুল পরিমাণ। তাঁদের মতে পূর্ণমাথা মাসেহ করা মাসনুন ও ফযীলতের কারণ।

وامَّا مِن طريقِ النظرِ فإنَّا رأينَا الوضوْ يجبُ فِى اعضاءِ فمِنها مَاحكمُه اَن يغسل ومِنهَا ماحكمُه اَن يمسحَ فامَّا ماحكمُه ان يغسل فالوجهُ واليدانِ والرجلانِ فِى قولِ مَن يُوجبُ غسلَهما، فكلٌّ قَد اجمَعَ اَن مَاوجبَ غسلُه مِن ذالكَ فلاَ بدَّ مِن غسلِه كلِه

ولا يُجزئُ غسلُ بعضِه دونَ بعضٍ وكلما كانَ مَاوجبَ مسحُه مِن ذالكَ وهوَ الرأسُ فقالَ قومٌ حكمُه ان يَمسحَ كلّه كمَا تغسلُ تلكَ الاعضاءُ كلُّها

وقال اخرونَ يُمسحُ بعضُه دونَ بعضِه فنظرنَا فِيمَا حكمُه المسحُ كَيفَ هُو فرأينَا حكمَ المسحِ علىٰ الخفينِ قَدِ اختُلفَ فِيه فقالَ قومٌ يمسحُ ظاهرَ هُما وباطنَهما وقالَ اخرونَ يُمسحُ ظاهرُهما دونَ باطنِهما فكلٌّ قَد اتفقَ اَن فرضَ المسحِ فِى ذالكَ هو علىٰ بعضِهما دونَ مسحِ كلِّهمَا فالنظرُ علىٰ ذالكَ يكونُ كذٰلكَ حكمُ مسحِ الرأسِ هُو علىٰ بعضِه دونَ بعضٍ قياسًا ونظرًا على ما بينّا من ذالكَ وهٰذا قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدِ بنِ الحسنِ رحمَهم اللهُ تعالىٰ ـ

## মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করা ফরয

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুই প্রকার– ১. ধোয়ার অঙ্গ। এরূপ তিনটি– চেহারা, হাত, পা।

২. মাসেহের অঙ্গ। এটি শুধু মাথা। আমরা দেখছি, ওযুতে যেসব অঙ্গ ধৌত করতে হয়, সেগুলো পূর্ণাঙ্গরূপে ধৌত করা জরুরি। আংশিক ধৌত করা যথেষ্ট নয়। এ ব্যাপারে সবাই এক মত। কিন্তু মাসেহের অঙ্গের পরিমাণ সম্পর্কে মতবিরোধ হয়েছে। কারও কারও মতে পূর্ণ মাথা মাসেহ করা জরুরি। আর কারও কারও মতে, মাথার কোন অংশ ধৌত করলেই ফরয আদায় হয়ে যায়। আমাদের চিন্তা করতে হবে, মাথা ছাড়া অনত্র যেখানে মাসেহের নির্দেশ রয়েছে, সেখানে কি পদ্ধতি? পূর্ণাঙ্গ মাসেহ করা জরুরি? না অংশতঃ? আমরা মোজার উপরে মাসেহের ক্ষেত্রে দেখেছি, তাতে যদিও ইখতিলাফ রয়েছে যে, কারও কারও মতে, শুধু মোজার উপরের অংশ মাসেহ করা জরুরি, আর কারও কারও মতে উপরের অংশ মাসেহ করা ফরয। ভিতরের অংশ মাসেহ করা মুস্তাহাব। কিন্তু এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, পূর্ণ মোজা মাসেহ করা জরুরি নয়। বরং

কোন কোন অংশের মাসেহই যথেষ্ট। অতএব, মোজার উপর মাসেহের ন্যায় মাথা মাসেহের ক্ষেত্রেও কোন কোন অংশেই মাসেহ করা ফরয আদায়ের জন্য যথেষ্ট হবে।

স্মর্তব্য যে, ওযুতে মাথা মাসেহকে তায়াম্মুমের চেহারা মাসেহের উপর কিয়াস করা সহীহ নয়। কারণ, তায়াম্মুমের চেহারা মাসেহ ওযুর চেহারা ধোয়ার স্থলাভিষিক্ত। যেহেতু ওযুতে পূর্ণ চেহারা ধৌত করা জরুরি, সেহেতু তায়াম্মুমে পূর্ণ চেহারা মাসেহ করা জরুরি হয়ে থাকে। যাতে স্থালাভিষিক্ত জিনিষ মূল জিনিসের পরিপন্থী না হয়। মাথা মাসেহ্ সত্ত্বাগতভাবেই আসল, এটি কারও শাখা নয়। তাছাড়া, এটাকে তায়াম্মুমের উপর কিয়াস করা মানে আসলকে শাখার উপর কিয়াস করা। এটা জায়েয নেই। অতএব, মাথা মাসেহকে মোজার উপর মাসেহের উপরই কিয়াস করা যেতে পারে, তায়াম্মুমের চেহারা মাসেহের উপর নয়।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আমানিল আহবার ঃ ১/১৪৪, ১৪৯, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ ১/১২, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ১/১৩৬

## باب حكم الاذنين فى وضوء الصلوٰة

## অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের ওযুতে কর্নদ্বয়ের হুকুম কর্ণদ্বয় মাসেহের ধরণ

### মাযহাবের বিবরণ ঃ

১. ইমাম যুহরী এবং দাউদ জাহিরী র. এর মতে, কর্নদ্বয়ের অভ্যন্তর ও বহিরাংশ উভয়টিই চেহারার সাথে ধৌত করতে হবে। কর্ণদ্বয় চেহারার অন্তর্ভুক্ত।

২. ইমাম ইসহাক র.-এর মতে, অভ্যন্তর অংশ চেহারার সাথে মাসেহ করতে হবে, আর বহিরাংশ মাসেহ করতে হবে মাথার সাথে।

৩. ইমাম শা'বী ও হাসান ইবনে সালিহ র.-এর মতে, মাথার সাথে বহিরাংশ মাসেহ করতে হবে, আর অভ্যন্তর অংশ ধৌত করতে হবে চেহারার সাথে। তাহাভী র. فذهب قوم দ্বারা তাদের কথা বর্ণনা করেছেন।

৪. ইমাম চতুষ্ঠয় সুফিয়ান সাওরী, ইবনে মুবারক ও অধিকাংশ ইমামের মতে, বহিরাংশ ও অভ্যন্তর অংশ উভয়টিকেই মাসেহ করতে হবে। কান মাথার পর্যায়ভুক্ত। মাথার সাথে তা মাসেহ করতে হবে। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে আবার মতবিরোধ রয়েছে যে, কর্নদ্বয় কি মাথার অধীনস্থ যে, স্বতন্ত্রভাবে পানির প্রয়োজন নেই? বরং মাথার অবশিষ্ট পানি দ্বারাই মাসেহ যথেষ্ট? নাকি মাথার অধীনস্থ নয়, বরং এর জন্য নতুন পানি নেয়া প্রয়োজন? হানাফীগণের মাযহাব প্রথমটি। শাফিঈদের মত দ্বিতীয়টি।

ইমাম তাহাভী র. শুধু মাসেহের ধরন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাতে একদিকে রয়েছেন, ইমাম শা'বী ও হাসান ইবনে সালিহ র., অপরদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিম যে কর্নদ্বয়ের বহিরাংশ মাথার অধীনস্থ হয়ে মাসেহকৃত হবে, আর অভ্যন্তরাংশ চেহারার অধীনস্থ হয়ে ধৌত হবে? নাকি বহিরাংশ ও ভিতরাংশ উভয়টি মাথার অধীনস্থ হয়ে মাসেহকৃত হবে? এর উপর ইমাম তাহাভী র. দুটি নজর বা যুক্তি পেশ করেছেন।

وَامَّا مِن طريقِ النظرِ فانَّا قَد رأينَاهم لَايختلِفُونَ اَن المحرِمةَ ليسَ لهَا اَنَ تُغطِّىَ وجهَها ولَها ان تُغطِّىَ رأسَها وكلٌّ قَد اَجمعَ اَنَّ لهَا ان تغطِّىَ اذنيْهَا ظاهرَهما وباطنَهما، فدلَّ ذالكَ اَن حكمَهما حكمُ الرأسِ فِى المسحِ لَا حكمُ الوجهِ -

## কর্ণদ্বয়ের সামনে ও পেছনের অংশ মাসেহ

**প্রথম যৌক্তিক প্রমাণ ঃ** ইহরাম অবস্থায় মহিলার জন্য স্বীয় চেহারা ঢাকার অনুমতি নেই। কিন্তু মাথা ঢাকার অনুমতি আছে। এতে কারও মতবিরোধ নেই। এদিকে এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, সে মহিলার জন্য নিজের কর্নদ্বয়ের বহিরাংশ ও ভিতরাংশ উভয়টিই ঢাকা জায়েয আছে। অতএব, যেরূপভাবে ইহরামের মাসআলায় কর্নদ্বয়ের উপর ও ভিতরের অংশ মাথার পর্যায়ভুক্ত, এরূপভাবে ওযুতেও উভয়টিই মাথার পর্যায়ভুক্ত হবে।

وحجةٌ اخرٰى اَناَّقَدْرأينَاهُم لَم يختلِفُوا اَن مَا ادبرَ مِنهمَا يمسحُ مع الرأسِ واختلَفُوا فِيمَا اقبلَ مِنهُما علىٰ مَاذكرنَا فنظرْنَا فِى ذالكَ فرأينَا الاعضاءَ التِىْ قَدِ اتفقُوْا على فرضِيتِها فِى الوضوْ هِى الوجهُ واليدانِ والرجلانِ والرأسُ، فكانَ الوجهُ يغسلُ كلُّه وكذالكَ اليدانِ وكذلكَ الرجلانِ ولم يكنْ حكمُ شيْءٍ مِن تِلكَ

الاعضاءِ خلافَ حكمِ بقيتِه بَل جعلَ حكمُ كلِّ عضوٍ منها حكمًا واحدًا فجعلَ مغسولاً كلُّه وممسوحًا كلُّه واتفقُوا اَنَّ مَا ادبَرمِن الاذنينِ فحكمُه المسحُ، فالنظرُ على ذالكَ ان يكونَ مَا اقبلَ منهمَا كذالكَ وان يكونَ حكمُ الاذنينِ كلُّه حكمًا واحدًا كمَا كانَ حكمُ سائِر الاعضاءِ التىْ ذكرْنَا فهذاَ وجهُ النظرِ فِى هذا البابِ وهُو قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمهُم اللهُ تعالىٰ ـ

**দ্বিতীয় যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

ওযুতে ফরয অঙ্গ চারটি– তিনটি ধৌত করতে হয়– চেহারা, হাত, পা। একটি অঙ্গ মাসেহ করতে হয়। আমাদের সামনে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, যে সব অঙ্গে ধোয়ার হুকুম সেগুলোকে পরিপূর্ণরূপে ধৌত করতে হয়। এরূপ নয় যে, এক অঙ্গের কিছু অংশ ধৌত করবে আর কিছু অংশ মাসেহ করবে। যে সব অঙ্গে মাসেহের হুকুম সেগুলোতে পরিপূর্ণ মাসেহই করতে হয়। কিছু অংশ মাসেহ করবে আর কিছু ধৌত করবে এরকম নয়। এদিকে কর্নদ্বয়ের বহিরাংশ মাসেহ করতে হয়, এ ব্যাপারে প্রতিপক্ষও আমাদের সঙ্গে একমত। মতানৈক্য হল অভ্যন্তরভাগ সম্পর্কে। এতে তারা ধোয়ার হুকুম দেন। অথচ ওযুর অঙ্গ সম্পর্কে মূলনীতি হল, কোন এক অঙ্গে এরূপ কোন বিভাজন হয় না যে, কিছু মাসেহ করবে আর কিছু ধৌত করবে। কাজেই কর্নদ্বয়ের কোন কোন অংশ সম্পর্কে যেহেতু তারাও মাসেহের প্রবক্তা, সেহেতু আবশ্যিকভাবেই কর্নদ্বয়ের অবশিষ্ট অংশে তাদের মাসেহ মেনে নিতে হবে। যাতে একই অঙ্গে পার্থক্য না হয়।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঈযাহুত তাহাভী ঃ ১/১৩৭-১৩৯

## باب فرض الرجلين فى وضؤ الصلوة

## অনুচ্ছেদ ঃ ওযুতে পদদ্বয়ের ফরয

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. শিয়া ইমামিয়াদের মতে, পদদ্বয় মাসেহ করা ফরয, ধোয়া জায়েয নেই।

২. হাসান বসরী, ইবনে জারীর তাবারী এবং আবু আলী জুব্বাঈ -এর মতে উভয়ের মধ্যে ইখতিয়ার রয়েছে– ইচ্ছে করলে ধৌত করবে, আর ইচ্ছে করলে মাসেহ করবে।

৩. ইমাম যুহরী ও আহলে জাহিরের মতে, ধৌতও করবে এবং মাসেহও করবে।

৪. সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবী, তাবিঈ ও ইমামগণের মতে, পায়ে মোজা না থাকলে পদদ্বয় ধৌত করা ফরয।

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

وامَّا وجهُه مِن طريقِ النظرِ فَاِنَّا قد ذكرنَا فِيمَا تقدَّمَ مِن هٰذا الباب عَن رسولِ اللّٰهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ مَا لِمن غَسلَ رجليهِ فِى وضوئِه مِن الثوابِ، فَثبتَ بذالكَ اَنهمَا مِمَّا يغسلُ وانَّهما ليستَا كالراسِ الذىْ يُمسحُ وغاسلُه لاثوابَ لهُ فِى غسلِهٖ ـ (وذالكَ الحديثُ عَن عمرِ وبنِ عنبسةَ سمعتُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ يقولُ اِذاَ دعَا الرجلُ بِطهورهٖ فغسلَ وجهَه سقطتْ خطَاياهُ مِن وجهِه واطرافِ لحيَتِهٖ فاِذاَ غسلَ يديهِ سقطتْ خطايَاه مِن اطرافِ اَناملِه فَاِذا مسحَ برأسِه سقطتْ خطاياهُ مِن اطرافِ شعرِهٖ، فاِذَا غسلَ رجلَيه خَرجتْ خَطايَا رجلَيهِ مِن بُطونِ قَدمَيهِ ـ)

পূর্বোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা বুঝা যায়, ওযুতে পদদ্বয় ধৌত করার সময় এগুলো থেকে গুনাহ বেরিয়ে যায়। আবার যদি উভয় পায়ে মাসেহ করা ফরয হত, তবে ধৌত করার সময় পা থেকে গুনাহ বের হত না। যেমন– মাথায় ফরয হল, মাসেহ করা। যদি কেউ মাসেহের পরিবর্তে ধৌত করে, তবে তা থেকে গুনাহ ঝড়বে না। কাজেই পদদ্বয় থেকে ধৌত করার সময় গুনাহ ঝড়ে পড়া এ কথার প্রমাণ যে, পদদ্বয়ের মধ্যে ফরয হল ধৌত করাই, অন্য কিছু নয়।

وَقد زَعم زاعمٌ اَن النظرَ يوجبُ مسحَ القدمينِ فِى وضوءِ الصلٰوةِ قَالَ لِانىْ رأيتُ حكمَهُما بِحكمِ الرأسِ اشبهَ لِانى رأيتُ الرجلَ اذا عدمَ الماءُ فصارَ فرضُه التيممَ يَمَّمَ وجهَه ويديهِ ولَا يُيَمِّمُ رأسَه ولَا رجلَيهِ، فلمَّا كانَ عدمُ الماءِ يُسقِطُ فرضَ غسلِ

الـوجـهِ والـيـديـنِ الـى فـرضٍ اخرَ وهـم الـتـيـمـمُ ويَسقط فـرضُ الـرأسِ والرِجليـنِ لَا الى فَـرضٍ ثَبتَ بـذالكِ اَنَّ حـكمَ الرجْـليـنِ فِـى حـالِ وجـودِ الـمـاءِ كَحُكمِ الرأسِ لَا كَحكمِ الـوجـهِ والـيـديـنِ

**মাসেহের প্রবক্তাদের একটি প্রশ্ন ঃ**

কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, যুক্তির দাবি হল, উভয় পা মাসেহ করাই। কারণ, হুকুমের ক্ষেত্রে মাথার সাথে পদদ্বয়ের সাদৃশ্য বেশি। এ কারণে পানি না পাওয়া গেলে, ওযুর ফরয যখন তায়াম্মুম হয়ে যায়, তখন শুধু চেহারা ও হাত মাসেহ করতে হয়, মাথা ও পা নয়। অতএব, পানি না থাকলে চেহারা ও হস্তদ্বয়ের ফরয এর একটি বদলের দিকে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু মাথা ও পদদ্বয়ের ফরয বদলের দিকে স্থানান্তরিত হয় না। বরং এ দু'টি বাদ পড়ে যায়। কাজেই পানি না থাকলে যেহেতু পদদ্বয়ের হুকুম মাথার ন্যায়, সেহেতু পানি থাকলে এর হুকুম মাথারই ন্যায় হবে। যেরূপভাবে মাথা মাসেহ করা হয়, সেরূপভাবে পদদ্বয়ও মাসেহ করা উচিত।

فـكـانَ مِـن الـحجةِ عـلـيـهِ فـى ذالـكَ اَنـا رأيـنَـا اَشـيـاءَ يـكـونُ فـرضُـهـا الـغَـسـلُ فـى حـالِ وجـودِ الـمـاءِ ثـم يُـسـقـطُ ذالـك الـفـرضُ فـى حـالِ عـدمِ الـمـاءِ لا الـى فـرضٍ، مِـن ذالـكَ الـجـنـبُ عـلـيـهِ ان يـغـسـلَ سـائـرَ بـدنِـه بـالـمـاءِ فـى حـالِ وجـوده وان عـدمَ الـمـاءُ وجـبَ عـلـيـهِ الـتـيـمـمُ فـى وجـهِـهِ ويـديـهِ، فـاسـقـطَ فـرضَ حـكـمِ سـائـرِ بـدنـهِ بـعـدَ الـوجـهِ والـيـديـنِ لا الـى بَـدلٍ فـلـم يـكُـنْ ذالـكَ بـدلـيـلِ اَنَّ مـاسـقـطَ فـرضُـه مـن ذالـكَ لا الـى بـدلٍ كَـانَ فـرضُـه فـى حـالِ وجـودِ الـمـاءِ هـو الـمـسـحَ فـكـذالـكَ ايـضـا لايـكـونُ سقـوطُ فـرضِ الـرجـلـيـنِ فـى حـالِ عـدمِ الـمـاءِ لا الـى بـدلٍ بـدلـيـلِ اَنَّ حُـكـمَـهـا كـانَ فِـى حـالِ وجـودِ الـمـاءِ هـو الـمـسـحَ، فـبـطـلـتْ بـذالـك عـلـةُ الـمُـخـالـفِ اذا كـانَ قـد لـزِمَـه فـى قـولـهِ مِـثـل مَـا الـزمَ خـصـمُـه ـ

**উত্তর॥** প্রশ্নকারীর বক্তব্য দ্বারা একটি মূলনীতি বুঝা যায়, পানি না থাকলে যে অঙ্গের ফরয বিনা বদলের দিকে স্থানান্তরিত হয়, সেখানে পানির বর্তমানে

ফরয হবে মাসেহ করা– এই মূলনীতিটি সহীহ নয়, কারণ আমরা এরূপ অনেক জিনিস দেখেছি যে, পানির বর্তমানে সেগুলোতে ফরয ছিল ধৌত করা, কিন্তু পানি না থাকলে এই ফরয বদলহীনভাবে বাতিল হয়ে যায়। যেমন– গোসল ফরয বিশিষ্ট ব্যক্তির পূর্ণ শরীর পানি দ্বারা ধৌত করা ওয়াজিব, যখন পানি পাওয়া যায়। কিন্তু যদি পানি না পাওয়া যায়, তখন চেহারা ও হস্তদ্বয় মাসেহ করে তায়াম্মুমের নির্দেশ রয়েছে। অবশিষ্ট দেহের হুকুম বিনা বদলে বাতিল হয়ে যায়। সেখানে কিছুই করতে হয় না। অতএব, এরূপ বলা হবে যে, চেহারা ও হস্তদ্বয় ছাড়া অবশিষ্ট দেহের হুকুম পানি না পেলে যেহেতু বদলহীনভাবে বাতিল হয়ে যায়, সেহেতু পানি পেলে এর মধ্যে ফরয হবে মাসেহ করা, তথা গোসল ফরয বিশিষ্ট ব্যক্তি পানি পেলে শুধু চেহারা এবং হাত ধৌত করবে, অবশিষ্ট দেহ মাসেহ করবে– প্রশ্নকারীর এই মূলনীতিই ভুল।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আমানিল আহবার ঃ ১/১৮৩. ফাতহুল মুলহিম ঃ ১/৪০৩, মাআরিফুস সুনান ঃ ১/১৮৯, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ ১/১৫, আল মুগনী ঃ ১/৯১, আল বাহরুর রায়িক ঃ ১/১৪

## باب الوضوء هل يجب لكل صلوة ام لا ؟

## অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিটি নামাযের জন্য কি ওযু ওয়াজিব?

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. শিয়া ও আসহাবে জাওয়াহিরের মতে মুকীমের জন্য প্রতিটি নামাযের জন্য নতুন ওযু করা ওয়াজিব। চাই তার ওযু থাকুক বা না থাকুক, অর্থাৎ, অপবিত্র থাকুক বা পবিত্র। فذهب قوم الى ان الحاضرين الخ দ্বারা তাঁরাই উদ্দেশ্য।

২. সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমাম ও আলিমের মতে তথা ইমাম চতুষ্টয় ও অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে, মুকীম অথবা মুসাফির কারও ক্ষেত্রে প্রতিটি নামাযের জন্য নতুন ওযু করা ওয়াজিব নয়। وخالفهم فى ذالك اكثر العلماء দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইমাম তাহাভী র. এ বিষয়ে দু'টি যৌক্তিক প্রমাণ কায়েম করেছেন।

وَاما وجهُ ذالكَ من طريقِ النظرِ فانَّا رأينا الوضوءَ طهارةً من حدثٍ فَاردنَا ان ننظرَفى الطهاراتِ من الاَحداثِ كيفَ حكمُها ومَا الذىْ ينقضُها؟ فَوَجدنَا الطهاراتِ التى تُوجبُها الاحداثُ على

ضربين، فمنها الغسلُ ومنها الوضوءُ، فكان مَن جامعَ واَجنبَ وجبَ عليه الغسلُ وكانَ مَن بالَ اوتغوّط وجبَ عليه الوضوءُ فكانَ الغسلُ الواجبُ بمَا ذكرنَا لاينقضُه مرورُ الاوقاتِ ولَاينقضُه الا الاَحداثُ، فَلمَّا ثبتَ ان حكمَ الطهارةِ من الجماعِ والاحتلامِ كمَا ذكرنَا كانَ فى النظرِ ايضا ان يكونَ حكمُ الطهاراتِ من سائرِ الاحداثِ كذالكَ وانهٗ لايَنقضُ ذالك مرورُ وقتٍ كما لا ينقضُ الغسلَ مرورُ وقتٍ -

**প্রথম যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

ওযু হল অপবিত্রতা থেকে এক প্রকার পবিত্রতা। অতএব, চিন্তা করতে হবে, অপবিত্রতা থেকে অন্যান্য পবিত্রতার কি হুকুম? কি বিষয় এসব পবিত্রতা নষ্ট করে? আমরা দেখলাম, পবিত্রতা দুই প্রকার−

১. বড় পবিত্রতা যেমন গোসল, ২. ছোট পবিত্রতা যেমন ওযু। এরূপভাবে যেসব অপবিত্রতার কারণে পবিত্রতা ওয়াজিব হয়, সেগুলো দুই প্রকার−

১. বড় অপবিত্রতা যেমন জানাবাত (গোসল ফরয হওয়ার মত অপবিত্রতা) স্বপ্নদোষ সহবাস ইত্যাদি।

২. ছোট অপবিত্রতা যেমন প্রস্রাব-পায়খানা করা ইত্যাদি। বস্তুতঃ বড় পবিত্রতা শুধু বড় অপবিত্রতা যেমন গোসল ফরয হওয়া, স্বপ্নদোষ ইত্যাদির কারণে নষ্ট হয়। এটা সময় অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে নষ্ট হয় না। বড় অপবিত্রতা ছাড়া এমনিতেই একটি নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরে গোসল ভেঙ্গে যাবে ও নতুন গোসল ফরয হবে− এমন হয় না, বরং বড় পবিত্রতা শুধু বড় অপবিত্রতা দ্বারাই নষ্ট হয়। এতে কারও কোন মতবিরোধ নেই। কাজেই, বড় পবিত্রতার মত ছোট পবিত্রতাও শুধু অপবিত্রতার কারণেই নষ্ট হবে। সময় অতিক্রান্ত হওয়ার ফলে নষ্ট হবে না। কাজেই এক ওযু দ্বারা কয়েক ওয়াক্ত নামায আদায় করা সহীহ হবে।

وحُجَّةٌ اُخرىٰ انـاَّ رأينَاهم اَجمعُوا اَنَّ المسافرَ يُصلىْ الصلواتِ كلَّها بوضوءٍ واحدٍ مالم يُحدثْ وَانما اختلفُوا فِى الحاضرِ فوجدنَا الاَحداثَ من الجماعِ والاحتلامِ والغائطِ والبولِ وكلَّ ما اِذا كانَ مِن

الحاضرِ كانَ حدثًا يُوجِبُ به عليه طهارةً، فانه اذا كانَ منَ المسافرِ كان كذالكَ ايضا ووجبَ عليه من الطهارةِ مايجبُ عليهِ لَو كانَ حاضرًا ورأينَا طهارةَ اخرٰى يَنقضُها خروجُ وقتٍ وهى المسحُ على الخفينِ فكانَ الحاضرُ والمسافرُ فى ذالكَ سواءً ينقضُ طهارتَهما خُروجُ وقتٍ مًا ـ وانِ كانَ ذالكَ الوقتُ فى نفسهِ مختلفًا فى الحاضرِ والمسافرِ، فلَمَّا ثبتَ انَّ ماذكرنَا كذالكَ واَن ما ينقضُ طهارةَ الحاضرِ من ذالكَ يَنقضُ طهارةَ المسافرِ وكانَ خروجُ الوقتِ عن المسافرِ لاينقضُ طهارتَه كان خروجُه عن المقيمِ ايضا كذالكَ قِياسًا ونظرًا علٰى مابينَّا من ذالكِ ـ وَهذا قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمهمُ اللهُ تعالٰى ـ

**দ্বিতীয় যৌক্তিক কারণ ঃ**

দ্বিতীয় যৌক্তিক কারণ হল, মুসাফির সম্পর্কে সবার ঐকমত্য রয়েছে যে, এক ওযু দ্বারা যত ইচ্ছা নামায পড়তে পারে, যতক্ষণ না অপবিত্র হয়। কিন্তু মুকীম সম্পর্কে মতবিরোধ হয়ে গেছে, তার উপর প্রতিটি নামাযের জন্য ওযু করা আবশ্যক কিনা?

আমরা দেখছি যে সব অপবিত্রতা (যেমন সহবাস, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাব-পায়খানা ইত্যাদি) এর কারণে মুকীমের উপর পবিত্রতা আবশ্যক হয়। এসব অপবিত্রতার কারণেই মুসাফিরের উপরও পবিত্রতা আবশ্যক হয়। অর্থাৎ, পবিত্রতা ভঙ্গের ক্ষেত্রে মুকীম ও মুসাফিরের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। যেরূপভাবে আমরা আরেকটি পবিত্রতাকে দেখি, সেটি সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর পবিত্রতা ভঙ্গ করে, সেটি হল– মোজার উপর মাসেহের মাধ্যমে যে পবিত্রতা অর্জিত হয়, সেটি সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর ভেঙ্গে যায়। কিন্তু এতে মুকীম ও মুসাফির উভয়েই সমান। অবশ্য পার্থক্য হল শুধু মুসাফিরের মেয়াদ কিছুটা দীর্ঘ, আর মুকীমেরটি কিছুটা সংকীর্ণ।

সারকথা, পবিত্রতা ভঙ্গের ক্ষেত্রে মুকীম ও মুসাফির সমান। কাজেই, সময় অতিক্রমণ যেহেতু আপনাদের মতানুযায়ীও মুসাফিরের ওযু ভঙ্গ করে না সেহেতু মুকীমের ওযুও ভঙ্গ করবে না। যুক্তির দাবি এটাই।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঈযাহুত তাহাভী ১/৫৮, ১৬৫-১৬৬, আমানিল আহবার ঃ ১/২১৭

## باب الرجل يخرج من ذكره المذى كيف يفعل

## অনুচ্ছেদ ঃ লজ্জাস্থান থেকে মজি বের হলে কি করবে?

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. ইমাম মালিক র. এর মতে, মজি বের হলে পূর্ণ পুরুষাঙ্গ ধৌত করা ওয়াজিব।

২. ইমাম আহমদ, আওযাঈ, কোন কোন হাম্বলী ও কোন কোন মালিকীর মতে পূর্ণ পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষদ্বয় ধৌত করা ওয়াজিব। فذهب قوم الى ان غسل المذاكير واجب দ্বারা তাঁরাই উদ্দেশ্য।

৩. হানাফী ও শাফিঈদের মতে শুধু অপবিত্র স্থান ধৌত করা যথেষ্ট। এর বেশি ধোয়া ওয়াজিব নয়। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَاما وجهُ ذالكَ من طريقِ النظرِ فانّا رأينا خروجَ المذِىّ حدثًا فَاردنَا ان ننظرَ فى خروجِ الأحداثِ ما الذىْ يجبُ به، فكانَ خروجُ الغائطِ يجبُ بهِ غَسلُ ما اصابَ البدنَ منهُ ولا يجبُ غسلُ ماسِوٰى ذالكَ الا التطهُّر للصلوةِ وكذالكَ خروجُ الدمِ مِن اى موضعٍ ماخرجَ فى قولِ مَن جعلَ ذالك حدثًا، فالنظرُ على ذالكَ ان يكونَ كذلكَ خروجُ المذىِّ الذىْ هو حدثٌ لايجبُ فيه غسلُ غيرِ الموضعِ الذىْ اصابَه من البدنِ غيرُ التطهرِ للصلوةِ، فثبتَ ذالكَ ايضا بِما ذكرنَا من طريقِ النظرِ وهذا قولُ ابى حنيفةَ وأَبى يوسفَ ومحمدِ بن الحسنِ رحمهُم اللهُ تعالىٰ -

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

মজি বহির্গত হওয়া এক প্রকার অপবিত্রতা। অন্যান্য অপবিত্রতা সম্পর্কে সবার ঐকমত্য রয়েছে যে, সেখানে শুধু অপবিত্র স্থান ধৌত করাই যথেষ্ট। অতিরিক্ত কোন অংশ ধৌত করা জরুরি নয়। যেমন– পায়খানা বের হওয়া এক

প্রকার অপবিত্রতা। এতে শুধু নাপাক স্থান ধৌত করাই ওয়াজিব হয়। এমনিভাবে রক্ত বের হলেও যারা এটাকে অপবিত্রতা সাব্যস্ত করেন, তাদের মতে শুধু নাপাক স্থানটি ধৌত করা আবশ্যক। কাজেই অন্যান্য অপবিত্রতার ন্যায় মজি নির্গত হলেও শুধু অপবিত্র স্থান ধৌত করাই জরুরি হবে। এর চেয়ে অতিরিক্ত কোন অংশ ধৌত করা জরুরি নয়। অবশ্য অপবিত্রতার পর নামাযের জন্য ওযু করা যেখানে অপবিত্র স্থান ছাড়া অন্য জায়গাও ধৌত করা আবশ্যক নয়– এটি একটি আলাদা বিষয়।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আমানিল আহবার ঃ ১/২৩৫, নায়লুল আওতার ঃ ১/৫২, আওজাযুল মাসালিক ঃ ১/৯০, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ১/১৬৯, ১৭৫

## باب حكم المنى هل هو طاهرام نجس

## অনুচ্ছেদ ঃ মণি তথা বীর্য পবিত্র না অপবিত্র?

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. ইমাম শাফিঈ ও আহমদ ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ ও দাউদ জাহিরী র.এর মতে মানুষের বীর্যও পবিত্র। এটাকে যে ধৌত করা হয়, তা পবিত্র করার জন্য নয় বরং পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্যে। فذهب ذاهبون الى ان المنى طاهر দ্বারা তাঁরাই উদ্দেশ্য।

২. ইমাম আবু হানীফা মালিক আওযাঈ, লাইস ইবনে সাদ ও হাসান ইবনে সালিহ র. এর মতে বীর্য অপবিত্র। এটি দূর করা হয় পবিত্র করার জন্য। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা ও মালিক র. এর মধ্যে পবিত্র করার পদ্ধতি সম্পর্কে মতবিরোধ হয়ে গেছে। ইমাম মালিক র. এর মতে শুধু ধৌত করার ফলে পবিত্র হবে, অন্য কোন পন্থায় নয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা র. এর মতে যদি তরল অথবা আর্দ্র থাকে, তবে ধৌত করার প্রয়োজন আছে। আর যদি বীর্য গাঢ় এবং শুষ্ক হয়, তবে যে কোনভাবে তা দূরীভূত করলে পবিত্র হয়ে যাবে। চাই ধোয়ার মাধ্যমে হোক, অথবা খুঁচিয়ে তোলার মাধ্যমে হোক, কিংবা অন্য কোন পন্থায়, সর্বাবস্থায় পবিত্র হয়ে যাবে।

**বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ** বীর্য শুষ্ক হলে কাপড় থেকে খুঁচিয়ে তুলে ফেললে পবিত্র হয়ে যায়– এ ফতওয়া তৎকালীন যুগের। কারণ, তখনকার যুগের লোকদের বীর্য হত খুবই গাঢ়। বর্তমান যুগের মানুষের সে শক্তি নেই। দুর্বল হয়ে গেছে। বীর্য

পাতলা হয়ে থাকে। ফলে বীর্যের অধিকাংশ খুঁচিয়ে তুললে ও তা দূর হয় না। এজন্য বর্তমান যুগে তা খুঁচিয়ে তোলা যথেষ্ট নয়। বরং ধুয়ে ফেলা আবশ্যক। এর উপরই ফতওয়া।

قَال ابُو جعفرٍ فلمَّا اختلفَ فيه هذا الاختلافَ لم يكنْ فِيما رُوينَا عن رسولِ الله صلى اللهُ عليه وسلمَ دليلٌ على حكمِهٖ كيفَ هو اعتبرْنَا ذٰلك من طريقِ النظرِ فوجدنَا خروجَ المنيِّ حَدثًا اغلظَ الاحداثِ لِانهٗ يُوجبُ اكبرَ الطهاراتِ، فاردنَا ان ننظرَ فى الاشياءِ التى خروجُها حدثٌ كيفَ حكمُها فى نفسِها، فَرأينَا الغائطَ والبولَ خروجُهما حدثٌ وهمَا نجسانِ فى انفسِهما وكذالكَ دمُ الحيضِ والاستحاضةِ هما حدثٌ وهما نجسانِ فى انفسِهما ودمُ العروقِ كذالكَ فى النظرِ، فلمَّا ثبتَ بمَا ذكرنَا اَن كلَّ ماكانَ خروجُه حدثًا فهوَ نجسٌ فى نفسهٖ وقد ثبتَ ان خروجَ المنيِّ حدثٌ ثبتَ ايضا انه فِى نفسهٖ نجسٌ فهذا هو النظرُفيه غيرَ انا اتبعنَا فى اباحةِ حَكِّهٖ اِذا كانَ يابسًا ما رُوى فى ذلكَ عنِ النبيِ صلى اللهُ وسلمَ وهذا قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمهم اللهُ تعالى -

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

বীর্য নির্গমন এক প্রকার অপবিত্রতা। বরং সবচেয়ে কঠিন অপবিত্রতা। কারণ, এটি সবচেয়ে বড় পবিত্রতা গোসলকে আবশ্যক করে। অতএব, আমাদের সেসব জিনিসের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত, যেগুলোর নির্গমন অপবিত্রতার কারণ হয় যে, এটি সত্ত্বাগতভাবে পবিত্র না অপবিত্র? আমরা দেখলাম, প্রস্রাব-পায়খানা, মাসিকের রক্ত, রক্তপ্রদর এবং প্রবাহিত রক্ত ইত্যাদি নির্গমন অপবিত্রতার কারণ। অবশ্য রক্তপ্রদর সম্পর্কে ইমাম মালিক র. এর মতবিরোধ রয়েছে। এসব জিনিস সত্ত্বাগতভাবে নাপাক। এতে কারও কোন মতবিরোধ নেই। কাজেই আমরা বুঝতে পারলাম, যে সব জিনিসের নির্গমন অপবিত্রতার কারণ হয়, সেগুলো সত্ত্বাগতভাবে অপবিত্র হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বীর্য নির্গমন সর্বসম্মতিক্রমে অপবিত্রতা, বরং সবচেয়ে বড় অপবিত্রতা। সেহেতু বীর্য নাপাকই হওয়া উচিত।

অবশ্য বীর্য যদি শক্ত এবং শুষ্ক হয়, তবে খুঁচিয়ে তুলে ফেললে পবিত্র হওয়া যায়– এর কারণ সেসব হাদীস যেগুলোতে খুঁচিয়ে বা খুটে তুলে ফেলার বিবরণ রয়েছে। যেমন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর হাদীসে রয়েছে–

كنت افركُ المنيَّ من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اِذا كانَ يابسا واَغسلُه اذا كان رطبًا ۔

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বযলুল মাজহুর ঃ ১/১২৮, আওজাযুল মাসালিক ঃ ১/১১৪, আল কাওকাবুদ দুররী ঃ ১/৬৯, আমানিল আহবার ঃ ১/২৫৩-২৫৪ ফাতহুল মুলহিম ঃ ১/৪৫২, মাআরিফুস সুনান ঃ ১/৩৮৩ নায়লুল আওতার ঃ ১/৪৫, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ১/১৭৭, ১৮৭।

## باب الذى يجامع ولاينزل

## অনুচ্ছেদ ঃ যে বীর্যপাতহীন সহবাস করে

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

বীর্যপাতহীন সহবাসকে আরবীতে বলে ইকসাল। এর ফলে গোসল ওয়াজিব হয় কিনা? এ প্রসঙ্গে প্রথমত সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। কিন্তু হযরত উমর ফারুক রা.এর খেলাফত আমলে এই মতবিরোধের ইতি ঘটে। সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত হয়ে যান যে, নারী-পুরুষের খতনাস্থল পরস্পরে মিলিত হলে গোসল ওয়াজিব হবে। চাই বীর্যপাত হোক বা না হোক। সমস্ত ইমাম ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিস এ মত পোষণ করেন।

শুধু দাউদ জাহিরী এবং নগন্য কিছু সংখ্যক লোকের মত হল, শুধু উভয়ের খতনাস্থল একত্রিত হলে গোসল ওয়াজিব হবে না, যে পর্যন্ত বীর্যপাত না হবে। ইমাম তাহাভী র. এ বিষয়ে তিনটি যৌক্তিক প্রমাণ পেশ করেছেন।

واما وجههٗ من طريقِ النظرِ فانا رأينا هم لم يختلفُوا ان الجماعَ فى الفرجِ الذى لا انزالَ معهٗ حدثٌ فقالَ قومٌ هو اغلظَ الاحداثِ فاوجَبُوا فيه اغلظَ الطهاراتِ وهو الغسلُ ۔

وقالَ قومٌ هو كاخفِّ الاحداثِ فاوجبُوا فيه اخفَ الطهاراتِ وهو الوضوءُ فاردنَا ان ننظرَ الى التقاءِ الخِتانينِ هل هو اغلظُ الاشياءِ فَنوجِبُ فيه اغلظَ مايجبُ فى ذالكَ فوجدْنَا اشياءَ يوجبُها الجماعُ

وهو فسادُ الصيامِ والحجِ فكانَ ذالك بالتقاءِ الختانينِ وانِ لم يكنْ معه انزالٌ ويوجبُ ذالكَ فى الحجِ الدمَ وقضاءَ الحجِّ۔

ويُوجبُ فى الصيامِ القضاءَ والكفارةَ فى قولِ من يوجبُها ولو كانَ جامعَ فيما دونَ الفرجِ وجبَ عليه فى الحجِّ دمٌ فقطْ ولم يَجبْ عليه فى الصيامِ شئٌ الا ان يُنزِلَ وكلُّ ذالكَ محرَّمٌ عليهِ فى حجهِ وصيامِهِ

وكانَ مَن زَنى بامرأةٍ حُدَّ وان لم يُنزِلْ ولو فعلَ ذالك على وجهِ شبهةٍ فَسقَطَ بِها الحدُّ عنه وجبَ عليه المهرُ وكانَ لو جامعَها فيمَا دون الفرجِ لم يجبْ عليهِ فى ذالك حدٌّ ولامهرٌ ولكنه يُعزَّرُ اِذا لم تكنْ هناكَ شبهةٌ۔

وكانَ الرجلُ اذا تزوجَ المرأةُ فجامعَها جماعًا لاخلوةَ معهُ فى الفرجِ ثم طلقَها كانَ عليه المهرُ انزلَ او لم يُنزلْ وجبتْ عليهَا العدةُ واَحلَّها ذالكَ لزوجِها الاولِ

وَلو جامعَها فِيما دونَ الفرجِ لم يجبْ فى ذالكَ عليه شئٌ وكانَ عليهِ فى الطلاقِ نصفُ المهرِ اِن كان سمّٰى لهَا مهرًا والمتعةُ اذا لم يكنْ سمّٰى لهَا مهرًا فكانَ يجبُ فى هذه الاشياءِ التى اَوصفنَا التى لااِنزالَ معهَا اغلظُ ما يجبُ فى الجماعِ الذى معهُ الانزالُ مِن الحدودِ والمهورِ وغيرِ ذالكَ، فالنظرُ علَى ذالكَ ان يكونَ كذالكَ هو فِى حكمِ الاحداثِ اغلظَ الاحداثِ ويجبُ فيه اغلظُ مايجبُ فى الاحداثِ وهو الغسلُ۔

**প্রথম যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

যোনিতে বীর্যপাতহীন সঙ্গম সবার মতে অপবিত্রতার কারণ। কিন্তু এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, এটি বড় অপবিত্রতা না ছোট অপবিত্রতা? এক দলের মতে এটি বড় অপবিত্রতা। এর ফলে বড় পবিত্রতা তথা গোসল ওয়াজিব।

আর এক দলের মতে এটি ছোট অপবিত্রতা। অতএব, এটি ছোট পবিত্রতাকে অর্থাৎ, ওযুকে আবশ্যক করবে।

এবার লক্ষ্যণীয় বিষয় হল– উভয়ের খতনাস্থলের পারস্পরিক মিলন হালকা জিনিস না কঠোর? যদি কঠোর হয়, তবে পবিত্রতা হতে হবে বড়। আর হালকা হলে পবিত্রতা হতে হবে ছোট। আমরা লক্ষ্য করছি যে, বীর্যপাতহীন সহবাস অর্থাৎ, উভয়ের খতনাস্থল পরস্পরে মিলিত হওয়া এবং সবীর্য সঙ্গম উভয়টি হুকুমের ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ে সমান। যেমন–

১. وهو فساد الصيام والحج الخ রোযা অবস্থায় সবীর্য সঙ্গমের ফলে রোযা ফাসিদ হয়। এর ফলে কাযা কাফফারা ওয়াজিব হয়। এরূপভাবে শুধু উভয়ের খতনাস্থল পরস্পরে মিলিত হলেও কাযা-কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হয়। যদিও বীর্যপাত নাই হোক না কেন (কোন কোন নগন্য উক্তি মতে উভয় ছুরতে কাফফারা ওয়াজিব নয়)।

২. হজ্জে সবীর্য সহবাসের কারণে দম এবং কাযা উভয়টি ওয়াজিব হয়। এরূপভাবে উভয়ের খতনাস্থল পরস্পরে মিলিত হলেও দম ও কাযা উভয়টি ওয়াজিব হয়।

৩. সবীর্য যেনার ফলে যেরূপভাবে দণ্ডবিধি ওয়াজিব হয়। এরূপভাবে বীর্যপাত না হলেও শুধু মাত্র উভয়ের খতনাস্থল পরস্পরে মিলিত হলে দণ্ডবিধি ওয়াজিব হয়।

৪. সন্দেহ সহকারে সবীর্য সঙ্গম হলে দণ্ডবিধি ওয়াজিব হয় না। কিন্তু মহর ওয়াজিব হয়। এরূপভাবে সন্দেহের বশীভূত হয়ে বীর্যপাতহীন সঙ্গমের ফলে অর্থাৎ, শুধু খতনাদ্বয় পরস্পরে মিলিত হলেও মহর ওয়াজিব হয়ে যায়।

৫. যোনি ছাড়া অন্যত্র সবীর্য সহবাস হলে দণ্ডবিধি ও মহর ওয়াজিব হয় না। কিন্তু তাযীর (শাসন) ওয়াজিব হয়, যদি সন্দেহ না হয়, এরূপভাবে বীর্যপাতহীন হলেও তাযীর ওয়াজিব হয়, যদি সন্দেহ না হয়।

৬. যদি কেউ স্বীয় স্ত্রীর সাথে যথার্থ নির্জনতা ছাড়া যৌনাঙ্গে সবীর্য সহবাস করে, অতঃপর তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে তার উপর পূর্ণ মহর ওয়াজিব হয়। এমনিভাবে উপরোক্ত ছুরতে শুধু খতনাদ্বয়ের পারস্পরিক মিলনের ফলেও পূর্ণ মহর ওয়াজিব হয়ে যায়।

নির্জনতা না হবার শর্তায়নের কারণ হল– যদি নির্জনতা হয়, তবে এই খালওয়াত তথা নির্জনতার কারণেই মহর ওয়াজিব হবে।

৭. সবীর্য সহবাসের পর তালাক দিলে মহিলার উপর ইদ্দত ওয়াজিব হয়, এরূপভাবে শুধু খতনাদ্বয়ের পারস্পরিক মিলনের ফলেও তালাক প্রদানের পর ইদ্দত ওয়াজিব হয়।

৮. স্বামী কর্তৃক তালাক দানের পর দ্বিতীয় স্বামীর সবীর্য সঙ্গমের ফলে এই মহিলা প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যায়। এরূপভাবে শুধু খতনাদ্বয় পারস্পরিক মিলিত হলেও হালাল হয়ে যায়।

৯. স্বীয় বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে যৌনাঙ্গ ছাড়া অন্যত্র সবীর্য সহবাসের পর তালাক দিলে অর্ধেক মহর ওয়াজিব হয়, যদি মহর নির্ধারিত থাকে। আর যদি মহর নির্ধারিত না হয়, তবে ওয়াজিব হয় মুত'আ। এরূপভাবে যৌনাঙ্গ ছাড়া অন্যত্র বীর্যপাতহীন সহবাসের ফলেও সেই অর্ধেক মহর অথবা মুত'আ ওয়াজিব হয়।

মোটকথা, উপরোক্ত সবক্ষেত্রে সবীর্য সঙ্গম ও বীর্যহীন সহবাস উভয়টির হুকুম একই রকম। অতএব, অন্যান্য বিধানের ন্যায় বড় অপবিত্রতা হওয়া এবং গোসল ওয়াজিবের হুকুমের ক্ষেত্রেও উভয়টি সমান হবে। যেমনিভাবে বীর্যপাতসহ সঙ্গমের ফলে গোসল ওয়াজিব হয়, এরূপভাবে বীর্যপাতহীন সঙ্গমের ফলেও গোসল ওয়াজিব হবে।

উল্লেখ্য, এই পর্যন্ত সবীর্য সঙ্গম ও বীর্যহীন সঙ্গমের আলোচনা ছিল যে, উভয়টি সমস্ত বিধি-বিধানে সমান। এবার আমরা বীর্যপাত সংক্রান্ত একটি আলোচনা করছি যেটিকে কেউ কেউ গোসল ওয়াজিব হওয়ার জন্য জরুরি সাব্যস্ত করেছেন। তাদের মতে শুধু নারী-পুরুষের খতনাস্থলদ্বয়ের পারস্পরিক মিলনের ফলে গোসল ওয়াজিব হয় না। চিন্তা-ফিকির করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, খতনাস্থলদ্বয় মিলিত হওয়া ছাড়া শুধু বীর্যপাত অপেক্ষা খতনাস্থলদ্বয় মিলিত হওয়ার হুকুম আরও কঠোর। চাই বীর্যপাত হোক বা নাই হোক। এ কারণেই–

১. খতনাস্থলদ্বয় বীর্যপাতহীন হলেও এর ফলে হজ্জের কাযা ওয়াজিব হয়। কিন্তু খতনাস্থলদ্বয় মিলিত হওয়া ব্যতীত বীর্যপাত হলে হজ্জে শুধু দম ওয়াজিব হয়, কাযা ওয়াজিব হয় না।

২. খতনাস্থলদ্বয় বিনা বীর্যপাতে মিলিত হলেও রোযাতে কাফফারা ওয়াজিব হয়। কিন্তু খতনাস্থলের পর মিলিত হওয়া ব্যতীত শুধু বীর্যপাত হলে কেবল কাযা ওয়াজিব হয়, কাফফারা নয়।

৩. খতনাস্থলদ্বয়ের বিনা বীর্যপাতে মিলনের ফলে যেনাতে দণ্ডবিধি ওয়াজিব হয়। কিন্তু খতনাস্থলদ্বয় মিলিত হওয়া ব্যতীত বীর্যপাত হলে দণ্ডবিধি ওয়াজিব হয় না। বরং তাযীর ওয়াজিব হয় না।

৪. বীর্যপাতহীন খতনাস্থলদ্বয়ে মিলনের ফলেও তালাক দিলে পূর্ণ মহর ওয়াজিব হয়। কিন্তু খতনাস্থলদ্বয় মিলিত হওয়া ব্যতীত বীর্যপাতের পর নির্জনতা না হলে যদি তালাক দেয়া হয়, তবে পূর্ণ মহর ওয়াজিব হয় না। বরং মহর নির্ধারিত হলে অর্ধেক, আর নির্ধারিত না হলে মুত'আ ওয়াজিব হবে। অতএব, খতনাস্থলদ্বয় মিলিত হওয়া ব্যতীত বীর্যপাতের হুকুমের ফলে যখন খতনাস্থলদ্বয় মিলিত হওয়ার হুকুম হজ্জ অধ্যায়ে রোযা অধ্যায়ে যেনা ও তালাকের ক্ষেত্রে অধিক কঠোরতর হয়ে থাকে। কাজেই অপবিত্রতার ক্ষেত্রেও এটা বেশি কঠোর ও শক্ততম হওয়া উচিত। তথা শুধু খতনাস্থলদ্বয়ের মিলন বীর্যপাতহীন হলে কঠোরতর অপবিত্রতা সাব্যস্ত করে বড় পবিত্রতা (গোসল)-কে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা। যুক্তির দাবিও এটি।

وحجةٌ اخرٰى فى ذالكَ انا رأينَا هذه الاشياءَ التى وجبتْ بالتقاءِ الخِتانينِ فاذَا كان بعدَها الانزالُ لم يجبْ بالانزالِ حكمٌ ثانٍ وَانمَا الحكمُ لِالتقاءِ الختانينِ، الاترٰى اَن رجلًا لوجامعَ امرأةً جماعَ الزنَا فالتقٰى ختانَاهما وجبَ الحدُّ عليهمَا بذالكَ ولو اقامَ عليهَا حتى اَنزلَ لم يجبْ بذالكَ عليه عقوبةٌ غيرُ الحدِّ الذىْ وجبَ عليهِ بالتقاءِ الخِتانينِ ولو كانَ ذالك الجماعُ على وجهِ شبهةٍ وجبَ عليه المهرُ بالتقاءِ الخِتانينِ ثم اقامَ عليهَا حتى اَنزلَ لم يجبْ عليه فى ذالكَ الانزالِ شئٌ بعدَ ما وجبَ بالتقاءِ الخِتانينِ وكانَ ما يحكمُ به فى هذه الاشياءِ على من جامعَ فانزلَ هو مايحكمُ به عليهِ اذا جامعَ ولم يُنزلْ وكانَ الحكمُ فى ذالكَ هو لالتقاءِ الختانينِ لَا للانزالِ الذى يكونُ بعدَه، فالنظرُ على ذالكَ ان يكونَ الغسلُ الذى يجبُ على مَن جامعَ وانزلَ هو بالتقاءِ الختانينِ لَا بالانزالِ الذى يكونُ بعدهُ،فثبتَ بذالك قولُ الذينَ قالُوا اِن الجمَاعَ يوجبُ الغسلَ كانَ معهُ انزالٌ ولم يكنْ وهذا قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ وعامةِ العلماءِ رحمهمُ اللهُ تعالى ـ

### দ্বিতীয় যৌক্তিক প্রমাণ ঃ

আমরা দেখি উপরোক্ত আহকামে (যেগুলো প্রথম যৌক্তিক প্রমাণে এসেছে) অর্থাৎ, হজ্জ ও রোযা ফাসিদ হওয়া দণ্ডবিধি ও মহর ওয়াজিব হওয়া ইত্যাদি, এগুলো শুধু খতনাস্থলদ্বয়ের পারস্পরিক মিলনের ফলে ওয়াজিব হয়। কারণ, খতনাস্থলদ্বয়ের পরস্পরের মিলনের পর মহিলার উপর বেশিক্ষণ অবস্থানের ফলে এবং বীর্যপাতের ফলে দ্বিতীয় কোন হুকুম প্রমাণিত হয় না। উদাহরণস্বরূপ কেউ কোন মহিলার সাথে যেনা করল, তার উপর খতনাস্থলদ্বয় পারস্পরিক মিলনের কারণেই দণ্ডবিধি ওয়াজিব হয়ে যাবে। এরপরও আরও অতিরিক্ত সময় অবস্থান ও বীর্যপাতের ফলে তার উপর দণ্ডবিধি ছাড়া অন্য কোন শাস্তি আবশ্যক হয় না। এরূপভাবে সন্দেহের বশে সঙ্গমে শুধুমাত্র খতনাস্থলদ্বয়ের মিলনের ফলেই মহর ওয়াজিব হয়ে যায়। এরপর অতিরিক্ত সময় অবস্থান ও বীর্যপাতের ফলে অন্য কোন জিনিস ওয়াজিব হয় না।

সারকথা, সহবাস দ্বারা যত বিধিবিধান প্রমাণিত হয়, সবগুলো নির্ভর করে খতনাস্থলদ্বয়ের মিলনের উপর। এরপর বীর্যপাতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কাজেই সবীর্য সঙ্গমের ফলে যে গোসল ওয়াজিব হয় এটা বীর্যপাতের কারণে নয়, বরং খতনাস্থলদ্বয়ের পারস্পরিক মিলনের কারণেই ওয়াজিব হয়। অতএব, বলতে হবে যে, উভয়ের খতনাস্থলদ্বয়ের মিলনের সাথে সাথেই গোসল ওয়াজিব হবে। এরপর চাই বীর্যপাত হোক বা না হোক। আমাদের দাবি এটাই।

وحجةٌ اخرىٰ فى ذالكَ ان فهدًا حدثنَا قالَ ثنا علىٌّ بن معبدٍ قالَ ثنَا عبيدُ الله زيدٍ عن جابرٍ هو ابنُ يزيدَ عن ابىْ صالحٍ قَال سمعتُ عمرَ بن الخطابِ رضـ فقالَ اِن نساءَ الانصارِ يُفتينَ ان الرجلَ اذا جامعَ فلم يُنزلْ فَاِنَّ على المرأةِ الغسلَ ولاغسلَ عليهِ وانهٗ ليسَ كما افتينَ اِذا جاوزَالختانُ الختانَ فقد وجبَ الغسلُ، قالَ ابو جعفرٍ ففى هذا الاثرِ اَن الانصارَ كانوا يَرونَ ان الماءَ من الماءِ اِنما هو فِى الرجالِ المُجامعينَ لا فى النساءِ المجامعاتِ واِنَّ المخالطةَ توجبُ على النساءِ الغسلَ وان لم يكنْ معهَا انزالٌ وَقد رأينَا الانزالَ يَستوىْ فيه حكمُ النساءِ والرجالِ فى وجوبِ

الغسلِ عليهمْ فالنظرُ على ذالكَ ان يكونَ حكمُ المخالطةِ التى لا انزالَ معهَا يَستوىْ فيهَا حكمُ الرجالِ والنساءِ فى وجوبِ الغسلِ عليهمْ -

### তৃতীয় যৌক্তিক প্রমাণ ঃ

এই যৌক্তিক প্রমাণটি আনসারী মহিলাদের উপরোক্ত মাসআলা সংক্রান্ত একই ফতওয়ার উপর নির্ভরশীল। সেটি ইমাম তাহাভী র. বর্ণনা করেছেন। আনসারী মহিলারা ফতওয়া দিতেন যে, বীর্যপাতহীন সহবাসের ফলে শুধু মহিলাদের উপরই গোসল ওয়াজিব হয়, পুরুষদের উপর নয়। ইমাম তাহাভী র. বলেন, এসব মহিলা পুরুষের জন্য গোসল ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে সহবাসের সাথে বীর্যপাতকে আবশ্যক মনে করেন। কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে শুধু পারস্পরিক খতনাস্থলদ্বয়ের পারস্পরিক মিলনকে যথেষ্ট মনে করেন। অথচ আমরা দেখছি, বীর্যপাতের ছুরতে নারীপুরুষ উভয়ের হুকুম গোসল ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে সমান। কাজেই উভয়ের খতনাস্থলদ্বয়ের মিলনের ক্ষেত্রে উভয়ের হুকুম সমান হওয়া উচিত। তথা যেরূপভাবে মহিলাদের উপর খতনাস্থলদ্বয়ের মিলনের ফলে গোসল ওয়াজিব হয়, এরূপভাবে পুরুষদের উপরও ওয়াজিব হওয়া উচিত। যুক্তির দাবিও তাই।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আল বাহরুর রায়িক ঃ ১/৫৮, নায়লুল আওতার ঃ ১/২১৩, ফাতহুল মুলহিম ঃ ১/৪৮৪, আল-কাওকাবুদ দুররী ঃ ১/৬৬, আওজাযুল মাসালিক ঃ ১/১০৫, মাআরিফুস সুনান ঃ ১/২৬৯, বযলুল মাজহুদ ঃ ১/১৩৩, মিরকাত ঃ ২/৩০, কিতাবুল ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ঃ ১/১০৫, ফয়যুল বারী ঃ ১/৩৬৬, আমানিল আহবার ঃ ১/২৭৯, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ১/২০৫।

## باب اكل ماغيرت النار هل يوجب الوضوء ام لا ؟

## অনুচ্ছেদ ঃ আগুনে পাকানো জিনিস খেলে ওযু ওয়াজিব হবে কিনা?

এই অধ্যায়ে দু'টি মাসআলা আছে। উভয়টির ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা দু'টি যৌক্তিক প্রমাণ আছে। প্রথম মাসআলাটি হল, আগুনের পাকানো জিনিস খেলে ওযু ভাঙ্গবে কেন?

### মাযহাবের বিবরণ ঃ

এ প্রসঙ্গে প্রথমদিকে সাহাবায়ে কিরামের মাঝে কিছুটা মতানৈক্য ছিল। হযরত আবু মুসা আশ'আরী, আনাস, আবু তালহা, যায়েদ ইবনে সাবিত,

আয়েশা, উম্মে হাবীবা, আবু হোরায়রা, সাহ্ল ইবনে হানজালা রা. প্রমুখ ওযূর প্রবক্তা ছিলেন।

খলীফা চতুষ্টয় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, উম্মে সালামা, আবু সাঈদ খুদরী, আবু রাফি', সুয়াইদ ইবনে নো'মান, আমর ইবনে উমাইয়া এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবায়ে কিরাম বলতেন ওযূর প্রয়োজন নেই।

পরবর্তীতে সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম এ ব্যাপারে এক মত হয়ে যান যে, এর ফলে ওযু ভঙ্গ হবে না। ইমামগণ ও উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে তাঁদের সাথে একমত। কেউ ওযু ভঙ্গের প্রবক্তা নন। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

শুধুমাত্র হাতে গোনা কয়েকজনের বক্তব্য হল, আগুনে পাকানো জিনিস ভক্ষণ করলে ওযু ভঙ্গ হবে। তন্মধ্যে রয়েছেন– হাসান বসরী, উমর ইবনে আবদুল আযীয, ইবনুল মুনযির, ইবনে খুযাইমা, আবু কিলাবা প্রমূখ। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

وامَّا وجهُه مِن طريقِ النظرِ فاِنَّا قد رأينَا هٰذه الاشياءَ التىْ قَد اختلفَ فِى اكلِها انه ينقضُ الوضوءَ ام لا اذا مسّـتْها النارُ واجمعَ ان اكلَها قبلَ مماسةِ النارِ اياهَا لاينقضُ الوضوءَ، فاردْنَا ان ننظرَ هلْ للنارِ حكمٌ يجبُ فى الاشياءِ اذا مَاسَّتْها فيَنتقلُ بهٖ حكمُها اليهَا، فَرأينَا الماءَ القَراحَ طاهرًا تؤدّٰى به الفروضُ ثم رأيناهَ اذا سخنَ فصارَمما قد مسّـتْه النارُ ان حكمَه فى طهارتهٖ علٰى ماكانَ عليه قَبل مماسةِ النارِ اياه وان النارَ لم تحدثْ فيه حكمًا ينتقلُ به حكمُه الى غيرِ ماكانَ عليهِ فى البدءِ، فلمَّا كانَ ماوصفنَا كذالكَ كانَ فى النظرِ اَن الطعامَ الطاهرَ الذى لايكونُ اكلُه قبلَ ان تمسَّه النارُ حدثًا اذا مسَّته النارُ لاتنقلُه عن حالِه ولا تغيرُ حكمَه ويكونُ حكمُه بعدَ مسيسِ النارِ اياهُ كحكمهٖ قبلَ ذالكَ قياسًا ونظرًا علٰى ما بينَّا وهوَ قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدِ بن الحسنِ رحمهم اللهُ تعالٰى -

## আগুনে স্পর্শকৃত দ্রব্য ব্যবহারের পর ওযু না করা

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

আগুনে পাকানো জিনিস সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের মতবিরোধ হয়েছে। অথচ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, সে জিনিসটি যদি আগুনে পাকানোর পূর্বে ভক্ষণ করা হত, তবে ওযু ভাঙ্গত না। এবার আমাদের দেখতে হবে আগুনেরও কোন ক্রিয়া হয় কিনা, যার ফলে কোন জিনিসের হুকুম পরিবর্তন হয়ে যায়? আমরা দেখছি, খালেস পানি পবিত্র। এর দ্বারা নামাযের জন্য পবিত্রতা অর্জন করা যায়। এবার যদি এটিকে আগুন দ্বারা গরম করা হয়, তবে এই পানি তার প্রথম অবস্থাতেই বহাল থাকে। আগুন তাতে কোন নতুন হুকুম সৃষ্টি করে না। অতএব, যুক্তির দাবি হল, পবিত্র খাবার আগুনে রান্না করার পরও স্বীয় প্রথম অবস্থায় বহাল থাকবে। যেরূপভাবে পাকানোর পূর্বে তা খেলে অপবিত্রতা আসবে না, এরূপভাবে রান্নার পরেও খেলে অপবিত্রতার কারণ হবে না।

**দ্বিতীয় মাসআলা ঃ**

**উটের গোশ্‌ত খেলে ওযু ভাঙ্গবে কিনা?**

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. ইমাম আহমদ ও ইসহাক র. বলেন, উটের গোশ্‌ত খেলে ওযু ভাঙ্গবে। আগুনে পাকানো অন্যান্য জিনিস থেকে এটি ব্যতিক্রম। অতএব, অন্যান্য জিনিসের ব্যাপারে ব্যাপক হুকুম রহিত হলেও এই হুকুম রহিত হবে না। এর পরিপন্থী বকরীর গোশ্‌ত। এটি খেলে ওযু ভাঙ্গবে না। অতএব, তাদের মাযহাবে উট ও বকরীর গোশ্‌তের মাঝে পার্থক্য আছে। وقدفرق قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ ও মালিক র. এর মতে উট ও বকরীর গোশ্‌তের হুকুমও অন্যান্য রান্না করা খাবারের মতই। অতএব, এটা খেলেও ওযু ভাঙ্গবে না। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَاما مِن طريقِ النظرِ فاِنا قدرأينَا الابلَ والغنمَ سواءً فى حِلِّ بَيعِهمَا وشربِ لبنِهما وطهارةِ لحومِهمَا وانه لاتفترقُ احكامُهما فى شيءٍ من ذالكَ فالنظرُ على ذالكَ انهمَا فى اكلِ لحومِهمَا

سواء فكما كانَ لَا وضوءَ فِي اكلِ لحومِ الغنمِ فكذالكَ لا وضوءَ فِي اكلِ لحومِ الابلِ وهوَ قولُ ابيْ حنيفةَ وابي يوسفَ ومحمدِ بنِ الحسنِ رحمَهم اللهُ تعالٰى .

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

উট ও বকরী সমস্ত আহকামে সমান। যেমন– এগুলো ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয, দুধ হালাল, গোশ্‌ত পবিত্র ইত্যাদি। কাজেই অন্যত্রও যেহেতু উভয়ের হুকুম বরাবর সেহেতু যুক্তির দাবি হল, গোশ্‌ত খাওয়ার ফলে ওযু ভাঙ্গা না ভাঙ্গার ক্ষেত্রেও উভয়ের হুকুম সমান। বস্তুতঃ বকরীর গোশ্‌তের ন্যায় উটের গোশ্‌ত খেলেও ওযু ভাঙ্গবে না।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আল-মুগনী ঃ ১/১২১, নায়লুল আওতার ঃ ১/১৯৫, আল-কাওকাবুদ দুররী ঃ ১/৫১, ফয়যুল বারী ঃ ১/৩০৫, মাআরিফুস সুনান ঃ ১/২৮৬, আওজাযুল মাসালিক ঃ ১/৫৬, যলুল মাজহুদ ঃ ১/১১৭, নায়লুল আওতার ঃ ১/১৯৫, হুজজাতুল্লাহিল বালিগা ঃ ১/১৭৭, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ১/২০৯-২২১।

## باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء ام لا ؟

## অনুচ্ছেদ ঃ লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযু ওয়াজিব হবে কিনা?

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

হাত ছাড়া দেহের অন্য কোন অঙ্গের সাথে পুরুষাঙ্গের স্পর্শ হলে ওযু ভাঙ্গবে না। এ ব্যাপারে সবাই একমত। মতানৈক্য শুধু হাতের ব্যাপারে। ইমাম শাফিঈ, আহমদ, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, আওযাঈ, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, যুহরী র. প্রমুখের মতে পুরুষাঙ্গ স্পর্শের কারণে ওযু ওয়াজিব হয়ে যায়।

২. ইমাম মালিক র. এর মতে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ তিন শর্তে ওযু ভঙ্গের কারণ–

(১) হাতের ভিতরগত তালু দ্বারা স্পর্শ করতে হবে।

(২) কোন আবরণ না থাকতে হবে।

(৩) এই স্পর্শ কোন মজা অনুভব করার জন্য হতে হবে। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁকেই বুঝিয়েছেন।

৩. ইমাম আবু হানীফা, সুফিয়ান সাওরী, হাসান বসরী, হাসান ইবনে হাই, রবী'আ তুর রাই, ইমাম নাখঈ, সাঈদ ইবনে জুবাইর ও উরওয়া ইবনে যুবাইর

র.-এর মতে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে ওযূ ভঙ্গ হবে না। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইমাম মালিক র. থেকে আর একটি রেওয়ায়াত হল, ওযু করা ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব। মাগরিবে তাঁর এই উক্তি অধিক প্রসিদ্ধ।

وإن كانَ يؤخذُ مِن طريقِ النظرِ فانّا رأيناهم لَايختلِفونَ اِن مسّ ذكرَه بظهرِ كفِّه او بذراعيهِ لم يجبْ فِى ذالكَ وضوءٌ فالنظرُ اَن يكونَ مسُّه اياهُ ببطنِ كفِّه كذالكَ ـ

যৌক্তিক প্রমাণ ঃ

হাতের বহিরাংশ অথবা হাতের কব্জি দ্বারা স্পর্শ করলে তাদের মতে ওযু ভাঙ্গবে না। অতএব, এগুলোর ন্যায় হাতের তালুর ভিতর অংশ দিয়ে স্পর্শ করলেও ওযু ভাঙ্গবে না। ইমাম তাহাভী র. এর মতে এই নজর তথা যৌক্তিক প্রমাণ ইমাম শাফিঈ ও মালিক র. এর বিরুদ্ধে দলিল হতে পারে। কিন্তু ইমাম আহমদ র. এর বিরুদ্ধে প্রমাণ হতে পারে না। এ কারণে তিনি সবার বিরুদ্ধে আরেকটি যৌক্তিক প্রমাণ পেশ করেছেন।

وقَد رأينَاه لَومَاسَّه بفخِذه لَم يجبْ عليهِ بذالكَ وضوءٌ والفخذُ عورةٌ فاذَا كانتْ مماستُهُ اياهُ بالعورةِ لاتوجبُ عليهِ وضوءً فمماسّتُه اياهُ بغيرِ العورةِ احرٰى ان لَاتوجبَ عليه وضوءً ـ

আরেকটি যৌক্তিক প্রমাণ ঃ

ইমাম তাহাভী র. বলেন, উরু একটি গোপন অঙ্গ এবং সতর। যদি এই উরু পুরুষাঙ্গের সাথে লাগে (যেমন– অধিকাংশ সময় লেগে থাকে) তবে সর্বসম্মতিক্রমে ওযু ভঙ্গ হয় না। অতএব, হাতের তালু যেটি সতর এবং গোপনাঙ্গে নয়, অতএব, এটি পুরুষাঙ্গের সাথে লাগলে উত্তমরূপেই ওযু ভাঙ্গবে না। যুক্তির দাবি এটিই।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বযলুল মাজহুদ ঃ ১/১১০, মাআরিফুস সুনান ঃ ১/২৯৫, নায়লুল আওতার ঃ ১/১৯৩, আওজাযুল মাসালিক ঃ ১/৯৩, আমানিল আহবার ঃ ১/৩৩৯, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ ১/৩৯, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ১/২২২-২৩৬।

## باب حكم بول الغلام والجارية قبل ان يأكلا الطعام

## অনুচ্ছেদ ঃ স্বাভাবিক খাবার গ্রহণোপযোগী হওয়ার পূর্বে শিশুদের প্রস্রাবের হুকুম

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, ছোট শিশু চাই ছেলে হোক বা মেয়ে যদি বাইরের খাবার খেতে আরম্ভ করে, তবে তাদের প্রস্রাব অপবিত্র। ধোয়া ছাড়া পবিত্র হবে না। যদি বাইরের খাবার না খায়, তবে এই দুগ্ধপোষ্য ছেলে ও মেয়ে শিশুর প্রস্রাব সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে।

১. দাঊদ জাহিরীর মতে, ইমাম শাফিঈ র. এর এক বিবরণ অনুযায়ী ছেলে শিশুর প্রস্রাব পবিত্র, মেয়ে শিশুর প্রস্রাব অপবিত্র। তবে শাফিঈ ও হাম্বলীগণের নিকট এই রেওয়ায়াত প্রমাণিত নয়। فذهب قوم الى التفريق الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম শাফিঈ র. এর বিশুদ্ধ মত এবং ইমাম আবু হানীফা ও মালিক র. বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামী আইনবিদ ও হাদীস বিশারদের মতানুসারে ছেলে ও মেয়ে শিশু উভয়ের প্রস্রাব নাপাক। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অবশ্য পবিত্র করার পদ্ধতি সম্পর্কে মতবিরোধ আছে।

১. মেয়ে শিশুর প্রস্রাব ধৌত করার ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে। কিন্তু ছেলে শিশুর প্রস্রাব সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ ও আহমদ র. এর মাযহাব হল, তাতে পানির ছিটা নিক্ষেপ করাই যথেষ্ট, ধৌত করার প্রয়োজন নেই।

২. ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিক র. প্রমূখের মতে, ছেলে শিশুর পেশাবও ধৌত করা জরুরি, পানির ছিটা নিক্ষেপ করা যথেষ্ট নয়। অবশ্য উভয়ের মাঝে কিছুটা পার্থক্য আছে। তথা কন্যা শিশুর প্রস্রাব ভালরূপে ধৌত করতে হবে আর ছেলে শিশুর প্রস্রাব হালকাভাবে ধৌত করলেই যথেষ্ট।

وامّا وجهُه مِن طريقِ النظرِ فانّا رأينا الغلامَ والجاريةَ حكمُ ابوالِهما سواءٌ بعدَ مَا يأكلانِ الطعامَ- فالنظرُ علٰى ذالكَ اَن يكونَ ايضًا سواءً قَبلَ ان يأكلاَ الطعامَ فاذَا كانَ بولُ الجاريةِ نجسًا فبولُ الغلامِ ايضًا نجسٌ، هٰذا قولُ ابىْ حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمَهم اللهُ تعالٰى -

### শিশুর প্রস্রাব ধোয়া ওয়াজিব

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

বাইরের খাবার গ্রহণ করার পর ছেলে ও কন্যা শিশুর প্রস্রাবের হুকুম সর্বসম্মতিক্রমে সমান। সেহেতু বাইরের খাবার গ্রহণের পূর্বের হুকুমও উভয় ক্ষেত্রে সমান হওয়া উচিত। তথা কন্যা শিশুর প্রস্রাবের ন্যায় ছেলে শিশুর প্রস্রাবও নাপাক হওয়া এবং এ থেকে পবিত্র করার জন্য ধোয়ার প্রয়োজন হওয়া।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ফয়যুল বারী ঃ ১/৩২৫, মাআরিফুস সুনান ঃ ১/২২৩, আমানিল আহবার ঃ ২/১০৯, ১১২, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/৩১৭-৩২৫।

باب الرجل لايجد الانبيذ التمرهل يتوضا به اويتيمم؟

## অনুচ্ছেদ ঃ খেজুর ভিজানো পানীয় ছাড়া আর কিছু না পেলে ওযু করবে, না তায়াম্মুম?

নবীয বলা হয় খেজুর ভিজানো পানীয়কে। এর চারটি সুরত রয়েছে–

১. সে খেজুরের কারণে বিলকুল মিষ্টতা আসবে না।

২. খেজুর ভিজানোর পর পানি তরল থাকবে, যার ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর প্রবাহিত হবে এবং কিছুটা মিষ্টতা আসবে, তবে নেশার সৃষ্টি করবে না এবং পাকানোও হবে না।

৩. মিষ্টতা এসে নেশার সীমায় পৌঁছে যাবে।

৪. আগুনে পাকানো হবে কিংবা এমনিতেই খুব গাঢ় হয়ে যাবে, যার ফলে অঙ্গে প্রবাহিত হবে না। প্রথম প্রকার পানি দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে ওযু করা জায়েয। তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার দ্বারা কারও মতে ওযু করা সহীহ নয়। অবশ্য দ্বিতীয় প্রকারে মতানৈক্য আছে।

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. ইমাম আবু হানীফা র. থেকে এ ব্যাপারে চারটি বিবরণ রয়েছে–

(১) এর দ্বারা ওযু করা উচিত। এটির বর্তমানে তায়াম্মুম করা জায়েয নেই। এটিই হল জাহিরী রেওয়ায়াত। ইমাম যুফার, সুফিয়ান সাওরী, আওযাঈ ও হাসান বসরী র. প্রমূখের মাযহাব এটিই।

(২) উভয়ের সমন্বয় জরুরি, অর্থাৎ, ওযুও করতে হবে, তায়াম্মুমও করতে হবে। ইমাম মুহাম্মদ র. এ মাযহাব অবলম্বন করেছেন।

(৩) নূহ ইবনে আবু মারইয়াম বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবু হানীফা র. স্বীয় মত প্রত্যাহার করে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ, এর দ্বারা ওযু করা জায়েয নেই, বরং তায়াম্মুম করা আবশ্যক। এটি ইমাম আবু ইউসুফ ও অধিকাংশ আলিমের মত। হানাফীদের মতে এর উপরই ফতওয়া। ইমাম তাহাভী র. এ মতটিই অবলম্বন করেছেন।

২. ইমামত্রয় ও কাজী আবু ইউসুফ র. এর মতে এর দ্বারা ওযু করা জায়েয নেই বরং তায়াম্মুম করা উচিত। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. মুহাম্মদ র.-এর মতে নবীযে তামার দ্বারা ওযু করা এবং তারাম্মুয উভয়টি আবশ্যক।

৪. আবূ হানিফা আওয়াঈ, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব র.-এর মতে সফরে নবীযে তামার দ্বারা ওযু জায়েয, তায়াম্মুম নাজায়েয। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

উল্লেখ্য, ইমাম আজম র. এর সহীহ ও নির্ভরযোগ্য উক্তি অনুযায়ী নবীয দ্বারা ওযু করা জায়েয নেই। ইমাম তাহাভী এর উপর তিনটি নজর পেশ করেছেন, আবার নবীয দ্বারা প্রসিদ্ধ পুরনো উক্তি মতে উযু জায়েয সংক্রান্ত বক্তব্যের জবাব প্রদান করেছেন।

وَاِن كَانَ مِن طَرِيقِ النظرِ فانَا قدرَأينَا الاصلَ المتفقَ عليهِ انه لايتوضأ بنبيذِ الزبيبِ ولَا بالخلِ فكانَ النظرُ علٰى ذالكَ اَن يكونَ نبيذُ التمرِ ايضًا كذالكَ۔

## নবীয দ্বারা ওযু জায়েয নেই

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

ইমাম তাহাভী র. বলতে চান, নবীযে তামার (খেজুর ভিজানো পানীয়) এর মত জিনিস যেমন কিসমিস ভিজানো পানি, সিরকা ইত্যাদি দ্বারা ওযু করা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েয। অতএব, এগুলোর ন্যায় খেজুর ভিজানো পানীয় দ্বারাও ওযু করা নাজায়েয হওয়া উচিত। তবে যাদের মতে সমস্ত নবীয দ্বারা ওযু করা জায়েয (যেমন– ইমাম আওযাঈ র. প্রমুখ) তাদের বিরুদ্ধে এটা প্রমাণ হতে

পারবে না। অবশ্য ইমাম আবু হানীফা র. এর বিরুদ্ধে জাহিরী রেওয়ায়াত ও প্রথম মত অনুসারে এটা প্রমাণ হতে পারে।

তবে ইমাম সাহেব র. এর পক্ষ থেকে এই যৌক্তিক প্রমাণের উত্তর এই দেয়া যেতে পারে যে, কোন নবীয দ্বারাই ওযু জায়েয না হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, জিন রজনীর ঘটনা দ্বারা আমরা খেজুর ভিজানো পানীয়কে কিয়াস পরিপন্থীরূপে ব্যতিক্রমভুক্ত তথা খাস করে নিই।

وقدْ اجمعَ العلماءُ انَّ نبيذَ التمرِ اذا كانَ موجودًا فِى حالِ وجودِ الماءِ انَّه لايتوضأبِه لِانه ليسَ بماءٍ فلمَّا كانَ خارجًا مِن حكمِ المياهِ فى حالِ وجودِ الماءِ كانَ كذالكَ هُو فِى حالِ عدمِ الماءِ وحديثُ ابنِ مسعودٍ رض الذىْ فِيه التوضئْ بنبيذِ التمرِ اِنَّمَا فِيه اَن رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم توضأبِه وهوَ غيرُ مسافرٍ لِانه انمَا خرجَ مِن مكةَ يُريدُهم فقِيلَ انه توضأَ بنبيذِ التمرِ فِى ذالكَ المكانِ وهو فِى حكمِ مَن هُوبمكةَ لِانه يتمُّ الصلوٰةَ فهوَ ايضًا فِى حكمِ استعمالِه ذالكَ النبيذَ هنالكَ فى حكمِ استعمالِه اياهُ بمكةَ

**দ্বিতীয় যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

ইমাম তাহাভী র. বলেন, সমস্ত আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, সাধারণ পানির বর্তমানে খেজুর ভিজানো পানি দ্বারা ওযু করা জায়েয নেই। অতএব, বুঝা গেল, সাধারণ পানির বর্তমানে খেজুর ভিজানো পানীয় তাদের মতেও সাধারণ পানির হুকুম থেকে ব্যতিক্রম। সাধারণ পানির অবর্তমানেও খেজুর ভিজানো পানি সাধারণ পানির হুকুম থেকে আলাদা হওয়া উচিত। এর দ্বারা ওযু নাজায়েয হওয়া উচিত।

এই যৌক্তিক প্রমাণের উত্তর ইমাম আবু হানীফা র. এর পক্ষ থেকে দেয়া যেতে পারে যে, কিয়াসের দাবি তো ছিল ওযু নাজায়েয হওয়া। কিন্তু আমরা হাদীসের কারণে এটাকে জায়েয সাব্যস্ত করেছি এবং এই মাসআলাটি তায়াম্মুমের মত। পানির বর্তমানে মাটি পবিত্রতার কারণ নয়। অতএব, পানি না থাকলেও এটি পবিত্রতার কারণ না থাকাই উচিত ছিল। কিন্তু কুরআন এটিকে

পবিত্রতার কারণ সাব্যস্ত করেছে। যদিও পানির বর্তমানে এটি পবিত্রতার কারণ ছিল না। অতএব, পানির বর্তমানে কোন জিনিস পবিত্রতার কারণ না হলে পানির অবর্তমানেও এটি পবিত্রতার কারণ না হওয়া আবশ্যক নয়।

فلوثبتَ هٰذا الاثرُ انَّ النبيذَ مما يجوزُ التوضئ به فى الامصارِ والبوادئ ثبتَ انه يجوزُ التوضئ به فى حالِ وجودِ الماءِ وفى حالِ عدمه فلمَّا اجمعُوا علىٰ تركِ ذالكَ والعملِ بضده فلمْ يُجيزُوا التوضئَ به فى الامصارِ وَلا فيما حكمُه حكمُ الامصارِ ثبتَ بذالكَ تركُهم لذالكَ الحديثِ وخرجَ حكمُ ذالك النبيذِ من حكمِ سائرِ المياهِ فثبتَ بذالكَ انه لايجوزُ التوضئ به فى حالٍ من الاحوالِ وهوَ قولُ ابى يوسفَ وهو النظرُ عندَنا واللهُ اعلمُ۔

### তৃতীয় যৌক্তিক প্রমাণ ঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর হাদীসে খেজুর ভিজানো পানি দ্বারা ওযুর উল্লেখ রয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুকীম অবস্থায় খেজুর ভিজানো পানি দ্বারা ওজু করেছেন। কারণ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিনদের উদ্দেশে মক্কা থেকে বেরিয়ে মক্কার আশেপাশে তাশরীফ নিয়েছিলেন। বস্তুতঃ মক্কার আশপাশ মক্কারই পর্যায়ভুক্ত। এ কারণে সেখানে নামাযে কসর হয় না।

সারকথা, উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মুকীম অবস্থায় ওযু প্রমাণিত হচ্ছে। মুকীম অবস্থায় সাধারণ পানি মওজুদ থাকাই স্পষ্ট বিষয়। অতএব, যদি এ হাদীসের উপর আমল করতে হয়, তবে বলতে হবে, খেজুর ভিজানো পানীয় দ্বারা সর্বাবস্থাতেই ওযু করা জায়েয, চাই মুকীম অবস্থা হোক অথবা সফর, সাধারণ পানি বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক। অথচ তাঁদের আমল এর পরিপন্থী। তাঁদের মতে মুকীম অবস্থায় খেজুর ভিজানো পানীয় দ্বারা ওযু করা জায়েয নেই। অতএব, যে হাদীসটিকে তারা নিজের প্রমাণ মনে করেছেন সেটিকে নিজেদের পক্ষ থেকেই বর্জন করা আবশ্যক হয়। যেহেতু তাঁরা স্বীয় প্রমাণ ইবনে মাসউদ রা. এর হাদীসটিকে নিজেরাই বর্জন করেছেন, সেহেতু অবশ্যই তাদের দাবি বাতিল হয়ে গেল।

যেহেতু ইমাম আবু হানীফা র. এর মতে খেজুর ভিজানো পানি দ্বারা ওযুর ক্ষেত্রে সফর ও মুকীম অবস্থায় কোন পার্থক্য নেই। বরং উভয় অবস্থাতেই তাঁদের মতে এর দ্বারা সাধারণ পানি বর্তমান না থাকা শর্তে ওযু করা জায়েয, যেমন তায়াম্মুমে তাদের মতে পানি বর্তমান না থাকা শর্ত। চাই সফর অবস্থায় হোক বা মুকীম অবস্থায়, সেহেতু যদি মুকীম অবস্থায় সাধারণ পানি বর্তমান না থাকে তবে ইমাম আবু হানীফা র. এর মতে, খেজুর ভিজানো পানি দ্বারা ওযু করা জায়েয হবে।

জিন রজনীর এ ঘটনাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই মুসাফির ছিলেন । কিন্তু সেকালে সাধারণ পানির বিদ্যমানতা প্রমাণিত নয়। বরং ওযুর জন্য ইবনে মাসউদ রা. কর্তৃক এই নবীয পেশ করাই এর প্রমাণ যে, সেখানে সাধারণ পানি ছিল না। অন্যথায় পানের জন্য প্রস্তুত পানীয় ওযুর জন্য ইবনে মাসউদ রা. পেশ করতেন না। কাজেই ইমাম তাহাভী র. এর এই যৌক্তিক প্রমাণ ইমাম আবু হানীফা র. এর বিরুদ্ধে দলীল হতে পারে না।

এ হল ইমাম আবু হানীফা র. এর জাহিরী রেওয়ায়াত ভিত্তিক আলোচনা। এর উদ্দেশ্য হল, ইমাম আবু হানীফা র. এর এ উক্তিটি ভিত্তিহীন নয়। কাজেই তাঁর প্রতি ভর্ৎসনার অধিকার কারও নেই। অবশ্য ইমাম আবু হানীফা র. কর্তৃক নিজের এই মত প্রত্যাহার প্রমাণিত (নূহ্ ইবনে আবু মারইয়াম এর বিবরণ)। এ কারণেই এ প্রসঙ্গে ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন মতবিরোধ রইল না বরং খেজুর ভিজানো পানি দ্বারা ওযু নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত হয়ে গেলেন।

ইমাম সাহেব র.-এর মত প্রত্যাহার এবং দুটি উক্তি থাকার কারণ হল– যুগের পরিবর্তনের ফলে নবীযে পরিবর্তন এসে যায়। প্রথম দিকে শুধু হালকা মিষ্টি জাত নবীযের প্রচলন ছিল। যদ্দারা সর্বসম্মতিক্রমে ওযু জায়েয। আরবগণ সামান্য শুকনা খেজুর পানির মধ্যে ভিজাতেন, যার ফলে সে পানি সাধারণ রীতি অনুযায়ী মিষ্টি ও সুপেয় তথা পানযোগ্য হয়ে যেত। এর চেয়ে বেশি খেজুরের পানির স্বাভাবিক একটি বা দুটি গুণের উপর কখনো প্রবলতা আসত না। যেমন গরম পানি সুপেয় বানানোর জন্য তাতে বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করা হয়। মূলত এই ঠাণ্ডা মিষ্টি নবীয হল প্রথম প্রকার। লাইলাতুল জিন সংক্রান্ত হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর হাদীসের প্রয়োগক্ষেত্র এটিই। এর দুটি প্রমাণ (১) হযরত ইবনে মাসউদ রা.-কে এই নবীযে তামার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, তিনি বললেন, تميراتٌ القيتُها فى الماءِ (২) আবুল আলিয়া আবু খালদাকে বললেন,

زبيبا و ماء (نبيذ ليلة الجن) انما كان ذالك কিন্তু এর কিছুকাল পর ভীষণ মিষ্টি নবীযের তৃতীয় প্রকারের প্রচলন ব্যাপক হয়ে যায়। যার ফলে সমস্ত ইমামের সর্বসম্মতিক্রমে ওযূ সুনিশ্চতরূপে নাজায়েয, যেমন বর্তমান যুগের লাচ্ছি এবং চা দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে ওযূ নাজায়েয। কারণ, পবিত্র জিনিসের সংমিশ্রণের ফলে পানির প্রায় তিনটি গুণই পরিবর্তিত হয়ে যায়। এজন্য ইমাম সাহেব র.-এ নবীয সম্পর্কে নাজায়েযের ফতওয়া দেন। এর দ্বারা কখনো এ উদ্দেশ্য ছিল না যে, প্রথম দিকে এই তৃতীয় প্রকার সম্পর্কে ইমাম সাহেব র. ওযূ জায়েযের মত পোষণ করতেন, আর পরবর্তীতে সে মত প্রত্যাহার করেছেন; বরং এর উদ্দেশ্য হল প্রথমত তৃতীয় প্রকার দুষ্প্রাপ্য ছিল। ফলে তদ্বারা ওযূ নাজায়েয হওয়ার কার্যত সুস্পষ্ট ফতওয়ার প্রয়োজন ও সুযোগই আসেনি। যখন এ তৃতীয় প্রকারের ব্যাপক প্রচলন হয়, তখন এ ফতওয়ার প্রয়োজন হয়েছে।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঈযাহুত তাহাভী ঃ ১/২৮৩।

## باب المسح على النعلين

## অনুচ্ছেদ ঃ চপ্পলদ্বয়ের উপর মাসেহ

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. হযরত আলী কা., আবদুল্লাহ ইবনে উমর, খুযাইমা ইবনে আউস এবং আমর ইবনে হুরাইস রা., ইবনে হাযম জাহিরী এবং কোন কোন আহলে জাহিরের মতে, জুতা ও চপ্পলের উপর মাসেহ করা জায়েয আছে। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম চতুষ্টয়ের বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবী, তাবিঈ, ইসলামী আইনবিদ ও হাদীস বিশারদের মতে জুতা ও চপ্পলের উপর মাসেহ করা জায়েয নেই। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

فلَمَّا احتملَ حديثُ اوسٍ ماذكرنَا ولم يكنْ فيهِ حجةٌ فى جوازِ المسحِ علىٰ النعلينِ التمسنَا ذالكَ مِن طريقِ النظرِ لِنعلمَ كيفَ حكمُه فرأينَا الخفينِ اللذينِ قد جوزَ المسحُ عليهِما اِذا تخرقَا حتّٰى

بدتِ القدمانِ منهمَا او اكثرُ القدمينِ فكلٌّ قدْ اجمعَ انه لايمسحُ عليهِما، فلمَّا كانَ المسحُ على الخفينِ انمَا يجوزُ اذا غيَّبَا القدمينِ ويبطلُ ذالكَ اذِا لم يغيِّبَا القدمينِ وكانَ النعلانِ غيرَ مغيِّبينِ لِلقدمينِ ثبتَ انهمَا كالخفينِ اللذينِ لايغيِّبانِ القدمينِ ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

ইমাম তাহাভী র. বলেন, মোজা যখন ফেটে যায় বা ছিড়ে যায় যার ফলে উভয় পা অথবা অধিকাংশ স্পষ্ট হয়ে যায়, তখন এরূপ মোজার উপর মাসেহ করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয নেই। অথচ ভাল মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয আছে। বস্তুতঃ জুতা চপ্পল দ্বারা পূর্ণ পা ঢেকে থাকে না। অতএব, বুঝা গেল চপ্পলদ্বয় ও জুতাদ্বয় ছেড়া মোজার ন্যায়, যেগুলো থেকে পায়ের অধিকাংশ প্রকাশিত হয়ে থাকে। যেহেতু এরূপ মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ জায়েয নেই, সেহেতু চপ্পলদ্বয়ের উপরও মাসেহ করা জায়েয হবে না।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঈযাহুত তাহাভী ঃ ১/২৭৫-২৭৯, বযলুল মাজহুদ ঃ ১/৫৫, হাশিয়া আল-কাওকাবুদ দুররী ঃ ১/৫৫, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ ১/৩৩,আল-মুগনী ঃ ১/২৩, মাআরিফুস সুনান ঃ ১/৩১০, আমানিল আহবার ঃ ২/৬১-৬২, হিদায়া ঃ ১/৩০।

## باب المستحاضة كيف تتطهر للصلوٰة

## অনুচ্ছেদ ঃ রক্তপ্রদর আক্রান্ত মহিলা কিভাবে নামাযের জন্য পবিত্রতা অর্জন করবে?

রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলা মাসিককাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর নামাযের জন্য কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে এ প্রসঙ্গে দু'টি মতবিরোধ রয়েছে–

**প্রথম মতবিরোধ ঃ**

১. শিয়া ইমামিয়া, আহলে জাহির, ইকরামা, সাঈদ ইবনে জুবাইর, কাতাদা ও মুজাহিদ এর মতে রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলা প্রতিটি নামাযের জন্য গোসল করবে। فذهب قوم الخ দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইবরাহীম নাখঈ, আবদুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদ এবং মানসুর ইবনে মু'তামির র. প্রমুখের মতে সব ধরনের রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলা দুই নামায একত্রে আদায়

করবে। অর্থাৎ, জোহরকে দেরীতে এবং আসরকে এগিয়ে এনে উভয়ের জন্য এক গোসল, মাগরিবকে দেরীতে এবং ইশাকে এগিয়ে এনে উভয়ের জন্য এক গোসল এবং ফজরের জন্য স্বতন্ত্র এক গোসল দিবে। অতএব, প্রতিদিন তার জন্য গোসল হবে তিন বার। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. ইমাম চতুষ্টয়, ফুকাহায়ে মদীনা বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের মতে ইসতিহাযা (রক্তপ্রদর) বিশিষ্ট মহিলা প্রতিটি নামাযের জন্য অযু করবে। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অবশ্য ইমাম মালিক র. এর মতে রক্তপ্রদর ওযু ভঙ্গের কারণ নয়। অতএব, তাদের মতে রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলার জন্য প্রতিটি নামাযের জন্য ওযু করা জরুরি নয়, বরং মুস্তাহাব। তবে ওযু ভঙ্গের কোন কারণ এসে পড়লে সেটা ভিন্ন ব্যাপার।

অতঃপর, সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে মতবিরোধ হয়ে গেছে যে, রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলার উপর প্রতিটি নামাযের জন্য ওযু করা আবশ্যক, না প্রতি নামাযের ওয়াক্তের জন্য?

**দ্বিতীয় ইখতিলাফ ঃ**

১. ইমাম শাফিঈ র. এর মতে রক্তপ্রদর আক্রান্ত মহিলা প্রতিটি ফরয নামাযের জন্য ওযু করবে। অর্থাৎ, এক ওযুতে শুধু একটি ফরয আদায় করতে পারবে। অবশ্য এর অধীনস্থ সুন্নত ও নফলগুলোও পড়তে পারবে। এগুলো আদায়ের পর ওযু ভেঙ্গে যাবে। অতএব, প্রতিটি ওয়াক্তের জন্য ওযু করা জরুরী নয়। وقال اخرون দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝানো হয়েছে।

২. ইমাম আবু হানীফা ও আহমদ (এক উক্তি অনুযায়ী), যুফার, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান র.-এর মতে এক ওযু দ্বারা ওয়াক্তের ভিতর যত ইচ্ছা ফরয ও নফল আদায় করতে পারবে। সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরই ওযু ভেঙ্গে যাবে। ففال قوم الخ দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেহেতু প্রথম মাসআলাটির সম্পর্ক শুধু ঐতিহ্যগত নকলী প্রমাণের সাথে সেহেতু ইমাম তাহাভী র. শুধু দ্বিতীয় মাসআলাটির উপর যৌক্তিক প্রমাণ পেশ করেছেন।

فَاردنَا نحنُ ان نستخرِجَ مِن القولينِ قولاً صحيحًا فرايناهُم قدْ اجمعُوا انهَا اِذا توضاتْ فِى وقتِ صلوةٍ فلم تصلِّ حتى خرجَ الوقتُ فارادتْ ان تصلىَ بذالكَ الوضوءِ اَنه ليسَ ذالكَ لهَا حتّٰى تتوضأَ وضوءً جديدًا ورأينَاهَا لوتوضأتْ فى وقتِ صلوةٍ فصلتْ ثُمّ اَرَادتْ ان تتطوعَ بذالكَ الوضوءِ كانَ ذالكَ لهَا مَادامتْ فِى الوقتِ فدلَّ مَاذكرنَا اَن الذىْ ينقضُ طهرَهَا هو خروجُ الوقتِ واَن وضوءَ هَايُوجبُه الوقتُ لاالصلوةُ ـ

**প্রথম যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

ইমাম তাহাভী র. বলেন, এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, রক্তপ্রদর আক্রান্ত মহিলা যখন কোন নামাযের ওয়াক্তে ওযু করবে এবং নামায না পড়বে ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, তখন এ ওযু দ্বারা ওয়াক্ত পেরিয়ে যাওয়ার পর কোন নামায আদায় করা তার জন্য জায়েয নেই বরং নতুন ওযু করা আবশ্যক। তাছাড়া, যদি সে ওয়াক্তের ভিতর ওযু করে নামায আদায় করে, অতঃপর ওয়াক্তের ভিতরেই সে ওযু দ্বারা নফল পড়তে চায়, তবে তার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে তা জায়েয। এতে প্রমাণিত হল, ওয়াক্ত পেরিয়ে যাওয়াই ইসতিহাযা বিশিষ্ট মহিলার পবিত্রতা ভঙ্গের কারণ, নামায থেকে অবসরতা নয়। অন্যথায় প্রথম ছুরতে নতুন ওযুর প্রয়োজন হত না, দ্বিতীয় সুরতে ফরয নামাযের পর নফল পড়ার জন্য নতুন ওযু করতে হত।

وقَد رأينَاها لَوفاتتْها صلواتٌ فارادتْ ان تقضيَهن كانَ لَها اَن تَجمعهنَّ فِى وقتِ صلوةٍ واحدةٍ بوضوءٍ واحدٍ فَلو كانَ الوضوءُ يجبُ عليهَا لِكلِّ صلوةٍ لكانَ يجبُ ان تتوضأَ لكلِّ صلوةٍ مِن الصلواتِ الفائتاتِ فلمَّا كانتْ تصلِيهنَّ جميعًا بوضوءٍ واحدٍ ثبتَ بذالكَ اَنَّ الوضوءَ الذىْ يجبُ عليهَا هُو لغيرِ الصلوةِ وهو الوقتُ ـ

**দ্বিতীয় যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

আমরা আরও দেখছি, যদি ইসতিহাযা বিশিষ্ট মহিলার কয়েকটি নামায ছুটে যায় এবং সে তা কাযা করতে চায়, তবে সে একাধিক ছুটে যাওয়া নামায একই নামাযের ওয়াক্তে এক ওযুতে পড়তে পারবে। যদি প্রত্যেক ফরয নামাযের জন্য

ওযু করা আবশ্যক হত, নামায থেকে অবসরতা তার জন্য ওযু ভঙ্গের কারণ হত, তবে ছুটে যাওয়া প্রতিটি নামাযের জন্য আলাদা আলাদা ওযু করতে হত। অতএব, প্রমাণিত হল, নামায থেকে অবসরতা ওযু ভঙ্গের কারণ নয়।

স্মর্তব্য, ইমাম শাফিঈ র. এর মতে প্রতিটি রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলার জন্য প্রতিটি ফরয নামাযের জন্য ওযুর প্রয়োজন। চাই আদায় হোক, অথবা কাযা। অতএব, একাধিক ছুটে যাওয়া নামায একই ওয়াক্তে এক ওযুতে আদায় করার যে বিষয়টি ইমাম তাহাভী র. উল্লেখ করেছেন, এটি বোধ হয় ইমাম শাফিঈ র. ছাড়া অন্য কারও উক্তি।

وحجةٌ اخرٰى انا قدرأينَا الطهاراتِ تَنتقضُ باحداثٍ منها الغائطُ والبولُ وطهاراتٍ تنتقضُ بخروجِ اوقاتٍ وهى الطهارةُ بالمسحِ علٰى الخفينِ ينقضُها خروجُ وقتِ المسافرِ وخروجُ المقيمِ وهٰذه الطهاراتُ المتفقُ عليهَا لم نجِدْ فيهَا مَاينقضُها صلوةٌ اِنما ينقضُها حدثٌ او خروجُ وقتٍ وقد ثبتَ ان طهارةَ المستحاضةِ طهارةٌ ينقضُها الحدثُ وغيرُ الحدثِ. فقالَ قومٌ هٰذا الذىْ هوَ غيرُ الحدثِ هُو خروجُ الوقتِ

وقالَ اخرونَ هو فراغٌ مِن صلوةٍ ولم نجدِ الفراغَ مِن الصلٰوةِ حدثًا فِى شيءٍ غيرِ ذالكَ وقد وجدنَا خروجَ الوقتِ حدثًا فى غيرِه، فاولٰى الاشياءِ ان نرجعَ فى هٰذا الحديثِ المختلفِ فيهِ فنجعلَه كالحدثِ الذى قَد اجمعَ عليهِ ووُجدَله اصلٌ ولَانجعلُه كمَالم يجمِعْ عليه ولمْ نَجِد لهُ اصلاً. فثبتَ بذالكَ قولُ من ذهبَ اِلى انها تتوضأُ لكلِّ وقتِ صلوةٍ وهوَ قولُ ابىْ حنيفةَ وابىْ يوسفَ ومحمدِ بنِ الحسنِ رحمَهم اللهُ تعالٰى.

তৃতীয় যৌক্তিক প্রমাণ ঃ

আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই, পবিত্রতা দুই প্রকার–

১. অপবিত্রতার কারণে ভেঙ্গে যায়। যেমন– পায়খানা-প্রস্রাবের কারণে ভেঙ্গে যায়।

২. যে পবিত্রতা ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে ভেঙ্গে যায়, যেমন একটি বিশেষ সময় শেষ হওয়ার পর মোজার উপর মাসেহের পবিত্রতা খতম হয়ে যায় (এতে ইমাম মালিক র. এর মতবিরোধ আছে)। এসব পবিত্রতা সম্পর্কে ঐকমত্য রয়েছে যে, এগুলোর একটিকেও নামায ভঙ্গ করতে পারে না। অর্থাৎ, নামায থেকে অবসর হওয়া মাত্রই পবিত্রতা নষ্ট হয় না। এগুলো ভঙ্গকারী হয়তো অপবিত্রতা অথবা ওয়াক্ত পেরিয়ে যাওয়া।

একটি স্বীকৃত ও প্রমাণিত সত্য যে, ইসতিহাযা বিশিষ্ট মহিলার পবিত্রতাকে অপবিত্রতাও ভঙ্গ করে, আবার এছাড়া অন্য জিনিসও ভঙ্গ করে। ইসতিহাযা বিশিষ্ট মহিলার পবিত্রতা ভঙ্গ করে এরূপ গরহদস কি? এতে মতবিরোধ হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এটা হল, সময় পেরিয়ে যাওয়া আর কেউ কেউ বলেন নামায থেকে অবসরতা। আমরা পবিত্রতা ভঙ্গের কারণ হিসেবে নামায থেকে অবসরতার কোন নজির পাইনি। তবে ওয়াক্ত পেরিয়ে যাওয়ার নজির রয়েছে। যেমন– মোজার উপর মাসেহ। অতএব, যার নজির পাওয়া যায় তথা ওয়াক্ত পেরিয়ে যাওয়া সেটাকে ওযু ভঙ্গের কারণ সাব্যস্ত করা উচিত। সেটা নয় যার কোন নজির নেই। কাজেই বলতে হয় যে, রক্তপ্রদর আক্রান্ত মহিলা প্রতিটি ওয়াক্তের জন্য ওযু করবে, প্রতিটি নামাযের জন্য নয়। আমাদের দাবিও তাই।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বিদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ ১/৬১, আমানিল আহবার ঃ ২/৭৭-৮৮, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ১/২৯২-৩১৬।

باب حكم بول ما يؤكل لحمه

## অনুচ্ছেদ ঃ গোশ্‌ত ভক্ষণযোগ্য জন্তুর প্রস্রাবের হুকুম

### মাযহাবের বিবরণ ঃ

যে সব জন্তুর গোশ্‌ত খাওয়া যায় না সেগুলোর পেশাব এরূপভাবে মানুষের প্রস্রাব সর্বসম্মতিক্রমে নাপাক।

১. যে সব জন্তুর গোশত খাওয়া যায়, সেগুলোর প্রস্রাব ইমাম মালিক, আহমদ ও মুহাম্মদ, যুফার, ইবরাহীম নাখঈ, সুফিয়ান সাওরী, আমির শা'বী, যুহরী, কাতাদা র. প্রমুখের মতে পাক। ইমাম তাহাভী র. فذهب قوم الخ দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ ও আবু ইউসুফ, আবু সাওর, ইবনে হাযম জাহিরী র. প্রমুখের মতে এগুলোর প্রস্রাব নাপাক। যেমন নাপাক সেসব প্রাণীর

প্রস্রাব যেগুলোর গোশত খাওয়া যায় না। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

فلمَّا احتملتْ ماذكرنَا ولم يكنْ فِيهَا دليلٌ علىٰ طهارةِ الابوالِ احتجنَا اَن نرجِع فنلتمس ذالكَ مِن طريقِ النظرِ فنعلمَ كيفَ حكمُه، فنظرنَا فى ذٰلكَ فاِذا لحومُ بنِى اٰدمَ كلٌّ قدْ اجمعَ اَنها لحومٌ طاهرةٌ واَن ابوالَهم حرامٌ نجسةٌ فكانتْ ابوالُهم باتفاقِهم محكومًا لَها بحكمِ دمائِهم لابحكمِ لحومِهم۔ فالنظرُ علىٰ ذالكَ ان تكونَ كذلكَ ابوالُ الابلِ يحكَمُ لهَا بحكمِ دمائِها لابحكمِ لحومِها فثبتَ بما ذكرنَا ان ابوالَ الابلِ نجسةٌ فهٰذا هوَ النظرُ وهو قولُ ابى حينفةَ رحمهُ اللهُ تعالىٰ ـ

**গোশত ভক্ষণযোগ্য জন্তুর প্রস্রাব পবিত্র নয়, অপবিত্র**
**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

ইমাম তাহাভী র.-এর মতে মানুষের গোশ্ত পাক এবং প্রস্রাব নাপাক হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। এতে বুঝা গেল মানুষের প্রস্রাবের হুকুম তাদের রক্তের অধীনস্থ। যেমনিভাবে রক্ত নাপাক, এরূপভাবে প্রস্রাবও নাপাক। এটা গোশতের অধীনস্থ নয়। অতএব, যুক্তির দাবি হল যেসব পশুর গোশত খাওয়া জায়েয সেগুলোর প্রস্রাবের হুকুমও সেগুলোর রক্তের অধীনস্থ হয়। যেরূপভাবে এগুলোর রক্ত নাপাক তেমনিভাবে প্রস্রাবও নাপাক, গোশতের অধীনস্থ নয় যে, গোশতের মত প্রস্রাবকেও পাক সাব্যস্ত করবে।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ফয়যুল বারী ঃ ১/৩২৫, মাআরিফুস সুনান ঃ ১/২২৩, আমানিল আহবার ঃ ২/১০৯-১১২, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ১/৩১৭-৩২৫।

## باب صفة التيمم كيف هى

## অনুচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুম কিভাবে করতে হয়?

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

তায়াম্মুমে মাসেহের পরিমাণ কি? এতে মতবিরোধ রয়েছে–

১. ইবনে শিহাব যুহরী ও মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা র.-এর মতে মাসেহ হবে কাঁধ ও বগল পর্যন্ত। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, ইমাম আওযাঈ এবং আহলে জাহিরের মতে শুধু কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করা ওয়াজিব।

৩. ইমাম মালিক র. এর একটি রেওয়ায়াত হল, কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করা ওয়াজিব আর কনুই পর্যন্ত সুন্নত বা মুস্তহাব। কেউ কেউ এটাকে ইমাম মালিক র. এর মাযহাব সাব্যস্ত করেছেন।

৪. ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিঈ (এবং প্রসিদ্ধ উক্তি অনুযায়ী ইমাম মালিক), সুফিয়ান সাওরী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামী আইনবিদের মতে, কনুই পর্যন্ত মাসেহ করা ওয়াজিব। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

فلمَّا اختلفُوا فِى التيممِ كيفَ هوَ واختلفتْ هٰذه الرواياتُ فِيه رجعنَا الٰى النظرِ فىْ ذٰلكَ لِنستخرِجَ بهِ مِن هٰذه الاقاويلِ قولًا صحيحًا فاعتبرنَا ذٰلكَ فوجدنَا الوضوءَ علٰى الاعضاءِ التِىْ ذكرَ اللهُ تعالٰى فِى كتابِه وكانَ التيممُ قد اسقِطَ عن بعضِها فاسقطَ عن الرأسِ والرجلينِ فكانَ التيممُ هوَ على بعضِ مَا عليهِ الوضوءُ فبطلَ بذٰلكَ قولُ مَن قالَ انِه الىٰ المناكبِ لِانه لمَّابطلَ عنِ الرأسِ والرجلينِ وهمَا مِمَّا يوضأنَ كانَ احرٰى اَن لايجبَ علٰى مَالاَ يوضأُ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

ইমাম তাহাভী র. বলেন, তায়াম্মুমের উদ্দেশ্য হল, সহজ করা, হালকা করা। যেমন– আল্লাহ্ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াতে ইরশাদ করেছেন– مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা ওজুর অঙ্গসমূহ থেকে কোন কোন অঙ্গ অর্থাৎ, মাথা ও পা-কে তায়াম্মুম থেকে বাদ দিয়েছেন। সহজ করার জন্য ওযুর কোন কোন অঙ্গ থেকে তায়াম্মুম বাদ দিয়েছেন। যে অঙ্গ ওজুতে ছিল না, অর্থাৎ, কনুইয়ের উপরের অংশ (কাঁধ ও বগল পর্যন্ত অংশ) কিভাবে তায়াম্মুমে বাড়িয়ে এর উপর মাসেহের হুকুম লাগানো যাবে? এ কারণে কনুইদ্বয়ের উপরের অংশ তায়াম্মুমে না থাকা প্রমাণিত হচ্ছে।

ثُم اختلِفَ فِى الذِراعين هلْ يُؤمَمَانِ ام لاَ؟ فرأينَا الوجهَ يؤمَّمُ بالصَّعِيدِ كَمَا يغسَلُ بالماءِ ورأينَا الرأسَ والرجلينِ لايُؤمَمُ مِنهمَا شئٌ فكانَ ماسقَطَ التيممُ عن بعضِه سقطَ عن كلِّه وكانَ مَا وجبَ فيهِ التيممُ كانَ كالوضوءِ سواءً لانه جُعِلَ بدلاً مِنه. فلمَّا ثبتَ اَنَّ بعضَ مَايغسلُ من اليدينِ فى حالِ وجودِ الماءِ تيممَ فِى حالِ عدمِ الماءِ ثبتَ بذالكَ انَّ التيممَ فى اليدينِ اِلى المِرفَقينِ قياسًا ونظرًا علىٰ مَا بينَّا مِن ذَالكَ وهٰذا قولُ ابىْ حنيفةَ وابىْ يوسفَ ومحمدٍ رحمهمُ اللهُ تعالىٰ۔

**কনূই পর্যন্ত মাসেহ করা জরুরী ঃ**

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. ইমাম মালিক, আহমদ, ইসহাক ও আওযাঈ র. প্রমুখের মতে কবজিদ্বয় পর্যন্ত তায়াম্মুম করা আবশ্যক।

২. ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ র. ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে কনুইদ্বয় পর্যন্ত তায়াম্মুম করা জরুরী।

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

বাকি রইল বাহুদ্বয়ের হুকুম। সেটা তায়াম্মুম থেকে বাদ পড়বে কিনা? আমরা দেখছি, ওযুর যে অংশ তায়াম্মুম থেকে বাদ পড়ে সেটি পূর্ণতঃই বাদ পড়ে। যেমন– মাথা ও পদদ্বয়। এগুলো পূর্ণতঃ বাদ পড়ে। এরূপ নয় যে, কিছু অংশ বাদ পড়ে আর কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকে। এরূপভাবে ওযুর যে অংশ তায়াম্মুমে বাকি থাকে সেটি পূর্ণত অবশিষ্ট থাকে। কারণ, তায়াম্মুম ওজুর বদল। যাতে বদল স্বীয় আসলের পরিপন্থী হওয়া আবশ্যক না হয়। যেমন–চেহারা, এর পূর্ণটাই মাসেহ করতে হয়। যেমন ওযুতে পূর্ণতঃ ধৌত করতে হয়। এরূপ নয় যে, ওযুতে পূর্ণ চেহারা ধৌত করতে হয়, আর তায়াম্মুমে চেহারার কোন অংশ মাসেহ করতে হয়। কাজেই যারা কব্জি পর্যন্ত মাসেহের প্রবক্তা, তারা যেহেতু মেনে নেন যে, ওযুতে হাত যতটুকু পর্যন্ত ধৌত করতে হয় এর কিছু অংশ

তায়াম্মুমে মাসেহ করা জরুরি। অতএব, তাঁকে অবশিষ্ট অংশের মাসেহ মেনে নিতে হবে। অতএব, তাকে বাকি অংশ মাসেহ করার বিষয়টিও মেনে নিতে হবে, যাতে একই অঙ্গে বিভাজনও না ঘটে এবং বদল স্বীয় আসলের পরিপন্থী হওয়া আবশ্যক না হয়। এতে প্রমাণিত হল যে, তায়াম্মুম হস্তদ্বয়ের কনুইদ্বয় পর্যন্ত করতে হয়, কব্জিদ্বয় পর্যন্ত নয়।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য মাআরিফুস সুনান ঃ ১/৪৭৮, আওজাযুল মাসালিক ঃ ১/১৩২, আল-কাওকাবুদ দুররী ঃ ১/৮৮, আমানিল আহবার ঃ ২/১১৯, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ১/৩২৮-৩৪০।

## باب الاستجمار

## অনুচ্ছেদ ঃ পাথর বা ঢিলা ব্যবহার

### মাযহাবের বিবরণ ঃ

استجمار অর্থাৎ, ইসতিনজায় পাথর বা ঢিলা ব্যবহার করা। এখানে তিনটি বিষয় রয়েছে–

১. انقاء অর্থাৎ, ঢিলা দিয়ে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করা।

২. ايتار অর্থাৎ, বেজোড় ঢিলা ব্যবহার করা।

৩. تثليث অর্থাৎ, তিন ঢিলায় ইসতিনজা করা।

এ তিনটি বিষয়ের হুকুম সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে–

১. ইমাম শাফিঈ, আহমদ, ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, আবুল ফারাজ, ইবনে হাযম জাহিরী ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব র.-এর মতে ঢিলা দ্বারা পরিষ্কার করা এবং তিন ঢিলা ব্যবহার করা উভয়টিই ওয়াজিব। তিন ঢিলার বেশি বেজোড় সংখ্যা ব্যবহার করা মুস্তাহাব। فذهب قوم الى ان الاستجمار لايجزي باقل من ثلاثة احجار الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা, মালিক ও দাঊদ জাহিরী র.-এর মতে মূল ওয়াজিব হল, পরিষ্কার করা। চাই কম দ্বারা হোক বা বেশি ঢিলা দ্বারা। তিন ঢিলা ব্যবহার করা মাসনুন বা মুস্তাহাব। বেজোড় ঢিলা ব্যবহার করা মুস্তাহাব। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَامَّا مِن طريقِ النظرِ فانَّا رأينَا الغائطَ والبولَ اِذا غُسلاَ بالماءِ مرةً فذهبَ بذالكَ اثرهُما وريحُهُمَا حَتّٰى لَم يَبقَ مِن ذالكَ شيءٌ اَنَّ مكانَهما قَدطهرَ ولَو لم يَذهبْ بذالكَ لونُهما ولاَ ريحُهُمَا احْتيجَ الٰى غسلهِ ثانيةً، فاِن غسلَ ثانيةً فذهبَ لونُهما وريحُهُمَا طهرَ بذالكَ كما يطهرُ بالواحدةِ بغسلٍ مرتينِ احْتيجَ اِلى اَن يغسلاَ بعدَ ذالكَ حتّٰى يذهبَ لونُهما وريحُهما فكانَ مايرادُ فِى غَسلِهما هو ذَهابُهُما بِما اذهَبهمَا مِن الغسلِ ولمْ يُرِدْ فى ذالكَ مقداراً مِن الغسلِ معلومًا لايجزئُ ماهو اقلُّ منه. فالنظرُ علٰى ذالكَ اَن يكونَ كذالكَ الاستجمارُ بالحجارةِ لايرادُ مِن الحجارةِ فِى ذالكَ مقدارٌ معلومٌ لاَيجزئُ الاستجمارُ باقلَّ منهُ ولكن يُجزئُ مِن ذالكَ مَا اَذهبَ بالنجاسةِ مِماقَلَّ او كثُرَ، وهٰذا هو النظرُ وهوَ قولُ ابىْ حنيفةَ وابىْ يوسفَ ومحمدِ بنِ الحسنِ رحمهمُ اللهُ تعالٰى -

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

ইমাম তাহাভী র. বলেন, আমরা দেখি পেশাব-পায়খানার রং ও গন্ধ একবার ধুইলে যদি দূরীভূত হয়, তবে এর দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হয়ে যায়। যদি একবার দ্বারা নাপাক দূরীভূত না হয়, তবে দুইবার ধোয়ার প্রয়োজন হয়। আর যদি দুইবার ধুইলে নাপাক দূরীভূত না হয়, তবে তিনবার। আর যদি তিনবারেও না হয়, তবে চারবার। এমনিভাবে সামনের দিকেও কিয়াস করুন। যতক্ষণ পর্যন্ত পরিষ্কার না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ধোয়ার প্রয়োজন থাকবে। এতে বুঝা গেল, এখানে আসল উদ্দেশ্য পরিষ্কার করা। কোন নির্ধারিত সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়। অতএব, যুক্তির দাবি হল, পানি দ্বারা ইসতিনজার মত পাথর দ্বারা ইসতিনজাতেও কোন বিশেষ সংখ্যা আবশ্যক নয়। বরং যত ঢিলা দ্বারা পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হবে ততগুলোই জরুরি হবে, কম হোক বা বেশি। এতে প্রমাণিত হল, ওয়াজিব মূলত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, তিন ঢিলা ব্যবহার নয়।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য মাআরিফুস সুনান ঃ ১/১১৪, নায়লুল আওতার ঃ ১/৯৩, বযলুল মাজহুদ ঃ ১/৫, ফাতহুল মুলহিম ঃ ১/৪২২, আমানিল আহবার ঃ ২/১৬৪, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ১/৩৪৯-৩৫৪।

# كتاب الصلوة

# সালাত পর্ব

## অনুচ্ছেদ ঃ আযান কিভাবে দিবে?

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

আযানের ধরণ সম্পর্কে দু'টি ইখতিলাফ রয়েছে–

**১. শুরুতে কতবার আল্লাহু আকবার বলবে।**

(১) ইমাম মালিক হাসান, ইবনে সীরীন র. ও মদীনাবাসীর মতে আযানের শুরুতে তাকবীর হবে দুইবার। فذهب قوم الى هذا الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

(২) ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ, আহমদ র. ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে তাকবীর হবে চারবার। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

فَكَانَ هٰذا القولُ عندنَا اصحَّ القولينِ فِى النظرِ؛ لِانَّا رأينَا الاذانَ مِنه مَايردَّدُ فى موضِعينِ ومنهُ ما لَايرددُ اِنما يذكَر فِى موضعٍ واحدٍ، فامَّا ما يذكرُ فى موضعٍ واحدٍ ولايكررُ فالصلٰوةُ والفلاحُ، فذالكَ يُنادى بكلِّ واحدٍ منه مرتينِ والشهادةُ تذكرُ فِى موضعينِ فِى اولِ الاذانِ وفى اخرهِ فتثنّٰى فى اولِه فيقالُ اشهدُ ان لَا الٰهَ الَّا اللهُ مرتينِ ثم تفردُ فى آخرهِ فيقالُ لَآ اِلٰه الَّا اللهُ ولا يثنّٰى ذالكَ فكانَ مايثنّٰى مِن الاذانِ انما يثنّٰى على نِصفِ مَاهوَ عليهِ فِى الاولِ۔ وكانَ التكبيرُ يذكرُ فى موضِعَيْنِ فِى اوَّل الاَذانِ وبعدَ الفلاحِ فاَجمعُوا انهٗ بعدَ الفلاحِ يقولُ اللهُ اكبرْ اللهُ اكبرْ، فالنظرُ علٰى ماوصفنَا اَن يكونَ ما اختلِفَ فيهِ مِمَّا يُبتدأُ بهِ الاذانُ مِن

التكبير أن يكون مثل ما يثنى به قياسا ونظرا على مابينا من الشهادة أن لا إله الا الله فيكون ما يبتدأبه الاذان من التكبير على ضعف ما يثنى فيه من التكبير، فإذا كان الذى يثنى هو الله اكبر الله اكبر كان الذى يبتدأبه هو ضعفه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، فهذا هو النظر الصحيح وهو قول ابى حنيفة وابى يوسف ومحمد رحـ غير أن ابايوسف رحـ قدروى عنه ايضا فى ذالك مثل القول الاول ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

ইমাম তাহাভী র. বলতে চান যে, আযানের কালিমা দু'ধরনের–

১. যে সব কালিমা দুই স্থানে বলা হয়, যেমন– তাওহীদ, তাকবীর শাহাদাতে।

২. যেসব কালিমা শুধু এক স্থানেই বলা হয়, যেমন–

حى على الصلوة ـ حى على الفلاح

অতএব, আমরা আযানের কালিমাগুলোতে একটি বিশেষ পদ্ধতি ও মূলনীতি দেখি, যেসব কালিমা এক জায়গায় বলা হয়, সেগুলো দু'বার করে বলা হয়। এ কারণে حى على الصلوة দু'বার এবং حى على الفلاح দু'বার বলা হয়। আর যে সব কালিমা দু'স্থানে বলা হয়, সেগুলো দ্বিতীয় স্থানে যতবার বলা হয় প্রথম স্থানে এর দ্বিগুণ হয়, যেমন– আযানের শুরুতে তাওহীদ তাকবীরের পরে হয় এবং আযানের শেষেও হয়। দ্বিতীয় স্থানে শুধু একবার لا اله الا الله আর প্রথম স্থানে এর দ্বিগুণ। এজন্য اشهد ان لا اله الا الله দু'বার উল্লেখ করা হয়। যে কালিমা দু'স্থানে উল্লিখিত হবে, তার মূলনীতি হল, প্রথম স্থানে দ্বিতীয় স্থানের দ্বিগুণ হবে। বস্তুতঃ তাকবীর তথা আল্লাহু আকবার, দ্বিতীয় স্থানে অর্থাৎ, حى على الصلوة ـ حى على الفلاح-এর পর সর্বসম্মতিক্রমে দু'বার। কাজেই উপরোক্ত মূলনীতির দাবি হল, প্রথম স্থানে এর দ্বিগুণ অর্থাৎ, চারবার হবে। অএতব আযানের শুরুতে তাকবীর চারবার প্রমাণিত হল।

**২. শাহাদতদ্বয়ে তারজী' আছে কিনা?**

১. ইমাম শাফিঈ ও মালিক র. এর মতে শাহাদতদ্বয়ে তারজী' আছে। তারজী' হল শাহাদতদ্বয়কে দু'বার ছোট আওয়াজে বলে আবার দু'বার উচ্চস্বরে বলা। فذهب قوم الى الترجيع الخ দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা ও আহমদ র. এর মতে শাহাদতদ্বয়ে তারজী' নেই। وتركه اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

স্মর্তব্য, এই দু'টি মতবিরোধের কারণে আযানের কালিমার সংখ্যা সম্পর্কেও মতানৈক্য হয়ে গেছে।

ইমাম আবু হানীফা ও আহমদ র.-এর মতে মোট আযানের কালিমা ১৫টি। তারজী' ছাড়া চারবার করে।

ইমাম মালিক র. এর মতে সতেরটি। চারবার তারজী' ছাড়া।

ইমাম শাফিঈ র. এর মতে ১৯টি। চারবার তারজী'সহকারে।

তবে এসব মতবিরোধ হল, উত্তমতা সংক্রান্ত।

فَلَمَّا احتملَ ذالكَ وجبَ النظرُ لِنستخرجَ بهٖ مِن القولين قولاً صحيحًا فرأينَا ماسوى مَا اختلفَ فِيه مِنَ الشهادةِ اَن لاَ الٰه اِلاَّ اللهُ واَنَّ محمدًا رسولُ اللهِ لا ترجيعَ فيهِ فالنظرُ علٰى ذالكَ اَن يكونَ مَا اختلفُوا فِيه مِن ذالكَ معطوفًا علٰى مَا اَجمعُوا عَليهِ ويكونَ اجماعُهم ان لاَترجيعَ فى سائرِ الاذانِ غيرِ الشهادةِ يقضىٰ علىٰ اختلافِهم فِى الترجيعِ فِى الشهادةِ وهٰذا الذىْ وصفنَا وَما بينَّاه مِن نفىِ الترجيعِ قولُ ابىْ حنيفةَ وابىْ يوسفَ ومحمدٍ رحمهمُ اللهُ تعالىٰ ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

শাহাদতদ্বয় ছাড়া আযানের অন্য কোন কালিমাতে সর্বসম্মতিক্রমে তারজী' নেই। শাহাদতদ্বয়ের ইজমায়ী তারজীহীনতা শাহাদতদ্বয়ের বিতর্কিত তারজীর উপর সিদ্ধান্তদাতা, বস্তুত শাহাদাতদ্বয় ছাড়া অন্যত্র সর্বসম্মতিক্রমে তারজী নেই। অতএব, অন্যান্য কালিমার ন্যায় শাহাদতদ্বয়েও তারজী' না হওয়া উচিত। যাতে আযানের সমস্ত কালিমার হুকুম বরাবর থাকে। যুক্তির দাবি এটাই।

## باب الاقامة كيف هى؟

## অনুচ্ছেদ ঃ ইকামত কিরূপ হবে?

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. ইমাম মালিক, বরীয়াতুর রায় র. এবং মদীনাবাসীর মতে ইকামতের কালিমা সর্বমোট দশটি– الله اكبرُ الله، اكبرُ ـ اشهد ان لآ اله الا الله ـ اشهد ان محمدا رسول الله ـ حى على الصلوة ـ حى على الفلاح ـ قد قامت الصلوة ـ الله اكبرُ الله اكبرُ لآ اله الا الله ـ

অর্থাৎ, اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله ـ শুধু একবার, তেমনিভাবে حى على الصلوة ـ حى على الفلاح ও একবার قد। قامت الصلوة ও একবার। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম শাফিঈ, আহমদ, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, আওযাঈ, হাসান বসরী র., মিসরবাসী, ইয়ামানবাসী, শামবাসী ও হিজাযবাসীদের মতে ইকামতের কালিমা মোট ১১টি। ইমাম মালিক র. কর্তৃক বর্ণিত ইকামতেরই ন্যায়। তবে তাদের মতে ইকামত قد قامت الصلوة দুইবার হবে। وخالفهم اخرون فى حرف واحد من ذالك দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. ইমাম আবু হানীফা, সুফিয়ান সাওরী, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক র. ও কুফাবাসীর মতে ইকামতের কালিমা ১৭টি। আযানের ১৫টি, আর حى على الصلوة، حى على الفلاح এরপর قد قامت الصلوة দুইবার। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَاحتجُّوا فِى ذالكَ ايضًا مِن النظرِ فقالُوا رأينَا الاذانَ مَاكانَ مِنهُ مكررًا لَم يثنَّ فِى المرةِ الثانيةِ وجُعلَ على النصفِ مِمَّا هُوَ عليهِ فِى الابتداءِ وكانتِ الاقامةُ لايبتدأُ بِهَا اِنما يكونُ بعدَ الاذانِ فكانَ النظرُ علٰى ذالكَ ان يكونَ مَافيهَا مِمَّا هوَ فى الاذانِ غيرَ

مثنًّى ومَا فِيها مِمَّا ليسَ فِى الاذانِ مثنًّى فكلُّ الاقامةِ فِى الاذانِ غيرُ قدْ قامتِ الصلٰوةُ فيفردُ الاقامةُ كلُّها ولا يثنّى غيرُ قد قامتِ الصلٰوةُ فانهَا تكررُ لِانها ليستْ فى الاذانِ ۔

واَما وجهُ ذالكَ مِن طَريقِ النظرِ فاِنَّ قومًا احتجُّوا فِى ذَالكَ مِمنْ يَقُولُ الاقامةُ تفردُ مرةً مرةً بالحجةِ التىْ ذكرنَاهَا لَهُم فِى هٰذا البابِ ومِمَّا يكررُ فى الاذانِ مِمَّا لايكررُ، فكانتِ الحجةُ علَيهِم فىْ ذالكَ اَن الاذانَ كمَا ذكرُوا مَا كانَ مِنه مِما يذكرُ فى موضِعينِ ثُنِّىَ فى الموضِعِ الاولِ وافردَ فى الموضِعِ الاخرِ ومَا كانَ مِنهُ غيرَ مثنًّى افُردَ واَمَّا الاَقامةُ فاِنما تُفْعلُ بعدَ انقطاعِ الاذانِ فلَهَا حكمٌ مُستَقِلٌّ

**দ্বিতীয় পক্ষের একটি যৌক্তিক প্রমাণ ও এর উত্তর**

ইমাম তাহাভী র. নিজের যৌক্তিক প্রমাণ পেশ করার পূর্বে প্রতিপক্ষের একটি যৌক্তিক প্রমাণের উত্তর দিয়েছেন। যে দলীলটি তিনি প্রথমে উল্লেখ করেছিলেন। তাদের যৌক্তিক প্রমাণ হল, আযান সম্পর্কে ইমাম তাহাভী র. যে নজর বা যৌক্তিক দলিল উল্লেখ করে প্রমাণ পেশ করেছিলেন, তার দাবি হল, ইকামতের কালিমাগুলো যেন একবারই হয়। কারণ, তিনি বলেছিলেন, আযানের কালিমাগুলো দু'প্রকারের। দ্বিতীয় প্রকার হল, যেগুলো বারবার উল্লেখিত হয়। এগুলো সম্পর্কে মূলনীতি হল, দ্বিতীয় স্থানে প্রথম স্থানের অর্ধেক হয়। অর্থাৎ, যেটি পরবর্তীতে আসবে, সেটি প্রথমটির অর্ধেক হবে। ইকামতও আযানের পরে হয়। অতএব, এটি আযানের অর্ধেক হবে। কাজেই ইকামতে একবার হওয়াই যুক্তির দাবি।

ইমাম তাহাভী র. এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যে, ইকামত আযান শেষ হবার পরে হয়। অতএব, এরজন্য স্বতন্ত্র হুকুম হবে। এটাকে আযানের অধীনস্থ সাব্যস্ত করা ঠিক হবে না।

এর বিস্তারিত বিবরণ হল, এখানে তৃতীয় পক্ষ থেকে দ্বিতীয় দলের যৌক্তিক প্রমাণের উত্তর দেয়া হয়েছে যে তাদের দাবী ছিল ইকামত একেক বার করে

হবে। তাদের এই দাবীর উপরে এই প্রমাণ কায়েম করেছিলেন যে, আযানের শব্দগুলো দু' প্রকার ঃ

১. যেসব শব্দের পুনরাবৃত্তি হয় না।

২. যেসব শব্দ র পুনরাবৃত্তি হয়।

দ্বিতীয় স্থানে প্রথম স্থানের তুলনায় অর্ধেক হয়ে থাকে। অর্থাৎ, মূলনীতি ছিল যেটি পরবর্তীতে হবে সেটি প্রথমটির অর্ধেক হবে। আর ইকামতও পরবর্তীতে হয়ে থাকে। কাজেই আযানের অর্ধেক হবে এ বিষয়টিকে গ্রন্থকার فان قوما احتجوا فى ذالك থেকে غير مثنى افرد পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। واما الاقامة থেকে فلها حكم مستقل পর্যন্ত তাদের প্রমাণ রদ করে দিয়েছেন।

সারকথা, এ মাসআলাতে ইমাম তাহাভী র. এর যৌক্তিক প্রমাণ হল, আযান ও ইকামত উভয়টিই لا اله الا الله এর উপর শেষ হয়। বস্তুতঃ لا اله الا الله উভয়টিতে একবার একবার করেই হয়। অতএব, যেহেতু সংখ্যাগতভাবে ইকামতের শেষ কালিমা আযানের শেষ কালিমার মতই হয়, সেহেতু ইকামতের অবশিষ্ট কালিমাগুলোও আযানের কালিমার সাথে সংখ্যায় এক রকম হওয়া উচিত।

وَقد رأينَا ماتختمُ بِه الاقامةُ مِن قولِ لآ الٰهَ اللهُ هُوَ مايختمُ به الاذانُ ايضًا فالنظرُ علٰى ذالكَ اَن تكونَ بقيةُ الاقامةِ علٰى مثلِ بقيةِ الاذانِ ايضًا فكانَ ممَّا يدخلُ على هٰذه الحجَّةِ اَنَّا رأينَا مَا تُخْتَمُ به الاقامةُ لانِصفَ لهُ فيجوزُاَن يكوَن المقصودُ اليهِ مِنهُ هُوَ نصفُهُ اِلاَّ انه لَمَّالم يكنْ له نصفٌ كانَ حكمُه حكمَ سائرِ الاشياءِ التىْ لاتنقسمُ ممَّا اِذا وجبَ بعضُها وجبَ بوجوبِه كلُّها فلِهٰذا صارَما تُختمُ به الاذانُ والاقامةُ مِن قولِ لآ الٰه الا اللهُ سواءً فلَم يكنْ فِى ذالكَ دليلٌ لِاحد المعنيينِ على الاخرِ ـ

**ভিন্ন পদ্ধতিতে প্রমাণ পেশ ঃ**

উপরোক্ত যৌক্তিক প্রমাণে একটি প্রশ্ন হতে পারে, সেটি হল, তাহলীল لا اله الا الله বিভাজনযোগ্য নয়। কারণ, এটিকে দুইভাগ করলে বাক্য পূর্ণ

থাকবে না। অতএব এই কালিমার হুকুম সেসব জিনিসের মত হবে যেগুলোর অংশত অস্তিত্ব পূর্ণত অস্তিত্বকে আবশ্যক করে এবং এগুলোতে বিভাজন হতে পারে না। (যেমন– অর্ধ তালাক দিলে পূর্ণ তালাক হয়ে যায়) অতএব, এই কালিমা لا اله الا الله এরূপ হল যে, যখন এর অর্ধেক বলা হবে, তখন এর পূর্ণটি বলা আবশ্যক। কারণ, এটির বিভাজন ও অর্ধাংশ সম্ভব নয়। অতএব, হতে পারে, ইকামতে অর্ধেকই উদ্দেশ্য। কিন্তু বাধ্য হয়ে পূর্ণ কালিমা উল্লেখ করতে হয়েছে। অতএব, লাইলাহা ইল্লাহ্‌র মধ্যে আযান ও ইকামতের কালিমাকে বহাল রাখা ও না রাখার ব্যাপারে কোন প্রমাণ নেই। কাজেই উপরোক্ত নজর তথা যৌক্তিক প্রমাণ বিশুদ্ধ নয়।

ثُمَّ نظرنَا فِى ذالكَ فرأينَاهُم لَم يَختَلِفُوا انه فِى الاقَامةِ بَعدَ الصلٰوةِ والفلاحِ يقولُ اللهُ اكبرُ اللهُ اَكبَرْ فيجئُ بِه ههنَا على مثلِ مَايجئُ بهِ فِى الاذانِ فِى هٰذا الموضعِ وَلايَجئُ بهِ علىٰ نصفِ مَاهوَ عليهِ فى الاذانِ فلمَّا كانَ هٰذا مِن الاقامةِ مِمَّالهٗ نصفٌ علىٰ مثلِ مَاهُوَ عَلَيهِ فِى الاذانِ سواءً كانَ مَا بقىَ مِن الاقامةِ ايضًا هو علىٰ مِثلِ مَاهوَ عليهِ فى الاذانِ ايضًا سواءً لايحذفُ مِن ذَالك شئٌ فَثبتَ بذالكَ اَن الاقامةَ مثنٰى مثنٰى وهٰذا قولُ ابى حنيفةَ وابىْ يوسفَ ومحمدٍ رحمهمُ اللهُ تعالىٰ ـ

**দ্বিতীয় যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

প্রশ্ন যথার্থ হওয়ার কারণে ইমাম তাহাভী র. আর একটি যৌক্তিক প্রমাণ পেশ করেছেন। যার উপর কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে না।

উল্লেখ্য, ইমাম তাহাভী র. প্রথম নজরটি পেশ করার পর এর উপর প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন। এর কারণ, তার প্রসিদ্ধ রীতি তিনি প্রতিপক্ষের সাথে চলেন। অন্যথায় শুরুতেই এই দ্বিতীয় নজরটি পেশ করতে পারতেন।

দ্বিতীয় যৌক্তিক প্রমাণটির সারমর্ম হল– এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, حى على الصلوة ـ حى على الفلاح-এর পর আল্লাহু আকবার যেরূপভাবে আযানে দু'বার সেরূপভাবে ইকামতেও দু'বার। অথচ এতে অর্ধেক করা সম্ভব

ছিল। অর্থাৎ, দু'বারের পরিবর্তে আল্লাহু আকবার শুধু একবার বলা যেত। যেহেতু বিভাজন ও অর্ধেক করা সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও এই তাকবীর ইকামতে দুবারই ছিল, যেমন ছিল আযানে, সেহেতু কালিমায়ে তাকবীরের ন্যায় ইকামতের অবশিষ্ট কালিমাও দু'বারের দিক দিয়ে আযানের মত হওয়া উচিত। এর ফলে ইকামতের কালিমা দু'বার হওয়াই প্রমাণিত হয়, একবার নয়। এটাই আমাদের দাবি।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নায়লুল আওতার ঃ ১/৩৩৭, ফাতহুল মুলহিম ঃ ২/৫, আমানিল আহবার ঃ ১/২০২-২০৪, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ ১/১০৫, আওজাযুল মাসালিক ঃ ১/১৮৫, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ১/৩৭১-৩৭৭।

## باب التاذين للفجر اى وقت هو بعد طلوع الفجر اوقبل ذالك

## অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের আযান সুবহে সাদিকের পূর্বে না পরে?

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, ফজর ছাড়া অবশিষ্ট নামাযগুলোতে ওয়াক্ত আসার পূর্বে আযান দেয়া যথেষ্ট নয়। দিলে ওয়াক্ত আসলে পুনরায় আযান দেয়া ওয়াজিব। ফজর সম্পর্কে মতবিরোধ আছে।

১. ইমাম শাফিঈ, মালিক, আহমদ ও আবু ইউসুফ,আওযাঈ, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইবনে মুবারক র. ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে ফজরের আযান ওয়াক্ত আসার পূর্বেও দেয়া যেতে পারে। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ সুফিয়ান সাওরী, আলকামা, হাসান বসরী, ইবরাহীম নাখঈ র. ও আসহাবে জাহিরের মতে অন্যান্য নামাযের ন্যায় ফজরের ওয়াক্ত আসার পূর্বে আযান দেয়া যথেষ্ট নয়। দিলে ওয়াক্ত আসার পূর্বে পুনরায় দেয়া ওয়াজিব। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

فَلَمَّا اُبِيحَ ذالكَ ثبتَ اَن ذالكَ الوقتَ وقتٌ لِلاذانِ واحتملَ تقديمُهم اذانَ بلالٍ قبلَ ذالكَ ماذكرنَا ثم اعتبرْنَا ذالكَ ايضًا مِن طريقِ النظرِ لِنستَخْرِجَ مِن القَولَيْنِ قولاً صَحِيْحًا فرأينَا سائرَ الصلوةِ غيرِ الفجرِ لايؤذنُ لهَا الا بعدَ دخولِ اوقاتِها واختلفُوا فِى

الفجرِفقالَ قومٌ التأذينُ لهَا قبلَ دخولِ وقتِهَا وقالَ اخرونَ بلْ هوبعدَ دخولِ وقتِها، فالنظرُ على مَا وصفنَا ان يكونَ الاذانُ لهَا كَالاذانِ لغيرِها مِن الصلواتِ فلمَّا كانَ ذالكَ بعدَ دخولِ اوقاتِها كانَ ايضًا فِى الفجرِ كذالكَ فهٰذا هو النظرُ وهوَ قولُ ابى حنيفةَ ومحمدٍ وسفيانَ الثوريِّ رحمهمُ اللهُ تعالىٰ ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

ইমাম তাহাভী র. বলেন, ফজর ছাড়া অবশিষ্ট নামাযগুলোতে ওয়াক্ত আসার পূর্বে আযান দিলে তা সর্বসম্মতিক্রমে সহীহ নয়। অতএব, অন্যান্য নামাযের ন্যায় ফজর নামাযের আযানও ওয়াক্ত আসার পূর্বে সহীহ না হওয়া উচিত। যুক্তির দাবিও তাই।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নায়লুল আওতার ঃ ১/৩৪৮, বযলুল মাজহুদ ঃ ১/৩০৫, আওজাযুল মাসালিক ঃ ১/১৯১, মাআরিফুস সুনান ঃ ২/২১৩, আমানিল আহবার ঃ ২/২৩৬, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ১/৩৮৮/৩৯৬।

باب الرجلين يوذن احدهما ويقيم الاخر

## অনুচ্ছেদ ঃ একজনে আযান অপরজনে ইকামত দিবে

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. ইমাম শাফিঈ, আহমদ লাইস ইবনে সা'দ ও আওযাঈ র.এর মতে মুয়াযযিন ব্যতীত অন্য ব্যক্তির ইকামত দেয়া সাধারণত মাকরূহ। চাই মুয়াযযিনের অনুমতিতে হোক অথবা তার অনুমতি ছাড়া। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইকামত আদায় হয়ে যাবে। فذهب قوم الى هذا الحديث الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা, মালিক, ইবরাহীম নাখঈ র. ও আসহাবে জাওয়াহিরের মতে যদি মুয়াযযিনের অনুমতি থাকে, মৌখিক হোক অথবা, অবস্থাগত (মৌন), তবে বিনা মাকরূহ জায়েয। আর যদি কোন প্রকার অনুমতি না হয়, তবে মাকরূহ। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

فلمّا تضادّ هٰذان الحديثان اردنا اَن نلتمس حكمَ هٰذا الباب من طريق النظر لنستخرجَ به من القولين قولاً صحيحًا فَنظرنا فى ذٰلك فوجدنَا الاصلَ المتفقَ عليه اَنه لايَنبغىْ ان يوذنَ رجلان اذانًا واحدًا يؤذنُ كلٌّ واحدٍ منهمَا بعضَه فاحتملَ ان يكونَ الاذانُ والاقامةُ كذالكَ لايفعلُهمَا اِلاّ رجلٌ واحدٌ واحتملَ ان يكونَ كالشّيْأَين المتفرقين فَلابأسَ بِان يتولّى كلُّ واحدٍ منهمَا رجلٌ علٰى حِدةٍ فنظرنَا فِى ذالكَ فرأينَا الصلوٰةَ لهَا اسبابٌ تتقدمُهَا من الدعاء اليهَا بالاذان ومِن الاقامَة لهَا هٰذا فِى سائرِ الصلوات ورأينَا الجمعةَ تَتقدمُها خطبةٌ لابدَّ منهَا فكانتِ الصلوٰةُ مضمنةً بالخطبةِ وكانَ منْ صلّى الجمعةَ بغيرِ خطبةٍ فصلاتهُ باطلةٌ حتّى تكونَ الخطبةُ قد تقدمتِ الصلوةَ ورأينَا الامامَ لايجبُ ان يكونَ هو غيرَ الخطيبِ لِانَّ كلَّ واحدٍ منهمَا مضمّنٌ بِصاحبه، فلمَّا كانَ لابدَّ منهمَا لم يَنبغ انْ يكونَ القائمُ بِهمَا الارجلاً واحدًا ورأينَا الاقامةَ جعلتْ مِن اسبابِ الصلوٰةِ ايضًا واَجمعُوا اَنه لاَبأسَ اَن يتولَّاهَا غيرُ الامامِ فكمَا كانَ يتولّاها غيرُ الامامِ وهىَ مِن الصلوٰةِ اقربُ مِنها مِن الاذانِ كانَ لابأسَ اَن يتولّاها غيرُ الذىْ يتولّى الاذانَ، فهٰذا هوَ النظرُ وهوَ قولُ ابىْ حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدِ بنِ الحسنِ رحمهمُ اللهُ تعالىٰ -

যৌক্তিক প্রমাণ ঃ

ইমাম তাহাভী র. বলেন, চিন্তা-ফিকির করলে আমরা একটি মূলনীতি পাই যে, দু'ব্যক্তির জন্য একটি আযান দান জায়েয নেই। অর্থাৎ, আযানের কোন কোন কালিমা বলবে একজন, আবার অন্য কোন কোন কালিমা পড়বে অন্যজন– এরূপ হতে পারে না। এতে কারও কোন মতবিরোধ নেই। মতবিরোধ হয়েছে এ বিষয়ে যে,

১. আযান ও ইকামত উভয়টিই একই জিনিসের পর্যায়ভুক্ত যে, একই জনের উভয়টি দেয়া জরুরি?

২. নাকি আযান ও ইকামত উভয়টি স্বতন্ত্র বিষয়, যার ফলে একজন আযান দিলে অপরজন ইকামত দিলে কোন অসুবিধা নেই?

আমরা চিন্তা-গবেষণা করে দেখলাম, নামাযের জন্য এরূপ কিছু আসবাব হয়ে থাকে যেগুলো নামাযের আগে হয়। এসব আসবাবের অন্তর্ভুক্ত আযান ইকামতও। যেগুলো সমস্ত নামাযেই হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে জুম'আর নামাযের আসবাবের মধ্যে একটি হল খুৎবা যা জুম'আর নামাযের জন্য জরুরি। জুম'আর নামাযের সাথে এর মিলিত হওয়া এতটা আবশ্যক যে, এই খুৎবা বর্জন করলে নামাযই বাতিল হয়ে যাবে। অতএব, জুমআ'র নামায ও এর খুৎবাদাতা একই ব্যক্তি হওয়া সমীচীন। যিনি খুৎবা দিবেন, তিনিই ইমাম হবেন।

এদিকে আমরা দেখছি, ইকামত নামাযের আসবাবের একটি। এর নৈকট্য আযানের সাথে যতটা, নামাযের সাথে তার চেয়ে বেশি। অতএব, সমীচীন ছিল একই ব্যক্তি কর্তৃক আযান ও ইকামত দান। অর্থাৎ, স্বয়ং ইমাম কর্তৃক ইকামত বলা। অথচ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, ইকামতদাতা ইমাম ছাড়া অন্য ব্যক্তি তথা মুয়াযযিন হলে কোন অসুবিধা নেই। তাহলে নামাযের সাথে নৈকট্য ও সম্পর্ক বেশি হওয়া সত্ত্বেও নামায আদায়কারী ইমাম ছাড়া অন্য ব্যক্তি ইকামত দিলে কোন অসুবিধা নেই। অতএব, এই ইকামতদাতা মুয়াযযিন ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি হলেও কোন অসুবিধা হবে না। কারণ, ইকামতের নৈকট্য ও সম্পর্ক আযানের সাথে নামাযের তুলনায় কম। অতএব, আযান-ইকামতদাতা আলাদা আলাদা ব্যক্তি হলে বিনা মাকরূহ জায়েয হবে। অবশ্য মুয়াযযিন যদি অসন্তুষ্ট হয়, তবে মাকরূহ হবে। এটা ভিন্ন ব্যাপার।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বযলুল মাজহুদ ঃ ২/২৪৭, আওজাযুল মাসালিক ঃ ১/১৯১, মাআরিফুস সুনান ঃ ১/২০৭, আমানিল আহবার ঃ ২/২৪৭, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ১/৩৯৬-৩৯৯।

## باب مواقيت الصلوة

## অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের ওয়াক্ত

এই অধ্যায়ে ইমাম তাহাভী র. বিভিন্ন মাসআলা বর্ণনা করেছেন। তবে যৌক্তিক প্রমাণ পেশ করেছেন শুধু তিনটি মাসআলায়।

**প্রথম মাসআলা ঃ**

**আসরের নামাযের ওয়াক্ত কখন শেষ হয়?**

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, যুফার, ইবনে হুযাইল ইবনে ওয়াবের রেওয়ায়াত অনুযায়ী ইমাম মালিক র. ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে এবং ইমাম শাফিঈ র. এর প্রধান ও দ্বিতীয় উক্তি অনুযায়ী আসরের ওয়াক্ত শেষ হয় সূর্যাস্ত ঘটলে। غير ان قوما الخ দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝানো হয়েছে।

২. ইমাম আহমদ র.এর বিশুদ্ধ মাযহাব, ইমাম মালিক র.এর প্রসিদ্ধ উক্তি ও ইমাম শাফিঈ র. এর এক উক্তি, হাসান ইবনে যিয়াদ, আসতাখরী ইহসাক ও দাউদ র.-এর মতানুসারে আসরের ওয়াক্ত শেষ হয় সূর্য হলুদ রং ধারণ করলে। ইমাম তাহাভী র. এ মত অবলম্বন করে যৌক্তিক প্রমাণের আলোকে তা সাব্যস্ত করেছেন। فكان من الحجة من ذهب الى ان اخروقتها الى تغير الشمس الخ দ্বারা তাঁদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَامَّا وجهُ النَّظرِ عندنَا فِى ذالِكَ فانّا رأينَا وقتَ الظهرِ الصلواتُ كلُّها فِيه مباحةُ التطوعِ كلُّه وقضاء كلِّ صلوةٍ فائتةٍ وكذالكَ ما اتفقَ عليهِ اَنهُ وقتُ العصرِ ووقتُ الصبحِ مباحٌ قضاءُ الصلواتِ الفائتاتِ فيهِ فانّما نُهِىَ عن التطوعِ خاصةً فيه فكانَ كلُّ وقتٍ قد اتفقَ عليهِ انّهُ وقتُ الصلوةِ من هٰذه الصلواتِ كلٌّ قد اجمعَ ان الصلوةَ الفائتةَ تقضٰى فِيه، فلمَّا ثبتَ اَن هٰذه صفةَ اوقاتِ الصلواتِ المجمعُ عليْهَا وثبتَ اَنَّ غروبَ الشمس لاتقضٰى فيه صلوةٌ فائتةٌ باتفاقِهم خرجتْ بذالكَ صفته مِن صفةِ اوقاتِ الصلواتِ المكتوباتِ وثبتَ انه لاتصلّٰى فِيه صلوةٌ اصلاً كنصفِ النهارِ وطلوعِ الشمسِ وانَّ نَهىَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ عنِ الصلوةِ عِند غُروبِ الشمسِ نَاسخ لقولِه من ادركَ من العصرِ ركعةً قبلَ ان تغرُبَ الشمسُ فقد ادركَ العصرَ للدلائلِ اللتىْ شرحناهَا وبينّاهَا فهٰذا هو النظرُ عندنَا وهوَ قَولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمهم الله تعالى۔

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

ইমাম তাহাভী র. বলেন, নামাযের ওয়াক্তগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে বুঝা যায়, নামাযের কোন কোন ওয়াক্ত এরূপ রয়েছে, যেগুলোতে নফল নামায পড়া ও সর্বপ্রকার ছুটে যাওয়া নামায কাযা করা জায়েয আছে। যেমন– জোহর নামাযের ওয়াক্ত। আর কোন কোন ওয়াক্ত আছে, যেগুলোতে নফল নামায পড়া নিষিদ্ধ হলেও ছুটে যাওয়া নামায কাযা করা জায়েয আছে। যেমন– ফজর নামাযের ওয়াক্ত এবং আসরের সর্বসম্মত ওয়াক্ত তথা আসর নামায পড়ার পর থেকে সূর্য হলুদ রং ধারণ করার সময় পর্যন্ত। এতে সর্বসম্মতিক্রমে ছুটে যাওয়া নামায কাযা করা জায়েয আছে। কিন্তু নফল পড়া নিষিদ্ধ। অতএব, এর দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট, নামাযের যে ওয়াক্তই হোক তাতে নফল জায়েয হোক অথবা না হোক, তাতে ছুটে যাওয়া নামায কাযা করা জায়েয হবে। অপরদিকে সবাই একমত যে, সূর্যাস্তের সময় ছুটে যাওয়া নামায কাযা করা নিষিদ্ধ। এতে বুঝা গেল, সূর্যাস্তের ওয়াক্তটি নামাযের সময় নয়। অন্যথায় এতে ছুটে যাওয়া নামায কাযা করা নিষিদ্ধ হত না। যেমন– নামাযের অন্যান্য ওয়াক্তে হয়ে থাকে। অতএব, ছুটে যাওয়া নামায কাযা নিষিদ্ধ হওয়া এর প্রমাণ যে, এতে সূর্য দ্বি-প্রহরে বরাবর হলে এবং সূর্যোদয়ের সময়ে ব্যাপক আকারে কোন প্রকার নামায জায়েয নেই। চাই ফরয হোক বা নফল, আদায় হোক অথবা কাযা। অতএব, সূর্যাস্তের সময়কে কোন নামাযের ওয়াক্ত সাব্যস্ত করা ঠিক নয়।

**দ্বিতীয় মাসআলা ঃ**

**মাগরিব নামাযের সময় কখন শুরু হয়?**

১. ইমাম আতা ইবনে আবু রাবাহ, তাউস, ইবনে কায়সান, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ এবং শিয়া রাফিযীদের মতে মাগরিব নামাযের ওয়াক্ত তারকা প্রকাশিত হওয়ার সময় থেকে শুরু হয়।

২. ইমাম চতুষ্টয় বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের মতে মাগরিবের সময় সূর্যাস্তের সাথে সাথে শুরু হয়ে যায়।

وهٰذا هو النظرُ ايضا لِانَّا قدرأينَا دخولَ النهارِ وقتٌ لِصلٰوة الصبحِ فكذالكَ دخولُ الليلِ وقتٌ لصلٰوةِ المغربِ وهوَ قولُ ابىْ حنيفةَ وابىْ يوسفَ ومحمدٍ وعامةِ الفُقهاءِ رحمَهم اللهُ تعالٰى ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

ইমাম তাহাভী র. বলেন, দিন প্রবেশ তথা সুবহে সাদিক উদয়ের সাথে সাথে ফজরের ওয়াক্ত সর্বসম্মতিক্রমে আরম্ভ হয়। অতএব, এরূপভাবে রাত্রি

প্রবেশ অর্থাৎ, সূর্যাস্তের সাথে সাথেই মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হওয়া উচিত। এটাই যুক্তির দাবি।

**তৃতীয় মাসআলা ঃ**

**মাগরিবের সময় কখন শেষ হয়?**

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. ইমাম মালিক র. এর এক উক্তি, ইমাম শাফিঈ র. এর নতুন উক্তি অনুসারে সূর্যাস্তের পর প্রথান্তির সাথে উযু করে খুশু -খুযু'র সাথে ৩ রাক'আত নামায পড়ার সময় পরিমাণ ওয়াক্ত। এরপর মাগরিবের সময় শেষ হয়ে যায়।

২. ইমাম আবু হানীফা আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, সুফিয়ান সাওরী ও আহমদ র. ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে, এমনিভাবে ইমাম মালিক র. এর দ্বিতীয় উক্তি এবং শাফিঈ র. এর পুরনো উক্তি অনুসারে মাগরিবের সময় থাকে শাফাক পর্যন্ত। মালিকিদের নিকট এ উক্তিটি প্রসিদ্ধ। শাফিঈদের নিকট এর উপরই ফতওয়া।

শাফাক সম্পর্কে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতবিরোধ হয়েছে। এর দ্বারা শাফাকে আহমার (লালিমা) উদ্দেশ্য, না শাফাকে আবইয়ায (শুভ্রতা)? এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে–

১. ইমাম শাফিঈ, মালিক (এর এক উক্তি), আহমদ, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ, সাওরী, ইবনে আবু আবু লায়লা, তাউস, মাকহুল, হাসান, ইবনে হুয়াই, আওযাঈ, ইসহাক ও দাউদ ইবনে আলী র.-এর মতে, শাফাক দ্বারা উদ্দেশ্য শাফাকে আহমার উদ্দেশ্য যা সূর্যাস্তের পর প্রকাশিত হয়। অতএব, এটি উধাও হলেই মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাবে। وقال قوم اذا غاب الشفق الخ দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২. ইমাম আবু হানীফা, যুফার, উমর ইবনে আব্দুল আযীয, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, যুফার ইবনে হুযাইল, আবু সাওর ও মুবাররাদ র.-এর মতে, শাফাক দ্বারা উদ্দেশ্য, শাফাকে আবইয়ায, যা শাফাকে আহমারের পর প্রকাশিত হয়। অতএব, এটি তিরোহিত হলে মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাবে। فقال اخرون اذا غاب الشفق وهوالبياض الخ দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইমাম তাহাভী র.এর এই দ্বিতীয় ইখতিলাফের পর যৌক্তিক প্রমাণ কায়েম করেছেন।

وكَانَ النظرُ فِى ذالكَ عندَنا انهم قَد اَجمعُوا اَنَ الحمرةَ التىْ قبلَ البياضِ مِن وقتِها وَانما اختلافُهم فِى البياضِ الذىْ بعدَه فقالَ بعضُهم حكمُه حكمُ الحمرةِ وقالَ بعضُهم حكمُه خلافُ حكمِ

الحمرة فنظرنا فى ذالك فرأينا الفجر يكون قبله حمرة ثم يتلوها بياض الفجر فكانت الحمرة والبباض فى ذالك وقتا لصلوة واحدة وهو الفجر فاذا خرجا خرج وقتها فا لنظر على ذالك ان يكون البياض والحمرة فى المغرب ايضا وقتا لصلوة واحدة وحكمهما حكم واحد اذا خرج وقت الصلوة اللذان هما وقت لها

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

ইমাম তাহাভী র. বলেন, যেরূপভাবে সূর্যাস্তের পর রাতের অন্ধকার ছেয়ে যাওয়ার পূর্বে দু'টি শাফাক হয়ে থাকে– আহমার ও আবইয়ায। এরূপভাবে ফজর উদয়ের পর সূর্যোদয় তথা প্রকৃতঅর্থে দিনের আলো প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেও একটি লালিমা হয়ে থাকে। এরপর আসে একটি শুভ্রতা। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, সূর্যাস্তের পর যে লালিমা দেখা যায়, সেটা হল মাগরিবের ওয়াক্ত। কিন্তু এর পরবর্তী শুভ্রতা সম্পর্কে মতবিরোধ হয়ে গেছে। এদিকে ফজর উদয়ের পরবর্তী লালিমা ও শুভ্রতা উভয়টি ফজরের ওয়াক্তে হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। কাজেই যেরূপভাবে ফজরের লালিমা ও শুভ্রতা উভয়টি ফজরের ওয়াক্তে অন্তর্ভুক্ত এরূপভাবে মাগরিবের লালিমা ও শুভ্রতা উভয়টি মাগরিবের ওয়াক্তে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। এতদুভয়ের মাঝে কোন প্রকার ব্যবধান না করা উচিত। যুক্তির দাবি এটাই।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আওজাযুল মাসালিক ঃ ১/১, বযলুল মাজহুদ ঃ ১/২২৭, আমানিল আহবার ঃ ২/২৬৪, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ১/৪০৯-৪৪৯।

## باب الجمع بين الصلوتين كيف هو؟

## অনুচ্ছেদ ঃ দুই নামায একত্রে কিভাবে আদায় করবে?

দুই নামায একত্রে আদায়ের দু'টি সুরত রয়েছে–

১. বাহ্যতঃ একত্রে আদায়, ২. প্রকৃত অর্থে একত্রে আদায়।

প্রথমটির সুরত হল, প্রথম নামায স্বীয় ওয়াক্তের বিলকুল শেষে এবং দ্বিতীয় নামাযটিকে স্বীয় ওয়াক্তের বিলকুল শুরুতে আদায় করা। এভাবে উভয় নামায স্ব-স্ব ওয়াক্তে আদায় করা যায়। শুধু বাহ্যতঃ দুই নামায একত্রে আদায় করা হয়। দ্বিতীয়টির সূরত হল, উভয় নামাযকে একই ওয়াক্তে আদায় করা, চাই প্রথম

নামাযকে সরিয়ে দ্বিতীয় ওয়াক্তে পড়া হোক, যেমন– মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা উভয়টিকে ইশার নামাযের সময় একত্রে আদায় করা হয়। এ ধরনের একত্রিকরণকে বলে– جمع تاخير অথবা দ্বিতীয় নামাযকে তার ওয়াক্ত থেকে এগিয়ে এনে প্রথম নামাযের ওয়াক্তে আদায় করা। যেমন– আরাফার ময়দানে আসরের নামাযকে এগিয়ে এনে জোহর ও আসর উভয়টিকে জোহরের ওয়াক্তে আদায় করা হয়। এ ধরনের একত্রিকরণকে বলে – جمع تقديم

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

বাত্যতঃ দুই নামায একত্রে আদায় করা প্রয়োজনের মুহূর্তে জায়েয। এ ব্যাপারে সবাই একমত। এরূপভাবে প্রকৃত অর্থে আরাফা ও মুযদালিফায় একত্রে দু'ওয়াক্ত নামায আদায় করা বিধিবদ্ধ। এ ব্যাপারে কারও কোন মতবিরোধ নেই। বরং সেখানে তো একত্রে আদায় করতেই হবে। অবশ্য আরাফা মুযদালিফা ছাড়া অন্যত্র প্রকৃত অর্থে দুই নামায একত্রে পড়া জায়েয আছে কিনা– এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে।

১. ইমাম শাফিঈ, মালিক, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাওয়াইহ, সুফিয়ান সাওরী র. এর মতে ওজর হলে প্রকৃত অর্থে দুই নামায একত্রে পড়া জায়েয আছে। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

অবশ্য ওজরের বিস্তারিত বিবরণের ক্ষেত্রে তাদের মাঝে মতবিরোধ আছে। শাফিঈ ও মালিকীদের মতে, সফর ও বৃষ্টি ওজর। ইমাম আহমদ র. এর মতে, রোগও ওজর।

অতঃপর সফরেও ইমাম শাফিঈ র. পূর্ণ সফরের মেয়াদকে ওজর সাব্যস্ত করেন। কিন্তু ইমাম মালিক র. বলেন, প্রকৃত অর্থে দুই নামায একত্রে আদায় তখন জায়েয আছে, যখন মুসাফির ভ্রমণে থাকে। যদি কোথাও অবস্থান করে যদিও একদিনের জন্যই হোক না কেন, তবে সেখানে প্রকৃত অর্থে একত্রে আদায় করা জায়েয নেই।

ইমাম মালিক র. থেকে একটি রেওয়ায়াত হল, সাধারণ ভ্রমণাবস্থাও যথেষ্ট নয়। বরং যখন কোন কারণে দ্রুত ভ্রমণ জরুরি হয়, তবে প্রকৃত অর্থে দুই নামায একত্রে আদায় জায়েয আছে, অন্যথায় নয়।

অতঃপর তাঁদের মতে, আগে একত্রিত করা ও পরে একত্রিত করা উভয়টি জায়েয আছে। পরবর্তীতে একত্রিত করার জন্য তাঁদের মতে শর্ত হল, প্রথম নামাযের ওয়াক্ত অতিক্রমের পূর্বে পূর্বেই একত্রে আদায়ের নিয়ত করতে হবে।

আগে একত্রে আদায়ের জন্য শর্ত হল–প্রথম নামায শেষ করার পূর্বে পূর্বে একত্রে আদায়ের নিয়ত করতে হবে। অন্যথায় একত্রে আদায় করা জায়েয হবে না।

২. আতা ইবনে আবূ বারাহ, তাউস ইবনে কায়সান, মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির সাফওয়ান ইবনে সুলাইম, মুজাহিদ প্রমুখের মতে প্রকৃত অর্থে একত্রিকরণ সফর ও মুকীম অবস্থায় ওজর থাকুক বা না থাকুক সর্বাবস্থায় ব্যাপক আকারে জায়েয।

৩. ইমাম আবু হানীফা এবং ইউসুফ র. ও মুহাম্মদ হাসান বসরী, ইবনে সীরীণ ইবরাহীম নাখঈ র. এর মতে, প্রকৃত অর্থে দুই নামায আরাফা ও মুযদালিকায় বিশেষ ছুরতে একত্রিত করা ব্যতীত অন্য কোথাও জায়েয নেই। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وامَّا وجهُ ذالكَ مِن طريقِ النظرِ فانَّا قدْ رأينَاهُم اجمعُوا انَّ صلٰوةَ الصبحِ لايَنبغِيْ ان تُقدمَ علٰى وقتِهَا ولا توخرَ عنهُ فانَّ وقتَها وقتٌ لهَا خاصةً دونَ غيرِها منَ الصلواتِ، فالنظرُ علٰى ذالكَ ان يكونَ كذالكَ سائرُ الصلواتِ كلُّ واحدةٍ منهنَّ منفردةً لوقتِها دونَ غيرِها فينبغىْ ان توخرَ عنْ وقتِها ولَا تقدمَ قبلَه ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ :**

ইমাম তাহাভী র. বলেন, এ ব্যাপারে সমস্ত আলিম একমত যে, ফজরের নামাযকে এর ওয়াক্তের আগে বা পরে আদায় করা জায়েয নেই। কারণ, এটা এর বিশেষ ওয়াক্ত, যাতে ফজর নামায আদায় করা আবশ্যক। অতএব, যুক্তির দাবি হল, সমস্ত নামাযের হুকুম অনুরূপ হওয়া। অর্থাৎ, প্রতিটি নামায স্বীয় ওয়াক্ত অনুযায়ী আদায় করা আবশ্যক। বিশেষ ও নির্ধারিত সময় ছাড়া আগ-পাছ করা জায়েয নয়।

فانِ اعتلَّ معتلٌّ بالصلٰوةِ بعرفةَ وبجمعٍ قِيلَ لهُ قدرَأينَاهم اَجمعُوا اَنَ الأمامَ بعرفةَ لَوْ صلّٰى الظهرَ فِى وقتِها سائرَ الايامِ وفعلَ مثلَ ذالكَ فِى المغربِ والعشاءِ بمزدلفةَ فصلّٰى كلَّ واحدةٍ منهمَا فى وقتِها ـ كمَا يُصلىْ فِى سائرِ الايامِ كانَ مسيئًا ولَو

فعلَ ذالكَ وهو مُقِيمٌ او فَعلَه وهوَ مسافرٌ فِى غيرِ عرفةَ وجمعٍ لَم يكنْ مُسِيئًا فثبتَ بذالكَ اَنَّ عرفةَ وجمعًا مخصوصتانِ بهٰذا الحكمِ واَنَّ حكمَ مَا سِواهمَا فى ذالكَ بخلافِ حكمِهمَا ۔

**একটি প্রশ্নোত্তর ঃ**

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, প্রকৃত অর্থে দুই ওয়াক্ত যেহেতু একত্রে আদায় করা জায়েয নেই, তাহলে আরাফা মুযদালিফায় জায়েয হল কেন?

এর উত্তর হল, এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, ইমাম যদি আরাফাতে যোহরের নামাযকে এর ওয়াক্তে এবং আসরের নামাযকে এর ওয়াক্তে এরূপভাবে মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার মধ্য থেকে প্রত্যেকটিকে স্ব-স্ব ওয়াক্তে আদায় করে, যেমন– অন্যান্য দিনে করা হয়, তবে ইমাম মন্দ কর্মসম্পাদনকারী হবেন। অথচ কোন মুকীম বা মুসাফির আরাফা ও মুযদালিফা দিবস ছাড়া অন্য দিনে উপরোক্ত নামাযগুলোতে স্ব স্ব ওয়াক্তে আদায় করলে তাকে মন্দকর্ম সম্পাদনকারী বলা হয় না। বরং তাকে উত্তম কর্মসম্পাদনকারী সাব্যস্ত করা হয়। এতে বুঝা যায়, আরাফা ও মুযদালিফা প্রকৃত অর্থে দুই ওয়াক্ত নামায একত্রে আদায়ের হুকুমের সাথে বিশেষিত। অন্যথায় এই নামাযগুলো সেখানে স্ব স্ব ওয়াক্তে আদায় করা মন্দ কাজ হত না। অতএব, এগুলোকে অন্যগুলোর উপর কিয়াস করা সহীহ নয়।

**–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ফাতহুল মুলহিম ঃ ২/২৬৯, আওজাযুল মাসালিক ঃ ২/৫০, বযলুল মাজহুদ ঃ ২/২৩৩, মাআরিফুস সুনান ঃ ২/৬১, নববী ঃ ১/২৪৫, আমানিল আহবার ঃ ২/৩১৯-৩২০, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ১/৪৫০-৪৬৮।**

## باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فى الصلوة

## অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়া

এখানে দুটি মাসআলা আছে–১. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম কুরআন মজীদের অংশ কিনা? ২. এটিকে নামাযে উচ্চস্বরে পড়বে? না নিচু স্বরে?

**প্রথম মাসআলা ঃ**

**বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম কুরআন মজীদের অংশ কিনা?**

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, সূরা নামলে যে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম আছে, সেটি কুরআন মজীদের বরং সে সূরারও অংশ। অবশ্য যে বিসমিল্লাহ সূরাগুলোর শুরুতে পড়া হয়, সেটা সম্পর্কে মতবিরোধ আছে।

১. ইমাম মালিক র. আওযাঈ, কোন কোন হানাফী ও কোন কোন শাফিঈর মতে, এই বিসমিল্লাহ কুরআনে কারীমের অংশ নয়, বরং অন্যান্য যিকিরের ন্যায় এটি একটি যিকির।

২. ইমাম শাফিঈ, আতা, মুজাহিদ, তাউস ও আহমদ র.-এর এক উক্তি অনুসারে এটি কুরআনে কারীমের অংশ, বরং সূরা ফাতিহার শুরুতে যে বিসমিল্লাহ রয়েছে, সেটি সূরা ফাতিহারও অংশ। অবশ্য অবশিষ্ট সূরাগুলোর অংশ কিনা এ বিষয়ে তাঁর দু'টি উক্তি রয়েছে। বিশুদ্ধতম উক্তি হল, বাকি সূরাগুলোরও অংশ।

৩. ইমাম আবু হানীফা ও আহমদ র. এর মতে, এই বিসমিল্লাহ কুরআনে কারীমের অংশ। কিন্তু কোন বিশেষ সূরার অংশ নয়, বরং এটি একটি স্বতন্ত্র আয়াত। দুই সূরার মাঝে ব্যবধানের জন্য এই আয়াতটি নাযিল করা হয়েছে।

**দ্বিতীয় মাসআলা ঃ**

**নামাযে বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পড়বে না নিচুস্বরে?**

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. ইমাম শাফিঈ, আতা ইবনে রাবাহ, তাউস ইবনে কায়সান, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবাইর র. এর মতে, যেহেতু বিসমিল্লাহ প্রতিটি সূরার অংশ সেহেতু উচ্চস্বরে আদায়কৃত নামাযে তা জোরে, আর নিঃশব্দে আদায়কৃত নামাযে আস্তে পড়তে হয়। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা ও আহমদ র. ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিসের মতে, যেহেতু এটি কুরআনে কারীমের অংশ। কিন্তু কোন সূরার অংশ নয়। সেহেতু স্বশব্দে ও নিঃশব্দে আদায়কৃত উভয় প্রকার নামাযে এটা আস্তেই পড়তে হবে, জোরে নয়। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. এই মাসআলাটি মূলতঃ প্রথম মাসআলার শাখা। ইমাম মালিক ও আওযাঈ র. যেহেতু এটিকে কুরআনে কারীমের অংশই মানেন না, সেহেতু এটিকে নামাযে পড়ার প্রশ্নই আসে না, না জোরে না আস্তে। فقال بعضهم لايقولها البتتة لا فى السر ولافى العلانية দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝানো হয়েছে।

মনে রাখতে হবে যে, এই মতবিরোধটি বৈধতা অবৈধতার নয়, বরং উত্তমতার।

وقدْ رأينَاها ايضا مكتوبةً فِى فواتحِ السورِ فى المصحفِ فِى فاتحةِ الكتابِ وفى غيرِها وكانتْ فِى غيرِ فاتحةِ الكتابِ ليستْ بايةٍ ثبتَ ايضًا انَها فِى فاتحةِ الكتابِ ليستْ بايةٍ وهٰذا الذىْ ثبَّتنَا مِن نفىِ بِسمِ اللهِ الرحمٰنِ الرحيمِ اَن تكونَ مِن فاتحةِ الكتابِ ومِن نفىِ الجَهرِ بِها فِى الصلوٰةِ هو قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدِ بنِ الحسنِ رحمَهم اللهُ تعالىٰ ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

ইমাম তাহাভী র. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈন থেকে আস্তে বিসমিল্লাহ পড়ার বিষয়টি বিভিন্ন রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা ও তাবেঈন থেকে আস্তে বিসমিল্লাহ পড়ার প্রমাণ দ্বারা বুঝা যায় যে, এই বিসমিল্লাহ কুরআনে কারীমের অংশ নয়। অর্থাৎ, প্রতিটি সূরার অংশ নয়। অবশ্য সমগ্র কুরআনের একটি অংশ। কারণ, যদি এই বিসমিল্লাহ প্রতিটি সূরার অংশ হত তবে অন্যান্য আয়াতের ন্যায় এটাকে জোরে পড়া জরুরি হত। এরূপভাবে সূরা নামলের বিসমিল্লাহ জোরে পড়া হয়। যদ্বারা প্রমাণিত হয়, বিসমিল্লাহ কোন সূরার অংশ নয়, এটিকে জোরে পড়া হবে না, বরং আউযুবিল্লাহ ও ছানার ন্যায় আস্তে পড়া উচিত।

তাছাড়া কুরআনে কারীমের সূরা বারাআত ছাড়া সমস্ত সূরার শুরুতে এটি লিপিবদ্ধ আছে। আর এটা যেন বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য কোন সূরার অংশ না হওযার ব্যাপারে সবার ঐকমত্য হল। তেমনি অন্যান্য সূরার ন্যায় এই বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহারও অংশ না হওয়া উচিত। যুক্তির দাবি এটাই।

স্মর্তব্যঃ ইমাম শাফিঈ র. এর দু'টি উক্তির একটি হল, বিসমিল্লাহ অন্য সূরারও অংশ, যেমন– সূরা ফাতিহার। কিন্তু এই উক্তির আবিষ্কারক স্বয়ং ইমাম শাফিঈ র.। পূর্ববর্তী সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হল, বিসমিল্লাহ অন্য কোন সূরার অংশ নয়। অবশ্য সূরা ফাতিহার অংশ কিনা এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। ইমাম তাহাভী র. এর যুক্তির এই অংশ এরই উপর নির্ভরশীল।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আমানিল আহবার ঃ ৩/২৫-৩৭, নায়লুল আওতার ঃ ২/৯০, বযলুল মাজহুদ ঃ ২/৩৬, ফাতহুল মুলহিম ঃ ২/৩৪, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ ১/১২৪, আল-আবওয়াবু ওয়াত তারাজিম ঃ ২/১৭, আওজাযুল মাসালিক ঃ ১/২২৮, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ১/ ৫৪৯-৫৬৪।

## باب القراءة فی الظهر والعصر

## অনুচ্ছেদ ঃ জোহর ও আসরের কিরাআত

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

কিরাআত ফরয হওয়ার বিষয়টি শুধু সশব্দে পঠিতব্য নামাযের সাথে খাস, নাকি সশব্দে ও নিঃশব্দে পঠিতব্য উভয় নামাযের ক্ষেত্রে ব্যাপক– এ বিষয়ে মতবিরোধ আছে।

১. সুয়াইদ ইবনে গাফালা রা., হাসান ইবনে সালিহ, ইবরাহীম ইবনে উলাইয়্যার মতে এবং ইমাম মালিক র. এর এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী বিশেষভাবে সশব্দে পঠিতব্য নামাযের সাথে খাস। অতএব জোহর ও আসর নামাযে কোন কিরাআত নেই। وخالفهم فی ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২. ইমাম মালিক র. এর প্রসিদ্ধ উক্তি, ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ, আহমদ র. বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিসের মতে জোহর ও আসরের নামাযেও কিরাআত ফরয। অবশ্য নিঃশব্দে পড়তে হবে, সশব্দে পড়া জায়েয নেই। فذهب قوم الی هذه الاثار الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

فَلَمَّا ثبتَ بِما ذكرنَا مِن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ تحقيقُ القراءةِ فِى الظهرِ والعصرِ وانتفٰى مارُوِىَ عن ابنِ عباسٍ رض مِمَّا يخالفُ ذالكَ رجعنَا الى النظرِ بعدَ ذالكَ هلْ نجدُ فِيه مَا يدلُّ علٰى صحةِ احدِ القولينِ اللذينِ ذكرنَا، فاعتبرنَا ذالك فَرأينَا القيامَ فى الصلٰوةِ فرضًا وكذالكَ الركوعُ وكذلكَ السجودُ وهٰذا كلُّه مِن فرضِ الصلٰوةِ وهىَ به مضمَّنةٌ لاتجزئُ الصلوةُ اذا تركَ شيئٌ مِن ذالكَ وكانَ ذالكَ فِى سائرِ الصلواتِ سواءً ورأينَا القعودَ الاولَ سنةً لا اختلافَ فِيه فهوَ فِى كلِّ الصلواتِ سواءٌ ورأينَا القعودَ الاخيرَ فِيه اختلافٌ بينَ الناسِ فمِنهم مَن يَقولُ هو فرضٌ ومِنهم مَن يقولُ اِنه سنةٌ وكلُّ فريقٍ مِنهم قَد جعلَ ذالكَ فِى كلِّ الصلواتِ سواءً فكانتْ هٰذه الاشياءُ ما كانَ مِنها فرضًا فى صلٰوةٍ فهوَ فرضٌ فِى كلِّ صلٰوةٍ ـ

وكَانَ الجهرُ بالقراءةِ فى صلوةِ الليلِ ليسَ بفرضٍ ولكنه سنةً وليستِ الصلوةُ به مضمنةً كما كانتْ مضمنةً بالركوعِ والسجودِ والقيامِ فذالكَ قدينتفىْ مِن بعضِ الصلواتِ ويثبتُ فى بعضِها والذىْ هوَ فرضً والصلوةُ بهِ مضمنةً ولا تجزىُ الا بِاصابتِهِ اِذا كانَ فِى بعضِ الصلواتِ فرضًا كانَ فى سائرِها كذالكَ، فَلمَّا رأينَا القرأةَ فِى المغربِ والعشاءِ والصبحِ واجبةً فى قولِ هٰذا المخالِفِ لَابدَّ مِنها ولا تجزىُ الصلوةُ الا باصابتِها كانَ كذالك هِى فِى الظهرِ والعصرِ، فهٰذه حجةً قاطعةً علىٰ مَن ينفىْ القراءةَ فِى الظهرِ والعصرِ ممَّن يرَاها فرضًا فِى غيرِهِما -

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

ইমাম তাহাভী র. বলতে চান, আমরা দেখি–

১. কিয়াম, রুকু এবং সিজদা নামাযের ফরযের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর একটিও ছুটে গেলে নামায সহীহ হয় না। এতে সমস্ত নামায একরকম। অবশ্য নফল নামাযের কিয়াম জরুরি নয়।

২. প্রথম বৈঠক ওয়াজিবের পর্যায়ভুক্ত। এ বিষয়ে সব নামাযের হুকুম বরাবর। কোন নামাযে ওয়াজিব হবে, আর কোন নামাযে ওয়াজিব হবে না– এরূপ নয়।

৩. আমরা দেখি, শেষ বৈঠকের ব্যাপারে মতবিরোধ হয়ে গেছে। কেউ কেউ এটাকে ফরয বলেন– যেমন ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ ও আহমদ র. আর কারও কারও মতে (যেমন ইমাম মালিক র.) কিন্তু এর হুকুম প্রতিটি নামাযে বরাবর হওয়ার ব্যাপারে উভয় পক্ষের ঐকমত্য রয়েছে। অর্থাৎ, যাদের মতে শেষ বৈঠক ফরয, তাদের মতে, তা প্রতিটি নামাযে ফরয। আর যাদের মতে ওয়াজিব, তাদের মতে এটি প্রতিটি নামাযে ওয়াজিব।

৪. তাহাজ্জুদের নামাযে কিরাআত জোরে পড়া ফরয নয় বরং সুন্নত। জোরে পড়া নামাযে রোকনের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেরূপভাবে কিয়াম, রুকু-সিজদা, নামাযের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, কিরাআত জোরে পড়া কোন কোন নামাযে প্রমাণিত, আবার কোন কোন নামাযে বাদ। এজন্য জোহর ও আসর নামাযে কারও জন্যও জোরে কিরাআত নেই।

এবার স্পষ্ট হয়ে গেল, যে কাজটি কোন নামাযের ফরয ও রোকন সে কাজটি সব নামাযে ফরয ও রোকন হয়ে থাকবে। কোন নামায এছাড়া সহীহ্ হয় না। যেমন– কিয়াম, রুকু, সিজদা ইত্যাদির অবস্থান। যে কাজটি নামাযে ফরয নয় সেটি কোন কোন নামাযে প্রমাণিত এবং কোন কোন নামায থেকে বাদও হতে পারে। যেমন উচ্চস্বরে কিরাআত পড়া। এদিকে মাগরিব, ইশা ও ফজর নামাযে কিরাআত ফরয ও রোকন। এ ব্যাপারে আমাদের প্রতিপক্ষ স্বীকার করে যে, এসব নামায কিরাআত ছাড়া সহীহ্ হবে না। কাজেই উপরোক্ত মূলনীতির আলোকে একথা মানতে হবে যে, যোহ্‌র ও আসর নামাযে কিরাআত পড়া ফরয। এছাড়া এসব নামায সহীহ্ হবে না। কারণ, এ কিরাআত কোন নামাযে ফরয এবং কোন নামাযে ফরয হবে না– তা হতে পারে না। অতএব, মাগরিব, ইশা ও ফজর নামাযে কিরাআত ফরয স্বীকার করে জোহ্‌র ও আস্‌রের বেলায় তা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। ফলে কোন কোন লোক বলে যে, কিরাআত কোন নামাযে রোকন নয়। শুধু মাগরিব ইশা ও ফজরে কিরাআত সুন্নত। জোহর ও আসরে কোন কিরাআত নেই এবং উপরোক্ত যৌক্তিক দলীল, শুধু সেসব লোকের বিরুদ্ধে প্রমাণ হতে পারে যারা মাগরিব, ইশা ও ফজরে কিরাআত রোকন স্বীকার করে, জোহ্‌র ও আসরে ও অস্বীকার করে। এজন্য ইমাম তাহাভী র. তাদের মোকাবিলায় আরেকটি যুক্তি পেশ করেছেন। যারা মাগরিব, ইশা ও ফজরের কিরাআত সুন্নত বলে, জোহর ও আসরে তা অস্বীকার করে, তারা হলেন– হাসান, তাঁর ছেলে উলাইয়্যা, হাসান ইবনে সালিহ এবং ইবনে উয়াইনার প্রমূখ।

وامَّا مَن لايرى القراءةَ مِن صلبِ الصلوةِ فانَّ الحجةَ عليهِ فِى ذالكَ انا قد رأينا المغربَ والعشاءَ يقرأُ فِى كليهما فِى قولهِ ويجهرُ فِى الركعتينِ الاوليينِ منهمُا ويخافتُ فيمَا سِوى ذالكَ فلمَّا كانتْ سنةُ ما بعدَ الركعتينِ الاوليينِ هِى القراءةُ ولَم تسقطْ بسقوطِ الجهرِ كانَ النظرُ على ذالكَ ان يكونَ كذالكَ السنةُ فى الظهرِ والعصرِ لما سَقطَ الجهرُ فيها بالقراءةِ ان لايسقط القراءةُ قياساً على ماذكرنَا مِن ذالكَ وهو قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمهمُ اللهُ تعالىٰ ۔

**দ্বিতীয় যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

এর সারমর্ম হল, আমরা দেখি তাদের নিকট মাগরিব ও ইশার প্রতিটি রাক'আতে কিরাআত পড়া হয়। প্রথম দু'রাক'আতে সশব্দে, পরবর্তী রাক'আতে অর্থাৎ, মাগরিবের তৃতীয় রাক'আত ও ইশার শেষ দুই রাক'আতে আস্তে। অতএব, প্রথম দুই রাক'আতের পরবর্তী রাক'আতগুলো থেকে জোরে পাঠ বাদ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মূল কিরাআত বাতিল হয় না। অতএব, যুক্তির দাবি হল, জোহর ও আসর নামায থেকেও জোরে পাঠ বাতিল হওয়ার কারণে মুল কিরাআত বাদ পড়ে না। অতএব, সশব্দে ও নিঃশব্দে প্রতিনি নামাযে কিরাআত মেনে নিতে হবে। বাকি রইল এই কিরাআত নামাযে রোকন ও ফরয হওয়া খুবই স্পষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণিত। যার বর্তমানে কোন ব্যক্তি তা অস্বীকার করতে পারে না

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আমানিল আহবার ঃ ৩/৫৭, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ ১/১২৪, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ১/৫৬৪-৫৭৫।

باب القراءة خلف الامام

## অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের পিছনে কিরাআত

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

মুসল্লী তিন প্রকার– ১. ইমাম, ২. মুনফারিদ, ৩. মুকতাদি। নামায দুই প্রকার– ১. সশব্দ কিরাআত বিশিষ্ট, ২. নিঃশব্দ কিরাআত বিশিষ্ট। ইমাম ও মুনফারিদের জন্য সশব্দ কিরাআত বিশিষ্ট ও নিঃশব্দ কিরাআত বিশিষ্ট নামায উভয়টিতে সর্বসম্মতিক্রমে কিরাআত জরুরি। অবশ্য মুকতাদি সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে।

১. ইমাম মালিক র. এর মতে, সশব্দ কিরাআত বিশিষ্ট নামাযে মুকতাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া মাকরূহ। চাই সে ইমামের কিরাআত শুনুক অথবা না শুনুক। আর নিঃশব্দ কিরাআত বিশিষ্ট নামাযে ফাতিহা পড়া মুস্তাহাব।

২. ইমাম শাফিঈ দাউদ জাহিরী, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, আওযাঈ ও প্রসিদ্ধ উক্তি অনুযায়ী ইবনে মুবারকের মত নিঃশব্দ কিরাআত বিশিষ্ট নামাযে মুকতাদির উপর ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। সশব্দ কিরাআত বিশিষ্ট নামায সম্পর্কে তাঁর পুরনো উক্তি ছিল ওয়াজিব নয়। কিন্তু ওফাতের দুই বছর আগে মিসরে অবস্থানকালে পরবর্তী নতুন উক্তি এই করেছেন যে, সশব্দ কিরআত বিশিষ্ট

নামাযেও মুকতাদির উপর ফাতিহা ওয়াজিব। শাফিঈদের নিকট নতুন উক্তিটির উপরই ফতওয়া। অতএব, ইমাম শাফিঈ র. এর মাযহাব স্থির হল যে, সশব্দ ও নিঃশব্দ কিরাআত বিশিষ্ট উভয় নামাযে মুকতাদির উপর ফাতিহা পড়া ওয়াজিব।

৩. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. এর মতে, সশব্দ কিরাআত বিশিষ্ট নামাযে যদি মুকতাদি ইমামের কিরাআত শুনে তাহলে ফাতিহা পড়া জায়েয নেই। আর যদি এত দূরবর্তী হয় যে, ইমামের আওয়াজ তার নিকট পর্যন্ত পৌঁছে না, তাহলে ফাতিহা পড়া জায়েয আছে। আর সশব্দ কিরাআত বিশিষ্ট নামাযে ইমামের নীরবতার মাঝে এবং নিঃশব্দ কিরাআত বিশিষ্ট নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া মুস্তহাব। فذهب الى هذه الاثار قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

৪. ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ র. এর মতে, সর্বাবস্থায় অর্থাৎ, সশব্দ কিরাআত বিশিষ্ট নামায হোক কিংবা নিঃশব্দ কিরাআত বিশিষ্ট, মুকতাদি চাই ইমামের কিরাআত শুনুক, অথবা না শুনুক, মুকতাদির জন্য ফাতিহা পড়া মাকরূহে তাহরীমী। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

فلمَّا اختلفتْ هٰذه الاثارُ المرويةُ فى ذالكَ التمسنَا حكمَه مِن طريقِ النظرِ فرأينَاهُم جميعًا لايختلفونَ فِي الرجلِ ياتىْ الامامَ وهو راكعٌ اَنه يكبرُ ويركعُ معهٗ ويعتدُّ بتلكَ الركعةِ وانِ لم يَقرأْ فِيها شيئًا. فلمَّا اخبرَ ذالكَ فى حالِ خوفِه فوتَ الركعةِ احتملَ اَن يكونَ انِما اجزَاَه ذالكَ لِمكانِ الضرورةِ واحتملَ اَن يكونَ انِما اَجزاَه ذالكَ لِان القراءةَ خلفَ الامامِ ليستْ عَليه فرضًا. فَاعتبرنَا ذالكَ فرأينَاهم لَايختلفونَ اَن مَن جاءَ الى الامامِ وهوِ راكعٌ فركعَ قبلَ ان يدخلَ فِي الصلٰوةِ بتكبيرٍ كانَ مِنه اَن ذالكَ لايُجزيهُ وان كانَ انما تركَه لِحالِ الضرورةِ وخوفِ فواتِ الركعةِ. فكانَ لابدَّ لهٗ مِن قومةٍ فِي حالِ الضرورةِ وغيرِ حالِ الضرورةِ. فهٰذه صفاتُ الفرائضِ التىْ لَابدَّمِنها فِي الصلوةِ ولَا تجزئُ الصلٰوةَ اِلا باصابتِهَا.

فَلَمَّا كَانَتِ الْقِرَاءَةُ مُخَالِفَةً لِذٰلِكَ وَسَاقِطَةً فِى حَالِ الضَّرُوْرَةِ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ ذٰلِكَ فَكَانَتْ فِى النَّظَرِ اَيْضًا سَاقِطَةً فِى غَيْرِ حَالَةِ الضَّرُوْرَةِ فَهٰذَا هُوَ النَّظَرُ فِى هٰذَا وَهُوَ قَوْلُ اَبِى حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

ইমাম তাহাভী র. বলেন, এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, ইমাম রুকু অবস্থায় থাকলে এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি তাকবীরে তাহরীমা বলে ইমামের সাথে শরীক হলে বিলকুল কিরাআত আদায় না করলেও তার রাক'আত সহীহ সাব্যস্ত করা হয়। কিরাআত ছাড়া রাক'আত সহীহ হওয়ার ব্যাপারে দু'টি সম্ভাবনা আছে– ১. রাক'আত ছুটে যাওয়ার আশংকা ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে তার রাক'আত সহীহ সাব্যস্ত করা হয়। ২. অথবা মুকতাদির উপর কিরাআত ফরয নয় বলে রাক'আত সহীহ সাব্যস্ত করা হয়। এদিকে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, কোন ব্যক্তি রুকুতে ইমামের সাথে শরীক হলে তাকবীরে তাহরীমা অথবা কিয়াম ছেড়ে দিলে তার এই রাক'আত বরং পূর্ণ নামাযই সহীহ হয় না। অতএব, রাক'আত ছুটে যাওয়ার আশংকা ও প্রয়োজনবশতঃ এই ফরয তাকবীরে তাহরীমা ও কিয়াম বাদ পড়ে না। ফরযের শান এটাই। অর্থাৎ, প্রয়োজনের কারণে বাদ পড়ে না, বরং সর্বাবস্থায় তা আদায় করা আবশ্যক হয়। পক্ষান্তরে, কিরাআতের অবস্থা এরূপ নয়। কারণ, পূর্বে দেখেছেন যে, প্রয়োজনবশতঃ এটি বাদ পড়ে যায়। এতে প্রমাণিত হল, মুকতাদির ক্ষেত্রে এই কিরাআত ফরয ও জরুরি নয়। অন্যথায় প্রয়োজনের সময় এটি বাদ পড়ত না। যেমন– সমস্ত ফরযের মধ্যে হয়ে থাকে।

স্মর্তব্যঃ ইমাম তাহাভী র. এর এই যুক্তি সেসব মনীষীর বিরুদ্ধে যারা ইমামের পিছনে কিরাআতকে ফরয সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, তাঁর আলোচনা শুধু তাদের ব্যাপারেই।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আওজাযুল মাসালিক ঃ ১/২৩৯, আমানিল আহবার ঃ ১/১২০-১২১, মাআরিফুস সুনান ঃ ২/৩৮৪,বযলুল মাজহুদ ঃ ২/৫২, ফাতহুল মুলহিম ঃ ২/২০, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ১/৫৯৩-৬০৬।

## باب الخفض فى الصلٰوة هل فيه تكبير

## অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে নিচে ঝুকার সময় তাকবীর আছে কিনা?

### মাযহাবের বিবরণ ঃ

নামাযের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমা বলা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে কারও কোন মতবিরোধ নেই। কিন্তু এছাড়া অন্যান্য স্থানান্তরের রোকনে তাকবীর বিধিবদ্ধ কিনা এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। এক রোকন থেকে অপর রোকনের দিকে যাবার দু'টি সুরত রয়েছে– ১. নিচের দিক থেকে উপর দিকে উঠা। ২. উপর থেকে নিচের দিকে ঝুকা। নিচের থেকে উপর দিকে উঠার সময় তাকবীর বিধিবদ্ধ। এতে কারও মতবিরোধ নেই। উপর থেকে নিচে ঝুকার সময় এর বিধিবদ্ধতা সম্পর্কে মতবিরোধ আছে।

১. খুলাফায়ে বনু উমাইয়্যা যেমন– হযরত মুআবিয়া রা., যিয়াদ, উমর ইবনে আবদুল আযীয র. প্রমুখ এবং মুহাম্মদ ইবনে সীরীন, কাসিম ইবনে মুহাম্মদ, সালিম ইবনে আবদুল্লাহ, সাঈদ ইবনে জুবাইর ও কাতাদা র. প্রমুখের মতে, নিচ থেকে উপরে উঠার সময় তাকবীর বিধিবদ্ধ। উপর থেকে নিচে নামার সময় বিধিবদ্ধ নয়। فذهب قوم الى هذا الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম চতুষ্ঠয় বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের মতে, নিচে নামা ও উপরে উঠা উভয় সুরতে তাকবীর বিধিবদ্ধ ও সুন্নত। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অবশ্য ইমাম আহমদ র. এর এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী এই তাকবীর সুন্নত নয় বরং ওয়াজিব।

ثُمَّ النظرُ يَشهدُ لهٗ ايضًا، وذالكَ انا رأينا الدخولَ فِى الصلٰوةِ يكونُ بالتكبيرِ، ثم الخروجَ مِن الركوع والسجودِ يكونانِ ايضًا بتكبيرٍ، وكذالكَ القيامُ من القعودِ يكونُ ايضا بتكبيرٍ، فكانَ ما ذكرنَا مِن تغيرِ الاحوالِ من حالٍ الى حالٍ قد اَجمعَ اَن فِيه تكبيرًا فكانَ النظرُ على ذالكَ ان يكونَ تغيرُ الاحوالِ اَيضا مِنَ القيامِ اِلى الركوعِ والٰى السجودِ فِيه ايضًا بتكبيرٍ قِياسًا علٰى مَا ذكرنَا مِن ذالكَ وهٰذا قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمهمُ اللهُ تعالٰى-

### যৌক্তিক প্রমাণ ঃ

ইমাম তাহাভী র. বলতে চান যে, নামাযে প্রবেশের সময় এরূপভাবে স্থানান্তর কালীন রোকনগুলোতে উপরে উঠার সময় সর্বসম্মতিক্রমে তাকবীর বিধিবদ্ধ। নামাযে প্রবেশ এবং নিচ থেকে উপরে উঠা এটি এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থার দিকে স্থানান্তর। এতে বুঝা গেল, এক অবস্থা থেকে অপর অবস্থার দিকে স্থানান্তর এই তাকবীরের কারণ। এই কারণ যেরূপভাবে নিচ থেকে উপরে উঠার সময় বিদ্যমান, এরূপভাবে উপর থেকে নিচে নামার সময়ও বিদ্যমান। অতএব, উপরে উঠার সময়ের ন্যায় নিচে নামার সময়ও এই তাকবীর বিধিবদ্ধ হবে। উপরে উঠার সময় এটাকে বিধিবদ্ধ মেনে নিচে নামার সময় তা অস্বীকার করা অযৌক্তিক।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আমানিল আহবার ঃ ৩/১৬৫, নায়লুল আওতার ঃ ২/১৩৩, বযলুল মাজহুদ ঃ ২/৬১, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ ১/১২১, আওজাযুল মাসালিক ঃ ১/২১৩, ফাতহুল মুলহিম ঃ ২/১৮, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ১/ ৬০৭-৬১২।

## باب التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع من الركوع هل مع ذالك رفع ام لا

## অনুচ্ছেদ ঃ রুকু, সিজদা' এবং রুকু থেকে উঠার তাকবীর এবং এ সময় হাত উঠাবে কিনা?

### মাযহাবের বিবরণ ঃ

নামাযের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমার সময় সর্বসম্মতিক্রমে হস্তদ্বয় উত্তোলন সুন্নত। শুধু শিয়াদের যায়েদিয়া ফিরকা এর প্রবক্তা নয়। সিজদায় যাবার সময় এবং তা থেকে উঠার সময় হস্ত উত্তোলন নেই, এটিও সর্বসম্মত বিষয়। অবশ্য রুকু করা এবং রুকু থেকে উঠার সময় হস্তদ্বয় উত্তোলন বিধিবদ্ধ কিনা– এটি বিতর্কিত বিষয়।

১. খোলাফায়ে রাশেদীন আশারায়ে মুবাশশারা হযরত ইবনে মাসউদ, আবু হোরায়রা রা. ইমাম আবু হানীফা ও মালিক র. এর মতে, রুকুতে যাওয়া ও তা থেকে উঠার সময় হস্তদ্বয় উত্তোলন জায়েয বা বিধিবদ্ধ নয়। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবূ হোরায়রা, ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর র. ইমাম শাফিঈ, আহমদ, সালিম, মাকহুল, কাতাদাহ,

সাইদ ইবনে যুবাইর, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনা র.-এর মতে, উক্ত দুটি স্থানে হস্তদ্বয় উত্তোলন আবশ্যক। তাকবীরে তাহরীমা, রুকুতে যাওয়া ও তা থেকে উঠা– এ তিনটি স্থান ছাড়া নামাযের অন্য কোথাও শাফিঈ র. এর মতে, হস্তদ্বয় উত্তোলন নেই। তাঁর গ্রন্থ কিতাবুল উম্মের ইবারত এর প্রমাণ। কিন্তু শাফিঈদের মতে, উপরোক্ত তিন জায়গা ছাড়াও আর একটি জায়গাতে হস্তদ্বয় উত্তোলন মুস্তাহাব। সেটি হল– প্রথম বৈঠক থেকে তৃতীয় রাক'আতে উঠার সময়।

মুহাদ্দিসীনে কিরামের মধ্যে ইমাম আওযাঈ, ইমাম হুমাইদী ও ইবনে খুযাইমা র. হস্তদ্বয় উত্তোলনকে ওয়াজিব বলেন। কোন কোন আহলে জাহিরের মত এটাই। এ প্রসঙ্গে ইমাম তাহাভী র. হস্ত উত্তোলনকে যারা ওয়াজিব বলেন, তাদেরকেই বাহ্যত প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত করেছেন। فذهب قوم الى هذه الاثار فاوجبوا الرفع الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

وامَّا وجهُ هٰذا الباب مِن طريقِ النظرِ فَانهمْ قَد اجمعُوا اَن التكبيرةَ الاولٰى مَعها رفعٌ وانَّ التكبيرةَ بينَ السجدتينِ لَارفعَ معهَا واختلفُوا فِى تكبيرةِ النهوضِ وتكبيرةِ الركوعِ، فقالَ قومٌ حكمُهما حكمُ تكبيرةِ الافتتاحِ وفيهمَا الرفعُ كمَا فِيهَا الرفعُ ـ

وقَال اخرونَ حكمُهما حكمُ التكبيرةِ بينَ السجدتينِ ولا رفعَ فيهمَا كمَا لارفعَ فيهَا وقد رأينَا تكبيرةَ إلافتتاحِ مِن صلبِ الصلٰوةِ لاَ تُجزى الصلٰوةُ اِلا باصابتِهَا ورأينَا التكبيرةَ بينَ السجدتينِ ليستْ كذالكَ لِانه لَوتركَها تاركٌ لم تفسدْ عليهِ صلاتُه ورأينَا تكبيرةَ الركوعِ وتكبيرةَ النهوضِ ليستَا مِن صلبِ الصلٰوةِ لانه لوتركَهما تاركٌ لم تفسُدْ عليهِ صلاتُه وهُمَا مِن سُنَنِها، فلمَّا كانتَا مِن سننِ الصلٰوةِ كمَا اَنَّ التكبيرةَ بينَ السجدتينِ مِن سُننِ الصلٰوةِ كانتَا كهِىَ فِى اَن لارفعَ فِيهمَا كمَا لاَ رفعَ فيهَا، فهٰذا هوَ النظرُ فِى هٰذا البابِ وهوَ قولُ ابىْ حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمَهم اللهُ تعالٰى ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

যুক্তি হল, এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, তাকবীরে তাহরীমার সময় হস্তদ্বয় উত্তোলন বিধিবদ্ধ। দুই সিজদার মাঝে তাকবীরে হস্তদ্বয় উত্তোলন বিধিবদ্ধ নয়। মতবিরোধ হল শুধু রুকুর তাকবীর এবং তৃতীয় রাক'আতের দিকে উঠার সময় তাকবীর নিয়ে। কেউ কেউ এগুলোতে হস্ত উত্তোলনের মত পোষণ করেন আর কেউ কেউ তা অস্বীকার করেন। আমরা দেখছি–

১. তাকবীরে তাহরীমা নামাযের একটি ফরয। এছাড়া, নামায সহীহ হয় না।

২. দুই সিজদার মাঝে তাকবীর একটি সুন্নত। এটি নামাযের কোন আবশ্যকীয় বিষয় নয়। এটি বর্জন করলে নামায ফাসিদ হয় না।

৩. রুকুর তাকবীর এবং তৃতীয় রাক'আতে উঠার তাকবীর নামাযে ফরয নয় বরং সুন্নত। এটা বাদ দিলে নামায ফাসিদ হয় না। অতএব, যুক্তির দাবি হল রুকুর তাকবীর এবং তৃতীয় রাক'আতে উঠার তাকবীরের হুকুম হস্ত উত্তোলনের ব্যাপারে দুই সিজদাহর মধ্যকার তাকবীরের মত হওয়া। কারণ, এগুলোর মাঝে একটি কারণ যৌথ রয়েছে– সেটি হল এসব তাকবীর সুন্নত। এগুলোর হুকুম তাকবীরে তাহরীমার মত নয়। কারণ, সেখানে যৌথ কারণটি বিদ্যমান নেই। তাকবীরে তাহরীমা তো ফরয। রুকুর তাকবীর ও তৃতীয় রাক'আতে উঠার সময়কার তাকবীর সুন্নত। অতএব, তাকবীরে তাহরীমার মত রুকুর তাকবীর ও তৃতীয় রাক'আতে উঠার তাকবীরেও হস্তদ্বয় উত্তোলন বিধিবদ্ধ– একথা বলা সহীহ হয় কিভাবে? বরং বলতে হবে, এগুলোতে হস্তদ্বয় উত্তোলন বিধিবদ্ধ নয়। যেমন বিধিবদ্ধ নয় দুই সিজদার মধ্যবর্তী তাকবীরে। যুক্তির দাবি এটাই।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নববী ঃ ১/১৬৮, ফাতহুল মুলহিম ঃ ২/১১, আওজাযুল মাসালিক ঃ ১/২০৩, বযলুল মাজহুদ ঃ ২/২, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ ১/১৩৩, নায়লুল আওতার ঃ ২/৬৯, মাআরিফুস সুনান ঃ ২/৪৫৩, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ১/৬১৩-৬৩১।

## باب التطبيق فى الركوع

## অনুচ্ছেদ ঃ রুকুতে হস্তদ্বয়ের আঙ্গুল মিলিয়ে হাটুদ্বয়ের মধ্যখানে রাখা

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

তাতবীক বলে রুকুতে উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে সেগুলোকে হাঁটুদ্বয়ের মাঝখানে রাখা। এটা মাসনুন কিনা– এ ব্যাপারে প্রথমদিকে মতানৈক্য ছিল।

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ রা., আলকামা, ইবরাহীম নাখঈ, আবু উবায়দা প্রমুখের মত ছিল- এই তাতবীক মাসনুন। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. বিভিন্ন হাদীসের আলোকে এটি রহিত হয়েছে বলে প্রমাণিত। তাই ইমাম চতুষ্ঠয় বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিস এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, তাতবীক মাসনুন নয়, বরং উভয় হাতের আঙ্গুলগুলোকে কিছুটা ফাঁকা করে হাটুর উপরে রাখা যেন সে হাটু ধারণ করে আছে- এটা মাসনুন। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ثُمَّ التمسنَا حكمَ ذالكَ مِن طريقِ النظرِ كيفَ هوَ فرأينَا التطبيقَ فيهِ التقاءَ اليدينِ ورأينَا وضعَ اليدينِ على الركبتينِ فِيه تفريقَهما فاردنَا انَ ننظرَ فِى حكمِ اشكالِ ذلكَ فى الصلٰوةِ كيفَ هُوَ؟ فرأينَا السنةَ جاءتْ عنِ النبيِّ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالتجافِىْ فِى الركوعِ والسجودِ واَجمعَ اِلمسلمونَ علٰى ذالكَ فكانَ ذالكَ مِن تفريقِ الاعضاءِ وَكانَ مَن قامَ فِى الصلٰوةِ امرَ اَن يُراوحَ بينَ قدميهِ وقدرُوى ذالكَ عنِ ابنِ مسعودٍ رض وهُو الذىْ روٰى التطبيقَ،فلمَّا رأينَا تفريقَ الاعضاءِ فِى هٰذا بعضِها مِن بعضٍ اولٰى مِن الصاقِ بعضِها بِبعضٍ واخْتلفُوا فِى الصاقِها وتفريقِها فِى الركوعِ كانَ النظرُ علٰى ذالكَ اَن يكونَ مَا اختلفُوا فِيه مِنْ ذالكَ معطوفاً علٰى مَا اَجمعُوا عليهِ مِنه فيكونُ كمَا كانَ التفريقُ فِيمَا ذكرنَا افضلَ يكونُ فِى سائرِ الاعضاءِ كذالكَ .

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

ইমাম তাহাভী র.-এর যুক্তির সারনির্যাস হল, তাতবীকে উভয় হাত মিলিয়ে হাটুর উপর রাখলে হস্তদ্বয়কে দূরে দূরে রাখতে হয়। নামাযের কাজকর্মগুলোর ধরন সম্পর্কে চিন্তাফিকির করলে দেখা যায়, এগুলোতে অঙ্গগুলোকে কিভাবে রাখতে হয়। মিলিয়ে না পৃথক করে? আমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর পদ্ধতি দেখেছি, তিনি রুকু সিজদায় অঙ্গগুলোকে পৃথক করে ও

দূরে রাখতেন। এরূপভাবে অঙ্গগুলোকে প্রশস্ত ও দূরে রাখার ব্যাপারে সবাই একমত। তাছাড়া তাতবীকের বিবরণদাতা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, মুসল্লীদের হুকুম দেয়া হয়েছে তারা যেন পদদ্বয়কে একটু দূরে রেখে সামান্য সময় এক এক কদমের উপর ভর করে আরাম লাভ করে। অতএব, যেহেতু নামাযের অন্যান্য কাজে সর্বসম্মতিক্রম মিলিয়ে রাখা হয় না বরং পৃথক রাখা হয়, আর রুকু সম্পর্কে মতবিরোধ হয়ে গেছে যে, এতে মিলিয়ে রাখবে না পৃথক করে রাখবে? যুক্তির দাবি হল বিতর্কিত মাসআলাকে সর্বসম্মত মাসআলার উপর প্রয়োগ করা। নামাযের অন্যান্য কাজে যেমন পৃথক করে রাখা সুন্নত সাব্যস্ত করা হয়েছে, এরূপভাবে রুকুতেও পৃথক করে রাখা মাসনুন সাব্যস্ত করা হবে, মিলিয়ে রাখা নয়। যাতে নামাযের সমস্ত কাজগুলোর হুকুম সমান সমান থাকে।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ফাতহুল মুলহিম ঃ ২/১২৬, নববী ঃ ১/২০২, আমানিল আহবার ঃ ৩/২৩২, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/৩৩-৩৮।

## باب ماينبغى ان يقال فى الركوع والسجود ۔

## অনুচ্ছেদ ঃ রুকু সিজদায় কি বলা সমীচীন

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

রুকু সিজদায় যিকিরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সবাই একমত। কিন্তু কোন খাস যিকির (বিশেষ তাসবীহ) নির্ধারিত আছে কিনা এ বিষয়ে মতবিরোধ আছে–

১. ইমাম শাফিঈ ও আহমদ, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ ও দাউদ জাহিরী র. এর মতে, রুকুতে মুসল্লীর জন্য سبحان ربى العظيم এবং সিজদায় سبحان ربى الاعلى বলা সুন্নত। এর সাথে সাথে ইমাম ছাড়া অন্য কারও اللهم لك ركعت ولك سجدت দোয়া মিলানো,তাছাড়া যে ইমামের মুকতাদীদের রুকু-সিজদা দীর্ঘ হওয়ার কারণে কষ্ট হবে না তার জন্য মুস্তাহাব, মুনফারিদের জন্য সব দোয়া বরাবর। হাদীসে যেসব দোয়া এসেছে, সেগুলো যা ইচ্ছা পড়তে পারে নামায চাই ফরয হোক বা নফল। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, হাসান বসরী র. এর মতে, রুকুতে سبحان ربى العظيم সিজদাতে سبحان ربى على বলা ফরয

আদায়কারীর জন্য সুন্নত। চাই সে ইমাম হোক বা মুনফারিদ। নফল নামাযের বিষয়টি সুপ্রশস্ত ও উদার। নফল নামাযে যে কোন বর্ণিত দোয়া ইচ্ছামত পড়তে পারে। এটি ইমাম আহমদ র. এর একটি রেওয়ায়াত। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. ইমাম মালিক ও ইবনে মুবারক র. এর মতে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত রুকুর তাসবীহগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি তাসবীহ রুকুতে পড়া মুসতাহাব। তাতে দোয়া মিলানো মাকরূহ। কিন্তু সিজদার মধ্যে তাসবীহ ও দোয়া মুসতাহাব। وقال اخرون اما الركوع فلايزاد فيه علي تعظيم الرب عزوجل الخ দ্বারা তাঁদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وامَّا وجهُ ذٰلك مِن طريقِ النظرِ فانَّا قدْ رأينا مواضعَ فِى الصلوٰةِ فيها ذكرٌ، فمن ذٰلكَ التكبيرُ لِلدخولِ فِى الصلوٰةِ ومِن ذالكَ التكبيرُ لِلركوعِ والسجودِ والقيامِ من القعودِ، فكانَ ذالكَ التكبيرُ تكبيرًا قَدَ وقفَ العبادُ عليهِ وعلمَه ولم يجعلْ لهم اَن يجاوزُوه الىٰ غيرِه ومِن ذالكَ مَايتشهدونَ بِه فِى القعودِ وَقدْ علمُوه ووَقفُوا عَليهِ ولم يجعلْ لهُم ان يأتُوا مكانَه بذكرِ غيرِه ،لانَّ رجلاً لَوقالَ مكانَ قولِه اللّٰه اكبرْ اللهُ اعظمْ او اللهُ اجلّ كانَ فِى ذالكَ مسيئًاَ ولَو تَشهَّدَ رجلٌ بلفظٍ يخالفُ لفظَ التشهدِ الذىْ جاءتْ به الأثارُ عَنَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم واصحابِه كانَ فِى ذالكَ مسيئاً وكانَ بعدَ فراغِه مِن التشهدِ الاخيرِ قَد ابيحَ لهُ مِن الدعاءِ مَا احبَّ فقِيلَ لهَ فِيما روىٰ ابنُ مسعودٍ رض عَنِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم ثُم ليخترْ مِن الدعاءِ مَا احبَّ، فكانَ قَدوقفَ فى كلِّ ذِكرٍ على ذكرٍ بعينِهِ ولم يجعلْ لهُ مجاوزتَه اِلى ما احبَّ اِلا ماقَد وَقفَ عليه مِن ذالكَ وانِ استوىٰ ذالكَ فِى المعنىٰ - فلمَّا كانَ فى الركوعِ والسجودِ قَد اجمعَ علىٰ اَنَّ فيهمَا ذكرًا وَلم يجمعْ علىٰ انه ابِيحَ له فيهمَا كلُّ الذكرِ كانَ النظرُ على ذالكَ اَن

يكونَ ذالكَ الذكرُ كسائرِ الذكرِ فِى صلٰوته مِن تكبيره وتشهده وقوله سمعَ اللهُ لمن حمدَه وقولِ المامومِ ربَّنا ولكَ الحمدُ، فيكونَ ذالكَ قولاً خاصًّا لاينبغىْ لِاحدٍ مجاوزتُه الى غيره كمَا لاينبغىْ لَه فِى سائرِ الذكرِ الذىْ فِى الصلٰوة ولَايكونُ له مجاوزةُ ذالكَ اِلى غيره اِلا بتَوقيفٍ مِن الرسولِ صلى اللهُ عليه وسلَّم لهٗ على ذالكَ فثبتَ بذالكَ قولُ الذينَ وقتُوا فِى ذالكَ ذكرًا خاصًّا وهمُ الذينَ ذَهبُوا الِى حديثِ عقبةَ عُلىٰ مَافصلَ فيه مِنِ القولِ فِى الركوعِ والسجودِ وهٰذا قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمَهم اللهُ تعالىٰ ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

ইমাম তাহাভী র. এর মতে যুক্তির সারনির্যাস হল, নামাযের অনেক স্থানে আল্লাহ্র যিকির হয়। যেমন– নামায আরম্ভ করার সময় এরূপভাবে রোকনগুলোতে স্থানান্তরের সময় আল্লাহু আকবার বলা, বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া, রুকু থেকে দাঁড়ানোর সময় ইমামের سمع الله لمن حمده ও মুকতাদীর ربنا لك الحمد বলা ইত্যাদি। এসব স্থানে বিশেষ যিকির নির্দিষ্ট আছে। গোটা উম্মত তা জানে। এগুলো ছেড়ে অন্য কোন যিকির সেসব স্থানে অবলম্বন করা কোন অর্থগত পার্থক্য না হলেও সমীচীন নয়। যেমন– কোন ব্যক্তি যদি الله اكبر এর স্থলে الله اعظم অথবা الله اجل বলে বৈঠকে বিশেষ তাশাহহুদ ছেড়ে অন্য কোন তাশাহহুদ পড়ে, তবে এটাকে খারাপ মনে করা হয়। শেষ বৈঠকের তাশাহহুদ থেকে অবসর হওয়ার পর মুসল্লীকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে, যা ইচ্ছা দোয়া করতে পারে, তবে শর্ত হল সেই দোয়া যেন আল্লাহ্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়। অথবা, কুরআনে কারীমের অনুকুল হয়। যেমন– হযরত ইবনে মাসঊদ রা. থেকে বর্ণিত আছে– ثم ليختر من الدعاء ما هو احب । এতে বুঝা গেল, নামাযের মধ্যে যেসব স্থানে আল্লাহ্র যিকির হয় সেগুলোতে বিশেষ বিশেষ যিকির নির্ধারিত। যেগুলো অতিক্রম করে যাওয়া সঙ্গত ও সমীচীন নয়। আর যদি স্বয়ং শরীয়ত প্রবর্তকের পক্ষ থেকে এখতিয়ার দেয়া প্রমাণিত হয় তবে সেটা আলাদা বিষয়। যেমন– সর্বশেষ তাশাহহুদের পর এখতিয়ার রয়েছে। এদিকে রুকু-সিজদার

মধ্যে যিকির থাকার বিষয়টি সর্বসম্মত। অতএব, অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও কোন খাস যিকির নির্ধারিত হওয়া উচিত। এগুলোকে পাশ কেটে যাওয়া অসমীচীন। যুক্তির দাবি এটাই।

—বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য মাআরিফুস সুনান ঃ ৩/৬, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ ১/১২৮, আমানিল আহবার ঃ ৩/২৭১-৭৬, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/৪২-৫০।

## باب الامام يقول سمع الله لمن حمده هل ينبغى له ان يقول بعد ها ربنا ولك الحمد ام لا ؟ ـ

## অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের سمع الله لمن حمده বলার পর তার জন্য কি ربنا ولك الحمد বলা উচিত?

মাযহাবের বিবরণ ঃ

১. ইমাম আবু হানীফা ও মালিক র. এর মতে এবং ইমাম আহমদ র. এর এক রেওয়ায়াত, লাইছ ইবনে সাদ আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব, সুফিয়ান সাওরী ও আওযাঈ র.-এর মত অনুযায়ী ইমাম শুধু سمع الله لمن حمده বলবে আর মুকতাদী শুধু ربنا لك الحمد গ্রন্থকার فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম শাফিঈ, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, ইবনে সীরীন, আমির শাবী ও তাহাভী র. এর মতে এবং ইমাম আহমদ র. এর প্রসিদ্ধ রেওয়ায়াত অনুযায়ী ইমাম سمع الله لمن حمده এবং ربنا لك الحمد উভয়টিই বলবেন। سمع الله لمن حمده জোরে, আর ربنا لك الحمد আস্তে। ইমাম আবু হানীফা র. থেকে এটি একটি রেওয়ায়াত। ইমাম তাহাভী র. এটি অবলম্বন করেছেন। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

স্মর্তব্য, মুনফারিদ সম্পর্কে ঐকমত্য রয়েছে যে, সে سمع الله لمن حمده এবং ربنا لك الحمد উভয়টিই বলবে। মুকতাদী সম্পর্কে শুধু ইমাম শাফিঈ র. বলেন, সেও سمع الله لمن حمده এবং ربنا لك الحمد উভয়টিই বলবেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামের মতে, মুকতাদী শুধু ربنا لك الحمد বলবে سمع الله لمن حمده নয়।

ইমাম তাহাভী র. এ প্রসঙ্গে যৌক্তিক প্রমাণ দ্বারা ইমামের سمع الله لمن حمده ও ربنا لك الحمد উভয়টি বলা সাব্যস্ত করেছেন।

وامَّا مِن طريقِ النظرِ فإنهم قَد اَجمعُوا فيمنْ يُصلِّي وحدَه علىٰ انه يقولُ ذٰلكَ، فاردنَا اَن ننظرَ فِي الامامِ هَل حكمُه فِي ذٰلكَ حكمُ مَن يُصلِي وحدَه ام لا؟ فوجدْنا الامامَ يفعلُ فِي كلِّ صلوتِه مِن التكبيرِ والقراءةِ والقيامِ والقعودِ والتشهدِ مثلَ مَا يفعلُه مَن يُصلِّي وحدَه ووجدْنَا احكامَه فِيما يَطرأُ عليهِ فِي صلاتِه كَاحكامِ مَن يُصلِّي وحدَه فِيمَا يطرأُ عليهِ مِن صلاتِه مِن الاشياءِ التىْ توجبُ فسادَها وما يُوجبُ سجودَ السهوِفيها وغيرِ ذالك وكانَ الامامُ ومَن يصلِّي وحدَه فِي ذالكَ سواءً بخلافِ المأمومِ ـ

فلمَّا ثبتَ باتفاقِهم اَن المصليَ وحدَه يقولُ بعدَ قولِه سمعَ اللهُ لِمن حمدَه، ربَّنا ولكَ الحمدُ ثبتَ اَن الامامَ ايضًا يقولُها بعد قوله سمعَ اللهُ لِمن حمدَه، فهٰذا وجهُ النظرِ ايضًا فِي هٰذا البابِ، فبِهٰذا نأخذُ وهوَ قولُ اَبي يوسفَ ومحمدٍ رحمَهم اللهُ تعالىٰ ـ وامَّا ابو حنيفةَ فكانَ يذهبُ فِي ذالكَ اِلى القولِ الاولِ ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

তিনি বলেন, সমস্ত আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, মুনফারিদ سمع الله لمن حمده এবং ربنا لك الحمد উভয়টিই বলবে। এবার আমাদের ভেবে দেখা দরকার, ইমামের হুকুম এতে মুনফারিদের মত কিনা? আমরা তো দেখি নামাযের কাজকর্মে– তাকবীর, কিরাআত, কিয়াম, বৈঠক, তাশাহহুদ ইত্যাদিতে ইমাম মুনফারিদ উভয়ের হুকুম সমান। এরূপভাবে নামায ফাসিদ হওয়ার ব্যাপারেও উভয়েই সমান। যে সব কারণে মুনফারিদের নামায নষ্ট হয়, সেসব কারণে ইমামের নামাযও নষ্ট হয়। এরূপভাবে সিজদায়ে সাহ্‌ব (সাহু) ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রেও উভয়ই বরাবর। যেসব কারণে মুনফারিদের উপর সিজদায়ে

সাহ্ব ওয়াজিব হয়, সেসব কারণেই ইমামের উপরও সিজদায়ে সাহ্বও ওয়াজিব হয়। এর পরিপন্থী মুকতাদী। কারণ, মুকতাদী ও ইমামের নামাযের আহকাম সমান নয়। অতএব, যেহেতু মুনফারিদের জন্য سمع الله لمن حمده এবং ربنا لك الحمد উভয়টি প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে তাদের সবারই ঐকমত্য রয়েছে। সেহেতু তাদের মানতে হবে যে, سمع الله لمن حمده ও ربنا لك الحمد উভয়টি ইমামের জন্যও প্রমাণিত, যাতে অন্যান্য সমস্ত বিধানের ন্যায় এই হুকুমেও ইমাম মুনফারিদ উভয়েই সমান থাকে।

উল্লেখ্য, ইমাম তাহাভী র. এর এই যুক্তি ইমাম আবু হানীফা র. এর বিরুদ্ধে প্রমাণ হতে পারে না। এর কারণ একাধিক–

১. এই নজরের ভিত্তি হল একথার উপর যে, মুনফারিদের জন্য سمع الله لمن حمده এবং ربنا لك الحمد বলার হুকুম রয়েছে। অতএব, ইমামের জন্যও এই হুকুমই হওয়া উচিত। অথচ মুনফারিদ সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা র. থেকে তিনটি রেওয়ায়াত রয়েছে–

১. سمع الله لمن حمده এবং ربنا لك الحمد উভয়টি পড়বে।

২. শুধু سمع الله لمن حمده পড়বে।

৩. শুধু ربنا لك الحمد পড়বে।

অতএব, মুনফারিদের উপর কিয়াস করে ইমামের জন্য سمع الله لمن حمده এবং ربنا لك الحمد উভয়টির হুকুম সাব্যস্ত করা মজবুত হতে পারে না। অবশ্য প্রসিদ্ধ রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে প্রমাণ দুরুস্ত হতে পারে।

২. মুকতাদী ও ইমাম উভয়ের নামায একসাথে হয়ে থাকে। যাতে এই সম্ভাবনা শক্তিশালী ও মজবুত যে, سمع الله لمن حمده এবং ربنا لك الحمد কে এতদুভয়ের মাঝে বিভাজন হয়ে যাবে। যা প্রমাণ করছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইরশাদ– اذا قال (الامام) سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد এ কারণেই শুধু ইমাম শাফিঈ র. ছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, মুকতাদী শুধু ربنا لك الحمد বলবে। মোটকথা, ইমাম ও মুকতাদীর মাঝে سمع الله لمن حمده এবং ربنا لك الحمد এর বিভাজনের শক্তিশালী সম্ভাবনা আছে। কিন্তু মুনফারিদের ব্যাপারটি এর বিপরীত। কারণ, সে একাকী নামায পড়ে।

বিভাজনের সম্ভাবনাই নেই। কাজেই উপরোক্ত মাসআলায় ইমামকে মুনফারিদের উপর কিয়াস করা সহীহ হতে পারে না - والله اعلم

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বযলুল মাজহুদ ঃ ২/৬৭, নায়লুল আওতার ঃ ২/১৪৩, মাআরিফুস সুনান ঃ ৩/২৪, আমানিল আহবার ঃ ৩/২৮৮-২৮৯, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/৫১-৫৫।

## باب القنوت فى صلوة الفجر وغيرها

## অনুচ্ছেদ ঃ ফজর নামায ইত্যাদিতে কুনুত পড়া

কুনুতের অর্থ ও এর বিভিন্ন প্রকার ঃ কুনুত শব্দটির অনেক অর্থ আছে। কেউ কেউ এর দশের অধিক অর্থ বর্ণনা করেছেন। এখানে কুনুত দ্বারা বিশেষ যিকির ও দোয়া উদ্দেশ্য। কুনুত দুই প্রকার–

**১. কুনুতে বিতর, ২. কুনুতে নাযিলা**

কুনুতে বিতরে তিনটি মাসআলা রয়েছে বিতর্কিত।

**প্রথম মাসআলা ঃ**

**বিতর নামাযে কুনুত পড়া বিধিবদ্ধ কিনা।** যদি বিধিবদ্ধ হয়, তবে সারা বছর নাকি শুধু রমযানে? এতে বিভিন্ন মত রয়েছে–

১. হানাফী ও হাম্বলীদের মতে, সারা বছর বিতরে কুনুত পড়া বিধিবদ্ধ।

২. ইমাম মালিক র. এর প্রসিদ্ধ রেওয়ায়াত অনুযায়ী শুধু রমযানে বিধিবদ্ধ।

৩. ইমাম শাফিঈ র. এর মতে, শুধু রমযানের শেষার্ধে এই কুনুত বিধিবদ্ধ।

**দ্বিতীয় মাসআলা ঃ**

**কুনুত কি রুকুর আগে হবে না পরে?**

১. ইমাম শাফিঈ ও আহমদ র. এর মতে বিতরের কুনুত হবে রুকুর পরে।

২. ইমাম আবু হানীফা ও মালিক র. এর মতে, বিতরের কুনুত হবে রুকুর পূর্বেই।

**তৃতীয় মাসআলা ঃ**

**তৃতীয় মাসআলা হল, কুনুতের শব্দরাজি কি?**

১. শাফিঈদের মতে, কুনুতে নাযিলার দোয়াই অর্থাৎ, اللهم اهدنى فيمن هديت الخ কুনুতে বিতরে পড়া উত্তম। হাম্বলীদের মাযহাবেও তাই। তবে তাঁরা এর সাথে আউযুবিল্লাহও যুক্ত করেন।

২. হানাফীদের মতে, সূরায়ে হাফদ ও খুলা অর্থাৎ اللهم انا نستعينك ونستغفرك الخ - কুনুতে বিতরে পড়া উত্তম।

৩. ইমাম মালিক র. এর পছন্দনীয় মাযহাব হল– উপরোক্ত দুটি দোয়াই পড়বে। তার থেকে আরেকটি রেওয়ায়াত হল, সূরায়ে হাফদ ও খুলাই পড়বে।

এ পর্যন্ত ছিল কুনুতে বিতরের আলোচনা। এবার তাহাভী শরীফের আলোচ্য অনুচ্ছেদের সাথে সংশ্লিষ্ট কুনুতে নাযিলার আলোচনা দেখুন।

**কুনুতে নাযিলা সম্পর্কে আলোচনা ঃ**

যদি মুসলমানদের উপর কোন ব্যাপক মুসিবত অবতীর্ণ হয়, তখন সর্বসম্মতিক্রমে ফজর নামাযে কুনুতে নাযিলা পড়া হয়। অবশ্য এই কুনুত রুকুর আগে হবে না পরে? এ বিষয়ে হানাফীদের কিতাবগুলোতে বিভিন্ন রকমের রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। তন্মধ্যে রুকুর পরে হওয়ার রেওয়ায়াতই প্রসিদ্ধ। রুকুর পরে হওয়াই ইমাম শাফিঈ, মালিক ও আহমদ র. এর মাযহাব। যদিও ইমাম শাফিঈ, মালিক র. থেকে রুকুর আগে ও পরে ইখতিয়ারও বর্ণিত আছে।

মোটকথা, ব্যাপক মুসিবত আপতিত হলে ফজর নামায়ে কুনুতে নাযিলার বিধিবদ্ধতা সর্বসম্মত। এতে কারও কোন ইখতিলাফ নেই। অবশ্য ফজর ছাড়া অন্যান্য নামায সম্পর্কে মতানৈক্য আছে।

১. শুধু ইমাম শাফিঈ র. এর মতে, ব্যাপক মুসিবত নাযিল হলে প্রতিটি নামাযে কুনুতে নাযিলা পড়বে। যদি ব্যাপক মুসিবত না হয়, তবেও শাফিঈ ও মালিকীদের মতে, ফজর নামাযে কুনুত বিধিবদ্ধ। শাফিঈদের মতে, রুকুর পর, মালিকীদের মতে, রুকুর পূর্বে।

কিন্তু হানাফী ও হাম্বলীদের মতে, ব্যাপক মুসিবত না হলে, ফজর নামাযে কুনুত সম্পূর্ণ বিধিবদ্ধ নয়। ইমাম তাহাভী র. باب القنوت فى صلوة الفجر وغيرها অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন। অর্থাৎ, ফজর নামায ও অন্যান্য নামাযে কুনুত বিধিবদ্ধ কিনা? উপরের এই আলাচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ফজর নামাযে কুনুতে নাযিলা পড়ার ব্যাপারে সবার ঐকমত্য রয়েছে। ফজর ছাড়া অন্যান্য নামাযেও কুনুতে নাযিলা পড়া শুধু ইমাম শাফিঈ র. এর বক্তব্য ।

**ব্যাপক মুসিবত না হলে**

শাফিঈ ও মালিকীদের মতে, ফজর নামাযে কুনুত বিধিবদ্ধ। অতএব, তাঁদের মতে, সারা বছর ফজর নামাযে কুনুত হবে। চাই মুসিবত ব্যাপক হোক বা না হোক। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

এর পরিপন্থী হানাফী ও হাম্বলীগণ। ফজর নামায ছাড়া ব্যাপক মুসিবত না হলে কুনুত হবে না বলে ইমাম চতুষ্ঠয়ের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে। উপরোক্ত কথাগুলো মনে রাখলে ইনশাআল্লাহ্ এ অনুচ্ছেদটির যৌক্তিক প্রমাণ বুঝা সহজ হবে। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

فَلَمَّا اختلَفُوا فِى ذالكَ وجبَ كشفُ ذالِكَ مِن طريقِ النظرِ لِنستخرِجَ مِن المعنيينِ معنىً صحيحًا فكانَ ماروينَا عنهُم انهم قَنتُوا فِيه مِن الصلوَاتِ لذالكَ الصبحَ والمغربَ خلاَ مَا روينَا عَن ابى هريرةَ رض عنْ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ انَه كانَ يقنتُ فِى صلٰوةِ العشاءِ فانَّ ذالكَ محتملٌ ايضًا انَ يكونَ هى المغربَ ويحتملُ انَ يكونَ هى العشاءَ الاخرةَ ولم يعلمْ عَن احدٍ منهُم انه قنتَ فِى ظهرٍ لاعصرٍ فى حالِ حربٍ ولا غيرهِ، فلمَّا كانتْ هاتانِ الصلاتانِ لاقنوتَ فيهمَا فِى حالِ الحربِ وفِى حالِ عدمِ الحربِ وكانتِ الفجرُ والمغربُ والعشاءُ لاقنوتَ فيهنَّ فِى حالِ عدمِ الحربِ ثبتَ انَ لاَ قنوتَ فِيهنَّ فِى حالِ الحربِ ايضًا

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

হযরত ইমাম তাহাভী র. কুনুতে ফজর সম্পর্কে সাতজন সাহাবীর আমল পেশ করেছেন। তাদের নাম নিম্নরূপ ঃ

১. হযরত উমর ইবনে খাত্তাব, ২. আলী, ৩. ইবনে আব্বাস, ৪. ইবনে মাসঊদ, ৫. আবুদ দারদা, ৬. ইবনে উমর এবং ৭. আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত তিন সাহাবীর মতে, যুদ্ধ-বিগ্রহ অবস্থায় ফজরে কুনুত পড়া প্রমাণিত আছে। শেষোক্ত চারজন সাহাবীর মতে যুদ্ধাবস্থা হোক বা না হোক, এ কুনুতে ফজর কোন অবস্থাতেই বিধিবদ্ধ নয়। অতএব, যুদ্ধ না থাকলে কুনুতে ফজর বিধিবদ্ধ নয় বলে এই সাতজন একমত। মতবিরোধ হল শুধু যুদ্ধাবস্থায়। ইমাম তাহাভী র. বলেন, যখন সাহাবায়ে কিরামের মাঝে মতানৈক্য হয়ে গেল যে, তিনজন সাহাবী কুনুতে ফজরের পক্ষে আর চারজন বিপক্ষে। অতএব, আমাদের যুক্তির আলোকে কাজ করতে হবে। যাতে আমরা এ দুটি বিষয় থেকে বিশুদ্ধটি উৎসারণ করতে পারি।

অতএব, আমরা চিন্তা করে দেখলাম, যে সব সাহাবী থেকে যুদ্ধাবস্থায় কুনুতের রেওয়ায়াত পাওয়া যায়, সেটি হয়ত ফজর সম্পর্কে অথবা মাগরিব সম্পর্কে। অবশ্য হযরত আবু হোরায়রা রা. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই আমল বর্ণিত আছে– انه كان يقنت فى صلوة العشاء

ইশা শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়–

১. মাগরিব নামায। একে বলে ইশা উলা। ২. ইশার নামায। এটিকে বলে ইশা আখিরা। অতএব, ইশা শব্দটি মুশতারাক তথা যৌথ অর্থবোধক হওয়ার কারণে এখানে উভয় অর্থের সম্ভাবনা আছে।

মোটকথা, কোন কোন রেওয়ায়াতে ফজরে কুনুত আবার কোনটিতে মাগরিবে কুনুতের কথা এসেছে। আর এক রেওয়ায়াতে ইশার নামাযে কুনুতেরও সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম জোহর ও আসরের নামাযে কুনুত না হওয়ার ব্যাপারে একমত। চাই যুদ্ধাবস্থায় হোক বা না হোক। যেহেতু জোহর ও আসরের কোন অবস্থাতেই সাহাবায়ে কিরামের সর্বসম্মতিক্রমে কুনুত নেই, আর ফজর, মাগরিব ও ইশাতে যুদ্ধাবস্থা না থাকলে কুনুত না হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে। কাজেই জোহর ও আসরের ন্যায় অবশিষ্ট নামাযগুলোতে অর্থাৎ, ফজর, মাগরিব ও ইশাতেও যুদ্ধাবস্থা না থাকার সময়ের মত যুদ্ধাবস্থায়ও কুনুত না হওয়া যুক্তিযুক্ত।

**কুনূতে বিতর সংক্রান্ত একটি প্রশ্নোত্তর ঃ**

وَقَدْ رَأَيْنَا الْوِتْرَ فِيهَا الْقُنُوتُ عِنْدَ اكْثَرِ الْفُقَهَاءِ فِى سَائِرِ الدَّهْرِ وَعِنْدَ خَاصٍ مِنْهُمْ فِى لَيْلِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ خَاصَّةً فَكَانُوا جَمِيعًا اِنَّمَا يَقْنُتُونَ لِتِلْكَ الصَّلٰوةِ خَاصَّةً لَالِحَرْبٍ وَلَالِغَيْرِهٖ، فَلَمَّا انْتَفٰى اَنْ يَكُوْنَ الْقُنُوْتُ فِيْمَا سِوَاهَا يَجِبُ لِعِلَّةِ الصَّلٰوةِ خَاصَّةً لَالِعِلَّةٍ غَيْرِهَا انْتَفٰى اَنْ يَكُوْنَ يَجِبُ لِمَعْنًى سِوٰى ذٰلِكَ، فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا اَنَّهُ لَايَنْبَغِىْ الْقُنُوْتُ فِى الْفَجْرِ فِى حَالِ الْحَرْبِ وَلَا غَيْرِهٖ قِيَاسًا وَنَظَرًا عَلٰى مَاذَكَرْنَا مِنْ ذٰلِكَ وَهٰذَا قَوْلُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

এখান থেকে অনুচ্ছেদের শেষ পর্যন্ত একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। প্রশ্ন হয়, পূর্বোক্ত রেওয়ায়াত ও প্রমাণাদি দ্বারা কুনূতের অপ্রামাণিকতা স্পষ্ট হয়ে

গেছে। তাহলে বিতরে কুনূত কোথা থেকে আসল। এই প্রশ্নের উত্তর উপরোক্ত ইবারতে দেয়া হয়েছে। উত্তরের সারমর্ম হল কুনূত পড়ার দুটি কারণ– ১. যুদ্ধ, ২. নামায। এবার দেখতে হবে বিতরে কুনূতের কারণ কি? যদি যুদ্ধ হয় তবে তাতে মতবিরোধ হওয়ার কথা। আর যদি কারণটি যুদ্ধ না হয় বরং নামায হয় তবে সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয হওয়া উচিত। অতএব, আমরা দেখলাম বিতরে কুনূত পড়া অধিকাংশ ইসলামী আইনবিদ তথা হানাফী, হাম্বলী ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে পূর্ণ বছর বিধিবদ্ধ। আর কোন কোন ইসলামী আইনবিদ তথা শাফিঈদের মতে শুধু অর্ধ রমযানে বিধিবদ্ধ। তাছাড়া মালিকীদের মধ্য থেকে হযরত ইবনে নাফি' র.-এর মতেও অর্ধ রমযানে কুনূত বিধিবদ্ধ। অতএব, ইজমালীভাবে বিতরে কুনূত পাঠ সবার মতে বিধিবদ্ধ ও প্রমাণিত। আর বিতরের কুনূত নামাযের কারণে বিধিবদ্ধ। যুদ্ধের কারণে নয়। কারণ, উপরোক্ত কোন ইসলামী আইনবিদের মতে, কুনূত যুদ্ধ অবস্থা অথবা কোন বিশেষ অবস্থায় পড়া আর অন্য কোন অবস্থায় না পড়ার মত পোষণ করেন না। বরং সবার মতই সর্বাবস্থায় বিতরে কুনূত বিধিবদ্ধ। এর উপরই আমল অব্যাহত। বস্তুতঃ ফজরের কুনূত যাদের মতে বিধিবদ্ধ সে বিধিবদ্ধতার কারণ, যুদ্ধ। অতএব, ফজরের কুনূত অবিধিবদ্ধ হওয়ার কারণে বিতরের কুনূতে কোন প্রভাব পরতে পারে না। যুক্তির দাবি তাই। এটাই আমাদের তিন আলিমের উক্তি।

### হানাফীদের ফতওয়া ঃ

হানাফীদের ফতওয়া হল, যুদ্ধাবস্থায় ফজরের কুনূত বিধিবদ্ধ ও জায়েয, কাজেই ইমাম তাহাভী কর্তৃক ব্যাপক আকারে হানাফীদের দিকে অবিধিবদ্ধতার সম্বন্ধ প্রশ্ন সাপেক্ষ বিষয়।

**উপকারিতা ঃ** ইমাম তাহাভী র. যৌক্তিক প্রমাণ পেশ করার পর বলেছেন– فثبتَ بما ذكرنَا انه لاينبغىْ القنوتُ فى الفجرِ فى حالِ حرب ولا غيره قياسًا ونظرا علىٰ ماذكرنَا من ذالكَ ـ وهذا قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمهم اللهُ تعالى ـ যদ্দারা বুঝা যায়, ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ র. এর মতে, ব্যাপক মুবিসত হোক বা না হোক কোন অবস্থাতেই কুনুতে নাযিলা নেই। পূর্ববর্তীগণের অধিকাংশ মূলপাঠ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থেরও ইবারতও অনুরূপ। কিন্তু হানাফী ইমামগণ থেকে ব্যাপক ও কঠিন

বিপদকালে কুনুতে ফজরের উক্তিও বিদ্যমান আছে। হানাফীদের মতে, ফতওয়া হল ব্যাপক বিপদ ও কঠিন বালা মুসিবতের সময় ফজর নামাযে কুনুতে নাযিলা পড়া হবে। ইমাম তাহাভী র. থেকেও অনেকেই এ কথাটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন–

لايقنتُ فى الفجرِ عندنا من غيرِ بليةٍ فان وقعت بليةٌ فلابأسَ الخ ۔ (هكذا فى الاشباه والنظائر نقلا عن السراج الوهاج ۔ وكذا ذكر قوله فى الكبيرى شرح المنية وعنه الشامى وذكره الطحطاوى فى حاشية الدر والشرنبلالى فى مراقى الفلاح وابوالسعود فى فتح المعين والبرجندى فى شرح مختصر الوقاية والشبلى فى حاشية تبيين الحقائق)۔

কেউ কেউ ইমাম তাহাভী র. এর এ দুটি উক্তির মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, সাধারণ যুদ্ধের ফলে কুনুত পড়া হবে না। বরং কঠিন বিপদের সময় কুনুত পড়া যেতে পারে– (حيث قال فى اعلاء السنن ووفق شيخنا ......... بان القنوت فى الفجر لايشرع لمطلق الحرب عندنا وانما يشرع لبلية شديدة تبلغ بها القلوب الحناجر) ۔

বুখারী মুসলিমের যেসব রেওয়ায়াতে ইশা, মাগরিব ও জোহরে কুনুতে নাযিলা পড়ার প্রমাণ রয়েছে, সেগুলো সব রহিত। এজন্য হানাফীদের মতে, ফজরের নামায ছাড়া অন্যান্য নামাযে কুনুতে নাজেলা পড়া বিধিবদ্ধ নয়। আমাদের উচিত হানাফীদের ফতওয়ার উপর আমল করা। অর্থাৎ, ফজর ছাড়া অন্য কোন নামাযে কুনুতে নাযিলা পড়া উচিত নয়।

মোটকথা, কঠিন বিপদকালে ফজরের সময় কুনুতে নাযিলার বিধিবদ্ধতা রয়েছে। হানাফীদের মতেও এটার উপরই ফতওয়া। (–শামী ঃ ২/১১, ঈযাহ ঃ ২/৭৭)

অতএব, ইমাম তাহাভী কর্তৃক যুদ্ধাবস্থায় কুনূতে ফজরের অবিধিবদ্ধতা হানাফীদের প্রতি ব্যাপক আকারে সম্বন্ধযুক্ত করা প্রশ্ন সাপেক্ষ বিষয়।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বযলুল মাজহুদ ঃ ২/৩২৬, লামিউদ দিরারী ঃ ২/৫২, আওজাযুল মাসালিক ঃ ১/৩৯৮, ২/১২০, আমানিল আহবার ঃ ৪/১, ২০-২২। নববী ঃ ১/২৩৭, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/৫৬-৮১

## باب مايبدأبوضعه فى السجود اليدين او الركبتين ـ

## অনুচ্ছেদ ঃ সিজদাতে আগে হস্তদ্বয়রাখবে, না হাটুদ্বয়?

নামাযে সাতটি অঙ্গ দ্বারা সিজদা করা হয়– পদদ্বয়, হস্তদ্বয়, হাটুদ্বয় এবং চেহারা। তন্মধ্য থেকে পদদ্বয় তো প্রথম থেকেই যমিনের সাথে লেগে থাকে। বাকী পাঁচটি অঙ্গ থেকে চেহারা রাখতে হয় সিজদাতে সবার শেষে। এ ব্যাপারে সবাই একমত। কিন্তু উভয় হাত ও হাটুদ্বয় রাখার ব্যাপারে মতবিরোধ হয়ে গেছে যে, সিজদায় আগে হস্তদ্বয় রাখবে না হাটুদ্বয়?

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. ইমাম মালিক, হাসান বসরী র. ও আওযাঈ র. এর মতে মাসনুন পদ্ধতি হল, প্রথম হস্তদ্বয় যমিনে রাখবে, অতঃপর হাটুদ্বয়। এটাই ইমাম আহমদ র. এর একটি মত। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থাকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা ও শাফিঈ সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই র. এবং কুফাবাসীও সংখাগরিষ্ঠ কফীহের মতে সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাটুদ্বয় অতঃপর হস্তদ্বয় রাখবে। উঠার সময় এর বিপরীত। এটাই ইমাম আহমদ র. এর প্রসিদ্ধ উক্তি। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَاَمَّا وجهُ ذالكَ مِن طريقِ النظرِ فانّا قَد رأينَا الاعضاءَ التى اُمِرَ بالسجودِ عليها هِى سبعةُ اعضاءٍ بذالكَ جاءتِ الأثارُ عَن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلّم فَممَّا رُوِى عنهُ فى ذالكَ ماحدّثنا ابُو بكرةَ قَال ثنَا ابراهيمُ بنُ ابى الوزيرِ قَال ثنَا عبدُ اللهِ بنُ جعفرٍ عَن اسماعيلَ بنِ محمدٍ عَن عامرِ بنِ سعدٍ عن ابيهِ قَال قَال النبىُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ اُمِر العبدُ ان يسجدَ علىٰ سبعةِ اٰرابٍ وجهِهِ وكفَّيهِ ورُكبتيهِ وقدميهِ ايُّهالَمْ يَقَع فقدِ انتقصَ ومَا حدثنا ابنُ مرزوقٍ قالَ ثنَا ابو عامرٍ قَالَ ثنَا عبدُ اللهِ بنُ جعفرٍ عن اسماعيلَ عن عامرِ بنِ سعدٍ عن ابيهِ قَال اِذا سجدَ العبدُ سجدَ علىٰ سبعةِ اٰرابٍ ثم ذكرَ مثلَه وحدثَنا محمدُ بنُ خزيمةَ وفهدٌ قالاَ

ثَنَا عبدُ اللهِ بنُ صالح قالَ حدثنى الليثُ ح وحدَّثنا يونسُ قالَ ثنا عبدُ اللهِ ابنُ يوسفَ قَالَ ثنا الليثُ قالَ حدثنى ابنُ الهادِ عَن محمدِ بنِ ابراهيمَ بنِ الحارِثِ عَن عامِرِ بنِ سعدِ بنِ ابى وقاصٍ رض عنِ عباسِ بنِ عبدِ المطلبِ رض انه سمِعَ رسولَ الله صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ اِذا سجدَ العبدُ سجدَ مَعَه سبعةُ اَرابٍ وجهُه وكفَّاه وركبتَاه وقدمَاهُ -

ومَا حدثنا ابنُ مرزوق قَال ثنَا اَبو عامرٍ العقديُّ قالَ ثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدِ عَن يزيدَ بنِ الهادِ فذكرَ باسنادِه مثلَه ومَا حَدثنَا يونسُ قالَ ثنا سفيانُ عن عمرو عَن طاوسٍ عَنِ ابنِ عباسٍ رض امرَ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلَّم انْ يسجدَ على سبعةِ اعظمٍ

ومَا حدثَنا ابنُ ابى داوُد قَال ثنَا محمدُ بنُ المنهالِ قالَ ثنا يزيدُ بن زريع قَالَ ثنا روحُ بن القاسمِ عن عمروٍ عن عطاءٍ عنِ ابنِ عباسٍ رض عنِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم مثلَه فكانتْ هٰذه الاعضاء هِى التىْ عليهَا السجودُ-

فنظرنَا كيفَ حكمُ ما اتفقَ عليهِ منِها ليعلمَ بهٖ كيفَ حكمُ مَا اختلفُوا فِيه منِهَا فرأينَا الرجلَ اِذا سجَد يَبدأ بِوضْعِ احدِ هٰذينِ اِمَّا ركبتَاه وامَّا يَداه ثمَّ رأسُه بعدَهُما ورأينَاه اِذا رَفع بَدأ برأسِه فكانَ الرأسُ مقدمًا فِى الرفعِ مؤخَّراً فِى الوضعِ ثُمَّ ينبغىْ بعدَ رفعِ رأسِه برفعِ يديهِ ثم ركبتيهِ وهٰذا اتفاقٌ مِنهُم جمَيعًا فكانَ النظرُ علىٰ ما وصفنَا فى حكمِ الراسِ اِذا كانَ موخَّراً فِى الوضْعِ فَلمَّا كانَ مقدمًا فِى الرفعِ ان يكونَا اليدانِ كذالكَ لمَّا كانتَا مقدمتينِ علىٰ الركبتينِ فِى الرفعِ اَن تكونَا مؤخرتينِ عنهُما فِى الوضعِ فثبتَ بذالكَ ماروٰى وائلٌ، فهٰذَا هو النظرُ وبه نأخذُ وهو قولُ ابِى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمَهم اللهُ تعالىٰ -

### যৌক্তিক প্রমাণ ঃ

ইমাম তাহাভী র. এর যুক্তি হল, যেসব অঙ্গ দ্বারা সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এরূপ অঙ্গ মোট সাতটি– পদদ্বয়, হাটুদ্বয়, হস্তদ্বয় এবং চেহারা। এবার এসব অঙ্গ রাখা ও উঠানোর ক্ষেত্রে তরতীব বা ক্রমবিন্যাস কি? আমাদের দেখতে হবে, মানুষ সিজদায় যাওয়ার সময় হস্তদ্বয় ও হাটুদ্বয় রাখার পর সর্বশেষে রাখে নিজের মাথা। আর সিজদা থেকে উঠার সময় সর্ব প্রথম উঠায় মস্তক। অতএব, মাথা রাখে সর্বশেষে, উঠায় সর্বাগ্রে। এ থেকে আমরা একটি মূলনীতি পাই, সেটা হল, যে অঙ্গ রাখবে শেষে, সেটি উঠাবে আগে, আর যেটি রাখবে আগে, উঠাবে পরে। এদিকে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, সিজদা থেকে উঠার সময় হস্তদ্বয় প্রথমে উঠানো হবে, এরপর হাটুদ্বয়। কাজেই উপরোক্ত মূলনীতির আলোকে প্রমাণিত হয় যে, উভয় হাত যেহেতু আগে উঠানো হয়, তাই রাখতে হবে পরে। হাটুদ্বয় যেহেতু উঠায় শেষে, কাজেই রাখতে হবে আগে। কাজেই সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাটুদ্বয় এর পরে হস্তদ্বয় রাখাই মাসনুন পদ্ধতি হতে পারে। আমাদের দাবিও তাই।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আমানিল আহবার ঃ ৪/৬৩, মাআরিফুস সুনান ঃ ৩/২৭, আল-কাওকাবুদ দুররী ঃ ১/১৩৪, বযলুল মাজহুদ ঃ ২/৬৪, তোহফাতুল আহওয়াযী ঃ ১/২৩০,নায়লুল আওতার ঃ ২/১৪৬, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/৮৭

## باب صفة الجلوس فى الصلٰوة كيف هو

## অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে বসবে কিভাবে?

### মাযহাবের বিবরণ ঃ

নামাযে তাশাহহুদের সময় অর্থাৎ, প্রথম বৈঠক, দ্বিতীয় বৈঠক ও দুই সিজদার মধ্যখানে বৈঠকের ধরণ হবে কিরূপ? হাদীস দ্বারা এর দুইটি ধরণ প্রমাণিত হয়–

১. ইফতিরাশ অর্থাৎ, বাম পা বিছিয়ে এর উপর বসে ডান পা খাড়া করে দেয়া।

২. তাওয়াররুক (অর্থাৎ ডান পা খাড়া করে বাম পা বিছিয়ে জমিনে বসা) এর দুটি ছুরত রয়েছে। ১. ডান পা খাড়া করে বাম পা ডানদিকে বের করে নিতম্বকে জমিনের উপর রেখে বসা। ২. উভয় পা ডান দিকে বের করে নিতম্বের উপর বসা। উভয় ধরন জায়েয। এতে কারও মতবিরোধ নেই। ইখতিলাফ শুধু উত্তমতা সম্পর্কে যে, ইফতিরাশ উত্তম? না কি তাওয়াররুক?

১. ইমাম মালিক, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী, কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ও আবদুর রহমান, ইবনে কাসিম র. প্রমুখের মতে, প্রথম বৈঠক, দ্বিতীয় বৈঠক ও দুই সিজদার মাঝে বৈঠকে তাওয়াররুক উত্তম। গ্রন্থকার فذهب قوم الخ দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম শাফিঈ, আহমদ ইবনে হাম্বল (কারো কারো বিবরণ অনুযায়ী), ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ র. প্রমুখের মতে প্রথম বৈঠক এবং দুই সিজদার মাঝে বৈঠকে ইফতিরাশ উত্তম, শেষ বৈঠকে উত্তম তাওয়াররুক। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, কেউ কেউ লিখেছেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. এর মতে দুই রাক'আত বিশিষ্ট নামাযে ইফতিরাশ উত্তম। আর চার রাক'আত বিশিষ্ট নামাযে শুধু শেষ বৈঠকে তাওয়াররুক উত্তম।

৩. সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখঈ, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক র. ও হানাফীদের মতে প্রথম বৈঠক, দ্বিতীয় বৈঠক ও সিজদাদ্বয়ের মাঝে বৈঠকে ব্যাপক আকারে ইফতিরাশ উত্তম। وقد خالف فى ذالك ايضا اخرون فقالوا القعود فى الصلوة كلها سواء على مثل القعود الاول فى قول اهل المقالة الثانية الخ দ্বারা তাঁদেরকে বুঝিয়েছেন।

মোটকথা, এই তিনটি বৈঠকের ধরনে ইমাম আবু হানীফা ও মালিক এক রকম হুকুম দেন। শাফিঈ ও আহমদ র. এর মত এর পরিপন্থী। তাঁরা পরস্পরে পার্থক্য করে কোনটিতে তাওয়াররুককে আবার কোনটিতে ইফতিরাশকে উত্তম সাব্যস্ত করেন।

مَعَ ماشدَّه مِن طريقِ النظرِ وذالكَ انَّا رأينَا القُعودَ الاولَ فِى الصلٰوة وفيمَا بينَ السجدتينِ فِى كلِّ ركعةٍ هو اَنَ يفترشَ اليسرٰى فيقعدُ عليهَا ثم اختلفُوا فِى القعودِ الاخيرِ فلم يخلُ مِن احدِ وجهينِ اَن يكونَ سنةً او فريضةً فاِن كانَ سنةً فحكمهُ حكمُ القعودِ الاولِ واِن كانَ فريضةً فحكمُه حكمُ القعودِ فيمَا بينَ السجدتينِ فثبتَ بذالكَ ماروٰى وائلُ بنُ حجرٍ رض وهوَ قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمَهم اللهُ تعالٰى ۔

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

ইমাম তাহাভী র. শাফিঈ ও হাম্বলীদের বিপরীতে যুক্তি পেশ করেছেন। তাতে বলেছেন, রেওয়ায়াত দ্বারা এ মাযহাব প্রমাণিত এবং যুক্তির আলোকেও সমর্থিত। যুক্তি হল– উভয় সিজদার মাঝে এই পরিমাণ বসা যার ফলে উভয়ের মাঝে ব্যবধান হয়ে যায়– এটা সর্বসম্মতিক্রমে ফরয। বস্তুত প্রথম বৈঠক কারও মতে ফরয নয়। বরং ওয়াজিব অথবা সুন্নত। শেষ বৈঠক কারও কারও মতে ওয়াজিব। এবার আমরা লক্ষ্য করি যে, প্রথম বৈঠক ও দুই সিজদার মাঝে বৈঠকে ইফতিরাশ উত্তম হওয়ার ব্যাপারে হানাফী, শাফিঈ ও হাম্বলীদের ঐকমত্য রয়েছে। শুধু শেষ বৈঠক সম্পর্কে মতবিরোধ থেকে গেছে যে, তাতে ইফতিরাশ উত্তম না তাওয়াররুক। অতএব, এই শেষ বৈঠক হয়ত ওয়াজিব হবে, নয়তো ফরয। যদি শেষ বৈঠক ওয়াজিব হয় , তবে এর হুকুম প্রথম বৈঠকের মত হওয়া উচিত। কারণ, প্রথম বৈঠকও ওয়াজিব। প্রথম বৈঠকে ইফতিরাশ উত্তম হওয়ার ব্যাপারে শাফিঈ ও হাম্বলী সবাই একমত। অতএব, শেষ বৈঠকেও ইফতিরাশই উত্তম হবে।

যদি শেষ বৈঠক ফরয হয়, তবে এর হুকুম দুই সিজদার মাঝে বৈঠকের মত হওয়া উচিত। কারণ, দুই সিজদার মাঝে বসাও ফরয। এই বৈঠকে শাফিঈ ও হাম্বলীদের মতে সর্বসম্মতিক্রমে ইফতিরাশই উত্তম। কাজেই শেষ বৈঠকেও ইফতিরাশই উত্তম হবে, তাওয়াররুক নয়।

মোটকথা, প্রথম বৈঠক ও সিজদাদ্বয়ের মাঝে বৈঠকে ইফতিরাশকে উত্তম স্বীকার করার পর শেষ বৈঠকে তা অস্বীকার করার অবকাশ কোথায়?

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নায়লুল আওতার ঃ ২/১৬৭, ফাতহুল মুলহিম ঃ ২/১৭০, আওজাযুল মাসালিক ঃ ১/২৭৩, হাশিয়া আল কাওকাবুদ দুররী ঃ ১/১৪০, তোহফাতুল আহওয়াযী ঃ ১/২৪০, মাআরিফুস সুনান ঃ ৩/১১৩ আমানিল আহবার ঃ ৪/১৬৬ ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/৮৯-১০৫, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ১৩১/১৬১।

## باب السلام فى الصلوة هل هو من فروضها او من سننها

## অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে সালাম ফরয না সুন্নত?

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

নামায থেকে অবসরতা গ্রহণের জন্য বিশেষ শব্দ السلام। ফরয কিনা? এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে–

১. ইমাম শাফিঈ, মালিক র. এর মতে নামায থেকে অবসর হওয়ার জন্য আসসালাম শব্দ বলা ফরয। অন্য কোন পন্থায় নামায থেকে বের হলে, সে নামাযই হবে না। অবশ্য ইমাম মালিক র. এর মতে আসসালাম শব্দ তো ফরয কিন্তু শেষ বৈঠক ফরয নয়। এর পরিপন্থী শাফিঈ ও আহমদ র. এর মতে শেষ বৈঠকও ফরয। فذهب قوم الخ দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আতা ইবনে আবু রাবাহ, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, ইবরাহীম নাখঈ এবং কাতাদাহ র. প্রমুখের মতে শেষ বৈঠকও ফরয নয় এবং বিশেষ শব্দ আসসালামও ফরয নয়।

৩. ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, সুফিয়ান সাওরী, আওযাঈ, ইবনে জারীর তাবারী র. প্রমুখের মতে আসসালাম শব্দ ফরয নয়; বরং ওয়াজিব। কিন্তু নামাযের পরিপন্থী অন্য কোন পন্থায় বের হলেও ফরয আদায় হয়ে যাবে। এটাকে আমাদের গ্রন্থাবলীতে خروج بصنع المصلى আখ্যায়িত করা হয়। তবে শেষ বৈঠক তাশাহহুদ পরিমাণ ফরয। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলের দিকে وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অতঃপর আরো বিস্তারিত আকারে যারা শেষ বৈঠক ও সালাম ফরয হওয়ার প্রবক্তা নন তাদেরকে ومنهم من قال اذا رفع راسه من اخرسجرة من صلونه فقد تمت صلو ته وان لم يتشهذ ولم يسلم দ্বারা বুঝিয়েছেন। আর যারা শেষ বৈঠককে ফরয বলেন তাদেকে বুঝিয়েছেন فمنهم من قال اذا قعد مقدار التشهد فقد تمت صلوته وان لم يسلم বাক্য দ্বারা।

وامّا وجهُ ذالكَ مِن طريقِ النظرِ فانّ الذينَ قالُوا انّه اذارفع رأسَه من اُخرِ سجدةٍ من صلاتِه فقد تمتْ صلاتُه، قالُوا رأينا هٰذا القعودَ قعودًا للتشهدِ وفيهِ ذكرٌ يتشهدُ بهِ وتسليمٌ يخرجُ به مِن الصلٰوةِ وقد رأينا قبلَه فِى الصلٰوةِ قعودًا فيهِ ذكرٌ يتشهدُ بهٖ فكلٌّ قَد اَجمعَ اَن ذالكَ القعودَ الاولَ ومَا فيهِ مِن الذكرِ ليسَ هُو مِن صُلبِ الصلٰوةِ بلْ هو مِن سنَنِها واختلفَ فِى القعودِ الاخيرِ فالنظرُ على ماذكرنَا ان يكونَ كالقعودِ الاولِ ويكونَ مافيه كَما

فِى الْقُعُوْدِ الاوّلِ فَيَكُوْنُ سُنَّةً وكلُّ مايفعلُ فيه سنةً كما كانَ القعودُ الاولُ سنةً وكلُّ ما يفعلُ فيه سنةٌ وقد رأينَا القيامَ الذىْ فِى كلِّ الصلٰوةِ والركوعَ والسجودَ الذى فِيهَا ايضًا كلّه كذالكَ، فالنظرُ علىٰ ماذكرنَا اَن يكونَ القعودُ فِيها ايضًا كلُّه كذالكَ. فلما كانَ بعضُه باتفاقِهم سنة كانَ ما بقىَ منه كذالكَ ايضا فِى النظرِ ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

ইমাম তাহাভী র. এর যুক্তির সারকথা হল, নামাযে না শেষ বৈঠক ফরয, না আসসালাম শব্দ। শেষ বৈঠক ফরয না হওয়ার ব্যাপারে ইমাম মালিক র. এর অনুকূল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামের বিরোধী। আসসালাম শব্দটি ফরয না হওয়ার ব্যাপারে হানাফীদের অনুকূল, ইমামত্রয়ের বিরোধী। বস্তুতঃ শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া হয় এবং নামায থেকে অবসর গ্রহণের জন্য আসসালাম শব্দও ব্যবহার করা হয়। অতএব, আমরা এর পূর্বেকার বৈঠক তথা প্রথম বৈঠক সম্পর্কে চিন্তা করে দেখলাম তাতেও তাশাহহুদ পড়া হয় এবং সমস্ত আলিম একমত যে, প্রথম বৈঠক ও দ্বিতীয় বৈঠকে যে যিকির রয়েছে, তা ফরয নয় বরং ওয়াজিব বা সুন্নত। পক্ষান্তরে, শেষ বৈঠক সম্পর্কে মতবিরোধ হয়ে গেছে, এটি ফরয কি না? যুক্তির দাবি হল–

১. যেরূপ প্রথম বৈঠক ফরয নয়, এরূপভাবে দ্বিতীয় বৈঠকও ফরয না হওয়া।

২. যেরূপভাবে প্রথম বৈঠকে যিকির ফরয নয়, এরূপভাবে দ্বিতীয় বৈঠকের যিকিরও যেন ফরয না হয়। অতএব, এই যুক্তির আলোকে প্রমাণিত হল, শেষ বৈঠক ফরয নয়, যেমনিভাবে সালাম ফরয নয়।

তাছাড়া, আমরা পূর্ণ নামাযের প্রতিটি রাক'আতের কিয়াম, রুকু ও সিজদা সম্পর্কে চিন্তা করে দেখলাম, এসবের হুকুম প্রতিটি রাক'আতে এক রকম। প্রতিটি রাক'আতে কিয়াম, রুকু, সিজদা একই পদ্ধতিতে ফরয। কোন রাক'আতে ফরয, আবার কোন রাক'আতে ওয়াজিব এমন নয়। অতএব, নামাযে যত বৈঠক হবে, এসবের হুকুমও একই রকম হবে। প্রথম বৈঠক যে ফরয নয়, এটি স্বীকৃত সত্য। অতএব, মানতে হবে দ্বিতীয় বৈঠকও ফরয নয়। যাতে সমস্ত বৈঠকের হুকুম এক রকম হয়।

قَالُوا فَمَا يؤمَرُ بالرجوعِ اليهِ بعدَ القيامِ عنهُ فهوَ الفرضُ ومَا لاَيؤمَرُ بالرجوعِ اليهِ بعدَ القيامِ عنهُ فليسَ ذالكَ بفرضٍ الاترٰى انَّ مَن قامَ وعليهِ سجدةٌ مِن صلاتِهِ حتّٰى استتمّ قائِمًا امرَ بالرجوعِ الِى ماقامَ عنهُ لِانه قامَ فتركَ فرضًا فامرَ بالعودِ اليهِ كذالكَ القعودُ الاخيرُ لمّا امرَ الذىْ قامَ عنهُ بالرجوعِ اليهِ كانَ ذالكَ دليلاً علٰى انَه فرضٌ ولوكانَ غيرَ فرضٍ اِذا لمَا اُمر بالرجوعِ اليهِ ـ كمَا لم يؤمَر بالرجوعِ الى العقودِ الاولِ ـ

**যুক্তির উত্তর ঃ**

যাদের মতে শেষ বৈঠক ফরয যদিও প্রথম বৈঠক ফরয নয়, তাদের পক্ষ থেকে উপরোক্ত যুক্তির উত্তর দেয়া হয় যে, শেষ বৈঠককে প্রথম বৈঠকের সাথে কিয়াস করা যথার্থ নয়। কারণ, প্রথম বৈঠক ও দ্বিতীয় বৈঠকের মাঝে হুকুমের দিক দিয়ে অনেক পার্থক্য আছে। মনে করুন, কেউ যদি প্রথম বৈঠককে ভুলে ছেড়ে দিয়ে তৃতীয় রাক'আতের জন্য পূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে যায়, এরপর তার মনে প্রথম বৈঠকের কথা স্মরণ হয়, তখন তাকে বৈঠকের দিকে ফিরে আসার হুকুম দেয়া হয় না, বরং দাঁড়িয়ে বহাল থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। এর পরিপন্থী যদি কেউ শেষ বৈঠক ভুলক্রমে ছেড়ে পরিপূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে যায় এবং দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর আর দ্বিতীয় বৈঠক স্মরণ হয়ে যায়, তবে তার জন্য বৈঠকের দিকে ফিরে আসার নির্দেশ রয়েছে। তার জন্য বহাল তবিয়তে দাঁড়িয়ে থাকা জায়েয নেই। অতএব, উভয় বৈঠকের মাঝে পার্থক্য আছে। যার দিকে ফিরে আসার নির্দেশ সেটি ফরয। যার দিকে ফিরে আসার নির্দেশ নেই সেটি ফরয নয়। মনে করুন, কোন ব্যক্তি সিজদা ছেড়ে পূর্ণ দাঁড়িয়ে গেছে, তবে তার উপর ফিরে এসে সিজদা করার নির্দেশ রয়েছে। কারণ, এই সিজদা ফরয। এতে বুঝা গেল, যার দিকে ফিরে আসার নির্দেশ হয়, সেটি হয় নামাযের ফরযের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে শেষ বৈঠকের দিকে ফিরে আসার হুকুমটিই ফরয হওয়ার প্রমাণ। এটি যদি ফরয না হত তবে ফিরে আসার হুকুম দেয়া হত না। অতএব, শেষ বৈঠককে প্রথম বৈঠকের উপর কিয়াস করা অযৌক্তিক।

فكانَ مِن الحجةِ عليهم لِلآخرينَ انه اِنما امرَ الذى قامَ مِن القعودِ الاولِ حتى استتمَّ قائمًا بالمضيّ فِى قيامِه وان لايرجعَ الِى قعودِه لِانه قامَ من قعودٍ غيرِ فرضٍ فدخَل فِى قيامِ فرضٍ فَلم يؤمرْ بتركِ الفرضِ والرجوعِ الى غيرِ الفرضِ وامرَ بالتمادىْ على الفرضِ حتى يتمّه فكانَ لَوقامَ عن القعودِ الاولِ فلم يستتمَّ قائمًا امرَ بالعودِ الى القعودِ، لِانه مالَم يستتمَّ قائمًا فلم يدخلْ فِى فرض فامرَ بالعودِ مِما ليسَ بسنةٍ ولافرضٍ الي القعودِ الذىْ هُو سنةٌ وكانَ يؤمرُ بالعودِ ممَّا ليسَ بسنةٍ ولَا فريضةٍ الى ماهُو سنةٌ ويومرُ بالعودِ مِن السنةِ الى مَاهو فريضةٌ۔

وكانَ الذىْ قامَ مِن القعودِ الاخيرِ حتى استتمَّ قائمًا داخلًا لَافى سنةٍ ولافِى فريضةٍ وقد قامَ مِن قعودٍ هو سنة فامرَ بالعودِ اليه وتركِ التمادىْ فِيمَا ليسَ بسنةٍ ولا فريضةٍ كمَا امرَ الذى قامَ مِن القعودِ الاولِ الذىْ هو سنةٌ فلم يستتمَّ قائمًا فيدخلُ فِى الفريضةِ ان يرجعَ مِن ذالكَ اِلِى القعودِ الذىْ هو سنةٌ فلهذَا امرَ الذىْ قامَ مِن القعودِ الاخيرِ حتّى استتمَّ قائماَ بالرجوعِ اليهِ لاَ لِما ذهبَ اليه الاخرونَ۔

قَال ابُو جعفرِ فهٰذا هو النظرُ عندنَا فِى هٰذا البابِ لَامَا قَال الاُخرونَ ولٰكنَّ اباحنيفةَ وابايوسفَ ومحمدًا رحمَهم اللهُ تعالٰى ذهبُوا فِى ذالكَ الى قولِ الذينَ قالُوا اِن القعودَ الاخيرَ مقدارَ التشهدِ مِن صلبِ الصلٰوةِ۔

**উত্তরের উত্তর :**

যাদের মতে উভয় বৈঠক সুন্নত অথবা ওয়াজিব, ফরয নয় তাদের পক্ষ থেকে উপরোক্ত উত্তরের জবাব এই দেয়া যায় যে, হুকুম হিসেবে এই দুটি বৈঠকের

মধ্যে তোমাদের পার্থক্য করা ঠিক হয়নি। কারণ, শেষ বৈঠকে প্রত্যাবর্তনের হুকুম এজন্য নয় যে, শেষ বৈঠক ফরয, প্রথম বৈঠক ফরয নয়। বরং এখানে আরেকটি মূলনীতি আছে, যার কারণে এই পার্থক্য হল।

**মূলনীতি ঃ**

সেই মূলনীতিটি হল, যদি কোন নামাযী ব্যক্তি অফরযকে ছেড়ে কোন ফরযে প্রবেশ করে, তবে তার জন্য এই অফরযের দিকে ফিরে আসার অনুমতি নেই। বরং তার জন্য এই ফরযের উপর স্থির থাকা জরুরি। প্রথম বৈঠক ছেড়ে তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়ালে অফরয ছেড়ে ফরযে প্রবেশ করা হয়। কারণ, এই তৃতীয় রাক'আতটির কিয়াম ফরয, প্রথম বৈঠক ফরয নয়। কাজেই দাঁড়ানো থেকে বসার দিকে ফেরার অনুমতি থাকবে না।

আর একটি মূলনীতি হল, যদি নামাযী কোন সুন্নত ছেড়ে এরূপ অবস্থায় প্রবেশ করে, যেটি সুন্নতও নয়, ফরযও নয়, তবে তখন নামাযীকে সুন্নতের দিকে ফিরে আসার হুকুম দেয়া হয়। যেমন– যদি প্রথম বৈঠক ছেড়ে দাঁড়াতে শুরু করে এবং পূর্ণাঙ্গভাবে না দাঁড়ায়, তাহলে এই অবস্থা না সুন্নতের, না ফরযের। অপরদিকে, প্রথম বৈঠক সুন্নত অথবা ওয়াজিব। অতএব, মুসল্লীকে প্রথম বৈঠকের দিকে ফিরে যেতে হবে। অতএব, এরূপভাবে যখন মুসল্লী শেষ বৈঠক ছেড়ে দিয়ে পঞ্চম রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তবে এই পঞ্চম রাক'আত নামাযের না সুন্নত, না ওয়াজিব, না ফরয। অতএব, তাকে শেষ বৈঠকের দিকে ফিরে যেতে হবে।

মোটকথা, প্রথম বৈঠকের দিকে না ফেরার হুকুম এবং দ্বিতীয় বৈঠকের দিকে ফেরার হুকুম উপরোক্ত মূলনীতিগুলোর ভিত্তিতেই। অতএব, আমাদের যুক্তির উত্তর দিতে গিয়ে তোমাদের নিম্নোক্ত বক্তব্য রাখা ঠিক নয় যে, প্রথম বৈঠকের দিকে না ফেরার নির্দেশ এর ফরয না হওয়া, আর শেষ বৈঠকের দিকে ফেরার হুকুম এটি ফরয হওয়ার কারণে। আমাদের বর্ণিত যুক্তি স্বস্থানে সম্পূর্ণ ঠিক।

ইমাম তাহাভী র. বলেন, এ বিষয়ে এটিই আমাদের যুক্তি। তথা না শেষ বৈঠক ফরয, না সালাম।

কিন্তু আমাদের তিন ইমাম– আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও আহমদ র. যদিও সালামকে ফরয বলেননি, কিন্তু শেষ বৈঠক তাদের মতে ফরয। সুমহান তাবিঈদের মত এটাই। এ কারণে ইমাম বুখারী, হাসান বসরী, আতা ইবনে আবু রাবাহ থেকে তার ফতওয়া বর্ণনা করেছেন যে, শেষ বৈঠক তাশাহহুদ পরিমাণ ফরয। এছাড়া এ অনুচ্ছেদে হযরত ইবনে মাসউদ রা. এর রেওয়ায়াতও উল্লেখ করেছেন যে, শেষ বৈঠক ফরয ও আবশ্যক, যা ছাড়া নামায হবে না।

**উপকারিতা ঃ**

ইমাম তাহাভী র. এখানে যুক্তির আলোকে শেষ বৈঠক ফরয নয় বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এ কথাটি হানাফীদের পরিপন্থী। এটা কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। কারণ, তিনি মুজতাহিদ হওয়ার কারণে কোন কোন মাসআলায় ইমাম আবু হানীফা র. এর সাথে বিরোধ করেছেন। যেমন– ইমাম আবু ইউসুফ র. কোন কোন মাসআলায় ইমাম আবু হানীফা র.-এর সাথে মতবিরোধ করতেন। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হল, ইমাম তাহাভী র. এর দ্বিতীয় ইবারত সুস্পষ্ট আকারে শেষ বৈঠক ফরয প্রমাণ করছে। তিনি তাঁর মুখতাসারে বলেছেন–

بَابُ اَقَلُّ مَا يَجْزِئُ مِنْ عَمَلِ الصَّلٰوةِ قَالَ اَبُو جَعْفَرٍ لَا فَرِيْضَةَ فِى الصَّلٰوةِ الا سِتُّ . التَّكْبِيْرَةُ الْاُوْلٰى وَالْقِيَامُ وَالْقِرَاءَةُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ وَالرُّكُوْعُ وَالسُّجُوْدُ وَالْقُعُوْدُ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ الَّذِى يَتْلُوْهُ التَّسْلِيْمُ . فَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ هٰذِهِ السِّتِّ اَعَادَ الصَّلٰوةَ".

ইসলামী আইনবিদগণ তার থেকে শেষ বৈঠক ফরয বলেই বর্ণনা করেন। সুন্নতরূপে নয়।

কাজেই হতে পারে ইমাম তাহাভী র. নিজের সুন্নতের উক্তি প্রত্যাহার করে ফরয হওয়ার মত পোষণ করেছেন। এমতাবস্থায় এই মাসআলাতে হানাফীদের সাথে তাঁর কোন মতবিরোধ অবশিষ্ট থাকে না।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য মাআরিফুস সুনান ঃ ৩/১০৯, তোহফাতুল আহওয়াযী ঃ ১/২৪৩, বযলুল মাজহুদ ঃ ২/১৩০, নায়লুল আওতার ঃ ২/১৯৩, ফাতহুল মুলহিম ঃ ২/১৭০, আমানিল আহবার ঃ ৪/১৩৪-৩৬, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/১১৯।

## باب الوتر

## অনুচ্ছেদ ঃ বিত্‌র

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

বিতরের নামায কয় রাক'আত? এক রাক'আত না তিন রাক'আত? যদি তিন রাক'আত হয়, তবে এক সালামে না দুই সালামে? এ প্রসঙ্গে মতবিরোধ রয়েছে।

১. আতা ইবনে আবু রাবাহ, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, আবু দাউদ, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, আবু সাওর, কাতাদা ও দাউদ ইবনে আলী র. প্রমুখের মতে

বিতরের নামায শুধু এক রাক'আত। ইমামত্রয়ের এটি একটি রেওয়ায়াত। فذهب قوم الخ দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম মালিক, শাফিঈ (কারো কারো বিবরণ অনুযায়ী ইমাম আহমদ র.) ইমাম আওযাঈ র. এর মতে আসল হল, দুই সালামে তিন রাক'আত পড়া। অন্যান্য ছুরতও জায়েয আছে। ইমাম মালিক র. এর মতে শুধু এক রাক'আত বিতর পড়া মাকরূহ। বরং এর পূর্বে রাতের (তাহাজ্জুদের) নামায থেকে জোড় রাক'আত হওয়া জরুরি। وقال بعضهم الوتر ثلاث ركعات يسلم فى الاثنين منهن الخ। দ্বারা তাঁদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইমাম শাফিঈ র. এর মতে বিতরের হাকীকত হল, রাত্রে যে নামায পড়েছে সেটাকে বেজোড় করে দেয়া। অতএব, তাঁর মতে বিতর হল, রাতের নামাযের অধীনস্থ। কাজেই তাঁর মতে উত্তম হল– এটাকে দুই সালামে তিন রাক'আত পড়া। কিন্তু এর সাথে সাথে তিনি এটাও বলেন যে, এক রাক'আত থেকে এগার রাক'আত পর্যন্ত পড়া জায়েয আছে।

ইমাম আহমদ র. এর মতে বিতরের হাকীকত হল, শুধু এক রাক'আত, অবশিষ্টটুকু রাতের নামায।

৩. ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, সপ্ত ফকীহ, কুফাবাসী, সুফিয়ান সাওরী এবং আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক র. প্রমুখের মতে দুই তাশাহহুদ এবং এক সালামে বিতরের নামায তিন রাক'আত। অতএব, দুই রাক'আত পড়ে সালাম ফিরানো জায়েয নেই। বরং সর্বশেষে একই সালাম আবশ্যক। বিতর একটি স্বতন্ত্র নামায, এটি তাহাজ্জুদের অধীনস্থ নয়। এক রাক'আত বিতর পড়া জায়েয নেই বরং এক রাক'আত কোন নামাযই নেই। فقال بعضهم الوتر ثلاث ركعات لا يسلم الا فى اخرهن الخ দ্বারা তাঁদেরকে বুঝানো হয়েছে।

**সারকথা ঃ** এই মাসআলাতে শাফিঈ ও হাম্বলীগণ একদিকে, হানাফী ও মালিকীগণ অপরদিকে। শাফিঈ ও হাম্বলীদের মতে, বিতর এক রাক'আত। অবশ্য হাম্বলীদের মতে বিতর শুধু এক রাক'আত, বাকিটুকু রাতের নামায। শাফিঈদের মতে, এক, তিন, পাঁচ, সাত, নয় এবং এগার রাক'আত সবই বিতর। হানাফী ও মালিকীদের মতে, বিতর তিন রাক'আত। হানাফীদের মতে এক সালামে, আর মালিকীদের মধ্যে দুই সালামে। ইমাম তাহাভী র., শাফিঈ, হাম্বলী এবং পূর্বোল্লেখিত প্রথম মাযহাব অবলম্বনকারীগণকে প্রথম দল সাব্যস্ত করে তাদের সাথে হানাফী ও মালিকীদের মুকাবিলা সাব্যস্ত করেছেন। এরপর

হানাফী ও মালিকীদের দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। অতএব, এখানে সর্বমোট তিনটি দল হল–

১. শাফিঈ ও হাম্বলীগণ, আতা ইবনে আবু রাবাহ, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, আবু সাওর, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ এবং দাউদ ইবনে আলী প্রমুখ।

২. আহনাফ অর্থাৎ, ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ও অনুরূপ ইমামগণ।

৩. মালিকী ও তাদের অনুসারীগণ।

ثُم اردنَا اَن نلتمسَ ذالكَ مِن طريقِ النظرِ فوجدنَا الوترَ لايخلُو مِن احدِ وجهينِ، اِما ان يكونَ فرضًا اوسنةً فان كانَ فرضًا فاِنَّا لَم نرَ شيئاً مِن الفرائضِ الا علىٰ ثلٰثةِ اوجهٍ فمنه مَاهو ركعتانِ ومِنه ماهو اربعٌ ومنه ماهوَ ثلثٌ وكلٌّ قد اجمعَ ان الوترَ لاَ تكونُ اثنتينِ ولاَ اربعاً، فثبتَ بذالكَ انه ثلثٌ، هٰذا اِذا كانَ فرضًا واَمَّا اِذا كانَ سنةً فانَّا لَم نجِدْ شيئًا مِن السنَنِ الاَّ ولهٗ مثلٌ فِى الفرضِ مِن ذالكَ الصلوةُ مِنها تطوعٌ ومِنها فرضٌ، ومِن ذالكَ الصدقاتُ لهَا اصلٌ فِى الفرضِ وهو الزكٰوةُ ومِن ذالكَ الصيامُ وله اصلٌ فِى الفرضِ وهوَ صيامُ شهرِ رمضانَ ۔ ومَا اوجبَ اللهُ عزوجلَّ فِى الكفاراتِ ۔

ومِن ذالكَ الحجُّ يتطوعُ بهٖ وله اصلٌ فِى الفرضِ وهو حجةُ الاسلامِ ومن ذالكَ العمرةُ يتطوعُ بهَا ووجوبُها فِيه اختلافٌ سنبينهٗ فِى موضعهٖ اِن شاءَ اللهُ تعالىٰ ۔

ومِن ذالكَ العتاقُ لهٗ اصلٌ فى الفرضِ وهوَ ما فرضَ اللهُ عزَّ وجلَّ فِى الكتابِ مِن الكفاراتِ والظهارِ فكانتْ هذه الاشياءُ كلُّها يتطوعُ بها ولهَا اصول فى الفرضِ فلم نرَشيئًا يتطوعُ بهٖ الا ولَهٗ اصلٌ فِى الفرضِ وقد رأينَا اشياءَ هِى فرضٌ ولايجوزُ اَن يتطوعَ بها مِنها الصلٰوةُ علىٰ الجنازةِ وهىَ فرضٌ ولايجوزُ اَن يتطوعَ بها

ولايجوز لاحد ان يصلى على ميت مرتين يتطوع بالاخرة منهما فكان الفرض قديكون في شئ ولا يجوز ان يكون يتطوع بمثله ولم نرشيئا يتطوع به الا وله مثل في الفرض منه اخذ وكان الوتر يتطوع به فلم يجز ان يكون كذالك الا وله مثل في الفرض والفرض لم نجد فيه وترا الا ثلثا. فثبت بذالك ان الوتر ثلث هذا هو النظر وهو قول ابى حنيفة وابى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى -

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

ইমাম তাহাভী র. দ্বিতীয় পক্ষের দিক থেকে প্রথম দলের মুকাবিলায় বিতর নামায তিন রাক'আত হওয়ার ব্যাপারে একটি বিস্ময়কর যুক্তি পেশ করেছেন। সেটি হল, বিতর হয়তো ফরয হবে না হয় সুন্নত। যদি বিতর ফরয হয়, তবে আমরা সমস্ত ফরযের ব্যাপারে চিন্তা করে দেখি, এগুলো মোট তিন প্রকার।

১. দুই রাক'আত বিশিষ্ট। যেমন– ফজর নামায।

২. তিন রাক'আত বিশিষ্ট। যেমন– মাগরিব নামায।

৩. চার রাক'আত বিশিষ্ট। যেমন– যোহর, আসর ও ইশা।

বিতর নামায দুই রাক'আত অথবা চার রাক'আত বিশিষ্ট নয় বলে সবাই একমত। অতএব, অবশ্যই বিতর নামায হবে তিন রাক'আত বিশিষ্ট। এটা হল তখনকার কথা, যখন বিতর নামায ফরয হবে না।

আর যদি বিতর নামায সুন্নত হয়, তবে আমরা লক্ষ্য করছি যে, কোন সুন্নত অথবা নফল ইবাদত এরূপ নেই যেগুলোর ফরযে কোন মূল থাকে না। যেমন– নফল অথবা সুন্নত নামায। আসল ফরযে বিদ্যমান রয়েছে। কারণ, অনেক নামায ফরয রয়েছে। এরূপভাবে আর্থিক ইবাদতে নফল সদকা। ফরযে এগুলোর আসল বা মূল রয়েছে। সেটি হল যাকাত। এরূপভাবে নফল বা সুন্নত রোযা। এর জন্য ফরযে মূল রয়েছে। সেটি হল রমযানের রোযা, কাফফারার রোযা ইত্যাদি। এরূপভাবে নফল হজ্জ। ফরযে এর মূল রয়েছে, এটি হল বড় হজ্জ। অবশ্য উমরা ফরয অথবা, ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। এমনিভাবে নফলভাবে গোলাম আযাদ করা। ফরযে এর মূল আছে, যেমন– হত্যা, কসম, রমযানের দিনে সহবাসের কাফফারা, জিহাদের কাফফারায় গোলাম আযাদ করা আবশ্যক। অতএব বুঝা গেল, এরূপ কোন নফল ইবাদত নেই যার কোন মূল ফরযে নেই। বরং প্রতিটি নফলের জন্য ফরযে তার মূল অবশ্যই থাকে।

অবশ্য নফল ছাড়া ফরযের অস্তিত্ব হতে পারে তথা কোন একটি জিনিস ফরয অথচ তা নফলরূপে আদায় করা জায়েয নেই। যেমন–জানাযা নামায, এটি ফরয। এর নফলের কোন সুরত নেই।

উপরের বক্তব্যের আলোকে বুঝা গেল, কোন ফরয এরূপ হতে পারে যে, এর কোন নজির নফলে নেই। কিন্তু কোন নফল এরূপ নেই যার কোন মূল ফরযে নেই। ফরযগুলোতে এক রাক'আত বিশিষ্ট কোন নামায নেই। বেজোড় কোন ফরয নামায হলে, সেটি হল তিন রাক'আত বিশিষ্ট। কাজেই স্বীকার করতে হবে যে, বিতর নামায তিন রাক'আত, এক রাক'আত নয়। আমাদের দাবিও এটাই।

✪ এ পর্যন্ত দ্বিতীয় দলের পক্ষ থেকে প্রথম দলের মোকাবিলায় যৌক্তিক বিবরণ ছিল। এবার বাকি রইল দ্বিতীয় দল। যারা বলে বিতর নামায তিন রাক'আত হবে, কিন্তু দুই সালামে। দুই রাক'আতের পর এক সালাম, সর্বশেষে এক সালাম। এবার ইমাম তাহাভী র. তৃতীয় দলের বিপরীতে যুক্তি পেশ করছেন।

فَلَمَّا ثَبَتَ عَنهُم اَن الوِترَ ثَلٰثٌ نَظَرنَا فِى حكمِ التسليم بينَ الاثنتينِ مِنهنَّ كيفَ هُوَ؟ فرأينَا التَّسلِيمَ يَقطعُ الصلٰوةَ ويخرجُ المسلِّمُ بهٖ مِنها حتّٰى يكونَ فِى غيرِ صلٰوةٍ وقد رأينَا مَااَجمعُوا عليهِ مِنَ الفرضِ لَاينبغىْ اَن يفصلَ بعضَه من بعضٍ بسلامٍ فكانَ النظرُ علٰى ذٰلكَ ان يكونَ كذلك الوترُ، لَاينبغىْ ان يفصلَ بعضَه مِن بعضٍ بسلامٍ -

### তৃতীয় দলের বিপরীতে যৌক্তিক দলীল ঃ

যুক্তির নির্যাস হল, তাঁরা বিতর নামায তিন রাক'আত মানেন। অবশ্য দু'রাক'আত পর সালাম সাব্যস্ত করেন। এবার আমাদের চিন্তা করে এই সালামের হুকুম দেখতে হবে। আমরা দেখি, সালাম নামায সমাপণকারী। যার মাধ্যমে একজন মুসল্লী স্বীয় নামায থেকে বেরিয়ে আসেন। বস্তুতঃ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, ফরয নামাযের কোন রাক'আতকে অপর রাক'আত থেকে সালামের মাধ্যমে পৃথক করা জায়েয নেই। কাজেই যুক্তির দাবি হল, বিতরেও যেন এরূপ করা নাজায়েয হয়। কারণ, যদি দুই রাক'আতের পর সালাম হয়

তবে বিতরের নামায তিন রাক'আত থাকবে না বরং দুই রাক'আত এবং এক রাক'আত আলাদা হয়ে যাবে। এ কারণে তিন রাক'আত এক সালামে আদায় করতে হবে। দুই রাক'আতের পর সালাম প্রমাণিত করার কোন অবকাশ নেই। মোটকথা, যুক্তির দাবি হল, এক সালামে তিন রাক'আত বিতরের নামায হওয়া।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য মাআরিফুস সুনান ঃ ৪/১৬৭-১৬৯, বযলুল মাজহুদ ঃ ২/২২৪ কিতাবুল ফিকহি আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ ঃ ১/৩৩৬-৩৩৯, তোহফাতুল আহওয়াযী ঃ ১/৩৩৯, আমানিল আহবার ঃ ৪/১৯০-১৯১ ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/১৬২-২১৩।

## باب الركعتين بعد العصر

## অনুচ্ছেদ ঃ আসরের পর দু'রাক'আত

### মাযহাবের বিবরণ ঃ

আসর নামাযের পর দু'রাক'আত নফল পড়া কিরূপ? এ প্রসঙ্গে ইখতিলাফ রয়েছে–

১. ইমাম আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ, আহনাফ ইবনে কায়েস, আমর ইবনে মায়মুন, দাউদ জাহিরী, ইবনে হাযম জাহিরী র. প্রমুখের মতে আসরের পর দু'রাক'আত নফল পড়া জায়েয আছে। فذهب قوم الخ দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম চতুষ্টয়, সুফিয়ান সাওরী, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন ও সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মতের মতে আসরের পর দু'রাকআত নফল পড়া জায়েয নেই। বরং মাকরূহে তাহরীমী। فخالفهم اكثر العلماء فى ذالك وكرهوهما الخ দ্বারা তাঁদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অবশ্য ইমাম শাফিঈ ও আহমদ র. এর মতে যদি জোহরের দু'রাক'আত সুন্নত ছুটে যায়, তবে আসরের পর এগুলো কাযা করা জায়েয আছে। বরং ইমাম শাফিঈ র. বলেন, কেউ যদি এগুলো কাযা করে, তবে তার জন্য আমৃত্যু সর্বদা এ দু'রাক'আত আদায় করা জরুরি। চাই জোহরের সুন্নত ছুটে যাক, অথবা ছুটে না যাক, আসরের পর দু'রাক'আত নামায পড়তে হবে। ইমাম আহমদ র. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমরা এটা করিও না, আবার কেউ করলে এর দোষও বর্ণনা করি না।

ইমাম আবু হানীফা ও মালিক র. এর মতে আসরের পর নফল নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী, চাই জোহরের সুন্নতের কাযা হিসাবেই হোক না কেন।

وهٰذا هوَ النظرُ ايضًا وذالكَ انَّ الركعتينِ بعدَ الظهرِ ليستَا فرضًا فاِذَا تُركتَا حتّٰى يصلىَ صلوةَ العصرِ فَاِن صُليتَا بعدَ ذٰلكَ فَانمَا تطوَّعَ بهمَا مصليهِما فى غيرِ وقتٍ تطوعٍ فلِذٰلك نهينَا احدًا اَن يصلىَ بعدَ العصرِ تطوعًا وجعلنَا هاتَينِ الركعتَينِ وغيرَهما مِن سائرِ التطوعِ فى ذٰلك سواءً، وهٰذا قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمهم اللّٰهُ تعالىٰ ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

সমর্তব্য, মারফু হাদীসসমূহ, সাহাবার আমল এবং হযরত উমর রা. কর্তৃক আসরের পর নফল নামায আদায়কারীদেরকে বেত্রাঘাত ইত্যাদি প্রমাণের মাধ্যমে ইমাম তাহাভী র. সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণ করেছেন যে, আসরের পর নফল নামায পড়া বিধিবদ্ধ নয়। কিন্তু হযরত উম্মে সালামা রা. এর রেওয়ায়াতে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট সাদকার উট এবং কোন গোত্রের প্রতিনিধি দল আসার কারণে তিনি জোহরের পর তাদের ব্যবস্থাপনায় রত হয়েছিলেন। জোহরের পর দু'রাক'আত সুন্নত নামায পড়তে পারেননি। এ কারণে তিনি আসরের পর দু'রাক'আত নামায হযরত উম্মে সালামা রা. এর নিকট আদায় করেন।

এই রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে সন্দেহ হতে পারে যে, যদি কোন ব্যক্তির জোহরের এ দু'রাক'আত সুন্নত ছুটে যায়, তবে তার জন্য আসরের পর এগুলো কাযা করা জায়েয হবে। ইমাম শাফিঈ ও আহমদ র. এর বক্তব্যও তাই। এই সন্দেহের অবসানকল্পে ইমাম তাহাভী র. হযরত উম্মে সালামা রা. থেকে বিস্তারিত রেওয়ায়াত পেশ করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট জিজ্ঞেস করেছেন যে, এ দু'রাক'আত আমাদের ছুটে গেলে আমরাও কি কাযা করতে পারব? তখন তিনি পরিষ্কার নিষেধ করে দিলেন।

(عن ام سلمة رض قالت ......... قلت يارسول الله فنقضيهما اذا فاتتا؟ قال لا)

এতে বুঝা গেল এই দু'রাক'আতের কাযা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে খাস। অন্য কারও জন্য এগুলোর কাযা বিধিবদ্ধ নয়। যুক্তি

দ্বারাও তাই প্রমাণিত হয়। কারণ, জোহরের পরে এ দু' রাক'আত নামায ফরয নয়।

এবার যদি এগুলো আসর পর্যন্ত না পড়া হয়, তাহলে আসরের পর নফলরূপে এগুলো আদায় হবে। আসরের পর নফল নামাযের অবিধিবদ্ধতা ইমাম শাফিঈ ও আহমদ র.ও স্বীকার করেন। অতএব, এই স্বীকৃতির পর আসরের পর এ দু'রাক'আত কাযা করা জায়েয বলার কোন অবকাশ নেই। এটা আমাদের দাবি।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বযলুল মাজহুদ ঃ ২/২৬৭, আমানিল আহবার ঃ ৪/৩১৮-৩২৪, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/২২৩-২৩৫।

## باب الرجل يصلى بالرجلين اين يقيمهما

## অনুচ্ছেদ ঃ একজন দু'মুকতাদী নিয়ে নামায পড়লে তাদের কোথায় দাঁড় করাবে?

### মাযহাবের বিবরণ ঃ

যদি মুকতাদী একজন হয়, তবে ইমাম তাকে ডান দিকে দাঁড় করাবে। আর তিন বা এর অধিক হলে তাদের ক্ষেত্রে ইমামের পিছনে দাঁড়ানোর নির্দেশ রয়েছে। মুকতাদী দু'জন হলে এবং নামাযের জায়গা সংকীর্ণ হলে ইমাম তাদের দু'জনের মাঝে দাঁড়াতে পারেন। এসব মাসআলা সর্বসম্মত। এরপর ইখতিলাফ হল, যদি মুকতাদী দু'জন হয় এবং স্থান সংকীর্ণ হয়, তবে ইমাম তাদের কোথায় দাঁড় করাবেন?

১. ইমাম আবু ইউসুফ, ইবরাহীম নাখঈ, আলকামা, আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ র. প্রমুখের মতে, উপরোক্ত ছুরতে ইমাম মুকতাদীদ্বয়ের মাঝখানে দাঁড়াবেন। এটা ইমাম আবু ইউসুফ র. থেকে একটি রেওয়ায়াত।

২. ইমাম চতুষ্ঠয় ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে, এমতাবস্থায় ইমামের জন্য সামনে দাঁড়ানো, উভয় মুকতাদীকে নিজের পিছনে দাঁড় করানো মাসনুন। وهو قول ابى حنيفة وابى يوسف ومحمد الخ দ্বারা তাঁদের মাযহাবের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। হানাফীদের নিকট এর উপরই ফতওয়া।

ثُمَّ التمسنَا حُكمَ ذٰلك مِن طريقِ النظرِ، فرأينا الاصل اَنَّ الامامَ اِذا صَلّٰى بِرَجلٍ واحدٍ اَقامهُ عَن يمينه وبذالكَ جاءتِ السنةُ عَن رَسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم فِى حديثِ انسٍ رض وفِيمَا

حدثَنا بكرُ بنُ ادريسَ قالَ ثنَا ادمُ قالَ ثنَا شعبةُ عنِ الحكمِ عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ عنِ ابنِ عباسٍ رضـ قالَ اتيتُ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم وَهُو يُصلِّى فقمتُ عن يسارِه فاَخلفنِى فجعلنِى عن يمينه فهٰذا مقامُ الواحدِ معَ الامامِ وكانَ اذا صلى بثلاثةٍ اقامَهم خلفَه هٰذا لاَ اختلافَ فيهِ بينَ العلماءِ وانمَا اختلافُهم فِى الاثنينِ فقَالَ بعضُهم يُقِيْمُهُما حيثُ يُقيمُ الواحدَ وقالَ بعضُهم يقيمُهما حيثُ يقيمُ الثلاثةَ ـ

فَاردنَا ان ننظرَ فى ذالكَ لنعلمَ هَل حكمُ الاثنينِ فِى ذالكَ كحكمِ الثلٰثةِ اَو كحكمِ الواحدِ؟ فَرأينَا رسولَ الله صلى اللهُ عليهِ وسلَّم قدْ قالَ الاثنانَ فَما فوقَهما جماعةٌ ـ حدثَنا بذالكَ احمدُ بنُ داؤدَ قالَ ثنا عبيدُ اللهِ بنُ محمدٍ التيميُّ وموسىٰ بنُ اسماعِيلَ قالاَ ثنا الربيعُ بنُ بدرٍ عن ابيهِ عن جدهٖ عن ابِى موسىٰ الاشعريِّ رضـ عنِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم بذالكَ فَجَعلَهمَا رسولُ اللهِ صلى الله عليهِ جماعةً فصارَ حكمُهما كَحكمِ مَا هو اكثرُ مِنهما لاحكمِ مَا هو اقلُّ مِنهمَا ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

ইমাম তাহাভী র. বলেন, রেওয়ায়াতের আলোকে প্রমাণিত যে, মুকতাদী একজন হলে, ইমাম তাকে ডান দিকে দাঁড় করাবেন, আর তিন অথবা তিনের অধিক হলে, তাদেরকে পিছনে দাঁড় করাবেন। এ ব্যাপারে সবাই একমত। ইখতিলাফ হল, মুকতাদী দু'জন হওয়ার সময়। কেউ কেউ এ দু'জনকে একের পর্যায়ভুক্ত করে ইমামের বরাবর দাঁড়ানোর উক্তি করেছেন। কেউ কেউ দুইকে তিনের পর্যায়ভুক্ত করে ইমামের পিছনে দাঁড়াতে বলেছেন। অতএব, যুক্তির আলোকে আমাদের দেখতে হয় যে, দুইয়ের হুকুম এক, না তিনের মত? আমরা দেখছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইকে জামাআত তথা বহুবচনের পর্যায়ে রেখেছেন–

عَن ابِى موسىٰ الاشعرىِّ رض عنِ النبىِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ انهُ قالَ الاثنانِ فمَا فوقَهما جماعةٌ۔

وَرأينا اللهَ عزوجلَّ فرضَ للاخِ او للاختِ مِن قبلِ الامِّ السدسَ وفرضَ للجميعِ الثُلثَ وكذالك فرَضَ للاثنينِ وجعلَ للاختِ مِن الابِ النصفَ وللاثنتينِ الثلثينِ ۔

وكذالكَ اَجمعُوا اَنه يكونُ لثلاثٍ واَجمعوا ان للابنةِ النصفَ وللبناتِ الثلثينِ ۔

وقَالَ اكثرُهم وابنُ مسعودٍ رض فِيهم اِنَّ للاثنتينِ ايضًا الثلثينِ فكذالكَ هوَ فى النظرِ لِان الابنةَ لمَّا كانتْ فى ميراثِها مِن ابيها كَالاختِ فى ميراثِها مِن اخِيها كانتِ الابنتانِ ايضا فِى ميراثِهما مِن ابيهِما كالاختينِ فى ميراثِهمَا مِن اخِيْهما فكانَ حكمُ الاثنينِ فيمَا وصفنَا حكمَ الجماعةِ لَاحكمَ الواحدِ ۔

فالنظرُ علٰى ذالكَ ان يكونَا فى مقامِهما مع الامامِ فِى الصلٰوةِ مقامَ الجماعةِ لامقامَ الواحدِ، فثبتَ بذالكَ ماروٰى جابرٌ وانسٌ رض وفعلَه عمرُ بنُ الخطابِ رض وهو قولُ ابى حنيفةَ وابىْ يوسفَ ومحمدٍ رح غيرَ ان ابايوسفَ قالَ الامامُ بالخيارِ ان شاءَ فعلَ كما روٰى ابنُ مسعودٍ رض وان شاءَ فعلَ كما روى انسٌ وجابرٌ رض ۔ وقولُ ابى حنيفةَ ومحمدِ بنِ الحسنِ فى هذا احبُّ الينا ۔

**আরেকটি যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

এরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মিরাসের মাসআলায় সর্বত্র দুইকে তিন এবং দলের পর্যায়ভুক্ত করেছেন। যেমন– বৈমাত্রেয় ভাই অথবা বোন একজন হলে তাদের জন্য এক ষষ্ঠমাংশ, তিন এবং তিনের অধিক হলে তাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ নির্ধারণ করেছেন। অনুরূপভাবে তিনের স্থলে দুই হলেও তাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ নির্ধারণ করেছেন, এক-ষষ্ঠমাংশ নয়। এমনিভাবে এক

কন্যার জন্য অর্ধেক, তিন এবং তিনের অধিকের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ নির্ধারণ করেছেন। দুই কন্যার জন্যও দুই-তৃতীয়াংশ নির্ধারণ করেছেন। এই পদ্ধতি প্রকৃত ও বৈপিত্রেয় বোনদের ব্যাপারে প্রযোজ্য। তিনের যে হুকুম দুইয়েরও সেই হুকুম। এতে বুঝা গেল, শরীয়তে দুই তিনের পর্যায়ভুক্ত, একের পর্যায়ভুক্ত নয়। অতএব, আলোচ্য মাসআলায় বলতে হবে, তিন মুকতাদীকে যেরূপ ইমামের পিছনে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে, দুইয়ের জন্য অনুরূপ ইমামের পিছনে দাঁড়ানোর নির্দেশ, ইমামের সমান নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের মত এটাই। যুক্তির আলোকে এটাই প্রমাণিত হয়।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বিদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ ১/১৪৮, হিদায়া ঃ ১/১০৩, বাদায়ি'ঃ ১/১৫৯, আমানিল আহবারঃ ৩/২২৯, বযলুল মাজহুদঃ ১/৩৪৪, ঈযাহুত তাহাভীঃ ২/২৩৬-২৪৩।

## باب صلوة الخوف كيف هى؟

## অনুচ্ছেদ ঃ সালাতুল খাওফ বা শংকার নামায কিরূপ?

### মাযহাবের বিবরণ ঃ

সালাতুল খাওফ সংক্রান্ত কয়েকটি মতবিরোধ রয়েছে। প্রথম ইখতিলাফ রাক'আত সংখ্যার ব্যাপারে। দ্বিতীয় মতবিরোধ সালাতুল খাওফের ধরণ সংক্রান্ত। এখানে প্রথমে দু'টি ইখতিলাফ মাযহাবসহ বর্ণনা করা হল।

### সালাতুল খাওফ কত রাক'আত?

১. ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, তাউস ইবনে কায়সান, হাসান বসরী, আতা ইবনে আবু রাবাহ, মুজাহিদ, কাতাদা, হাকাম ইবনে উতাইবা র. প্রমুখের মতে সালাতুল খাওফ শুধু এক রাক'আত। فذهب قوم الخ দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম চতুষ্ঠয়, ইবরাহীম নাখঈ বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের মতে ভয় ও যুদ্ধের কারণে নামাযের রাক'আত সংখ্যা হ্রাস পায় না। প্রথম وذهب اخرون দ্বারা তাঁদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

### প্রথম দলের প্রমাণ

তাঁরা হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। তাতে রয়েছে, সালাতুল খাওফ এক রাক'আত।

عن مجاهد عن ابن عباس رضـ قال فرضَ اللهُ عز وجل على لسانِ نبيّكم صلى اللهُ عليه وسلم اربعًا فى الحضرِ وركعتينِ فى السفرِ وركعةً فى الخوفِ ـ

**প্রথম দলের প্রমাণের উত্তর ঃ**

ইমাম তাহাভী র. এর উত্তর দিয়েছেন, এই রেওয়ায়াতটি কুরআনের নসের পরিপন্থী। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوْا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ ـ

এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেয়া আছে, তিনি যখন প্রথম দলটিকে এক রাক'আত পড়িয়ে দেন তখন তারা শত্রুদের সামনে চলে যাবে, দ্বিতীয় দল এসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে দ্বিতীয় রাক'আত পড়বে। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইমাম সাহেব অবশ্যই দু'রাক'আত পড়বেন। পক্ষান্তরে, ইমামের দু'রাক'আত হলে মুকতাদীর এক রাক'আত পড়ার প্রশ্নই আসে না।

তাছাড়া, হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর এই রেওয়ায়াতটির সাথে তার আর একটি রেওয়ায়াতের বিরোধ রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, যীকারাদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেনাবাহিনীর দু'টি অংশের একটি নিয়ে এক রাক'আত পড়েছেন, অতঃপর এই দল শত্রুর সামনে চলে গেছে। দ্বিতীয় দল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে দাঁড়ালে তাদের নিয়ে তিনি দু'রাক'আত আদায় করেন। অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য দু'রাক'আত হল। যদিও প্রতিটি দলের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে হল এক রাক'আত। অতএব, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দু'রাক'আত আদায় এটি হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর এক রাক'আত বিশিষ্ট সালাতুল খাওফের রেওয়ায়াতটির সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। উপরোক্ত ছুরতে এটা বলাও অসম্ভব যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর শুধু এক রাক'আত ফরয ছিল। কারণ, এমতাবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রথম রাক'আত শেষ বৈঠক ও সালাম ছাড়া পড়া আবশ্যক হয়। যদ্বারা নামায বাতিল হওয়া সম্পূর্ণ স্পষ্ট। অতএব, যখন ইমামের উপর দু'রাক'আত ফরয হবে তখন মুকতাদীর ফরয শুধু এক রাক'আত কিভাবে হতে পারে? বরং আমরা বলব, প্রতিটি দল ইমাম ছাড়া দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করবে। যুক্তির দাবিও তাই।

فَثَبتَ بِمَاذكرنَا اَنَّ فرضَ صلٰوةِ الخوفِ ركعتانِ على الامامِ ثم لمْ يَذكرِ المأمومينَ بقضاءٍ ولَا غيرِه فِى هٰذه الاٰثارِ فاحتملَ اَن يُكونُوا قَضَوا ولَابد فِيما يُوجِبه النظرُ مِن ان يكونُوا قَد قَضَوْا ركعةً ركعةً، لِاَنَّا رَأينَا الفرضَ عَلى الامامِ فِى صلٰوة الامنِ والاقامةِ مثَل الفرضِ على المأمومِ سواءً وكذالكَ الفرضُ عليهِما فِى صلٰوةِ الامنِ فِى السفرِ سواءً ومحالٌ اَن يكونَ المأمومُ فرضُه ركعةً فيدخلُ مَع غيرِه مِمن فرضُه ركعتانِ اِلاوجبَ عليهِ مَا وجبَ على اِمامِه -

اَلاترٰى اَن مسافرًا لَو دخلَ فى صلٰوةِ مقيمٍ صلّٰى اربعًا فكانَ المأمومُ يَجبُ عليهِ مايجبُ على امامِه ويزيدُ فرضُه بزيادةِ فرضِ امامِه وقدْ يكونُ على المأمومِ ماليسَ على اِمامِه من ذالكَ اَنَّا رَأينا المقيمَ يصلِّى خلفَ المسافرِ فَيصلِّى بِصلاتِه ثمَّ يقومُ بعدَ ذالكَ فَيقضِى تمامَ صلوةِ المقيمِ فكانَ المأمومُ قَد يجبُ عَليه مَا ليسَ علٰى اِمَامِه ولَا يَجبُ عَلى اِمَامِه مالَايجبُ عليه، فلمَّا ثبتَ بِماذكرنَا وجوبُ الركعتينِ على امامٍ ثبتَ اَنَّ مثلَهُما على المأمومِ -

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

ইমাম তাহাভী র. বলেন, উপরোক্ত আয়াত ও রেওয়ায়াতগুলো দ্বারা প্রমাণিত হল যে, সালাতুল খাওফ ইমামের উপর দু'রাক'আত। সবাই এ ব্যাপারে একমত যে,

১. নিরাপদ ও মুকীম অবস্থায় ইমাম ও মুকতাদীর নামায সমান হয়ে থাকে।
২. অনুরূপভাবে সফরে নিরাপত্তা অবস্থায়ও উভয় নামায এক রকম হয়।

যদি কোন ব্যক্তির উপর এক রাক'আত নামায মেনে নেয়া হয় (যদিও এক রাক'আত বিশিষ্ট কোন নামায ইসলামে নেই) তাহলে এই ব্যক্তি যদি এরূপ কোন ব্যক্তির ইকতিদা করে যার উপর দু'রাক'আত নামায ফরয, তবে অবশ্যই সেই মুকতাদীর উপরও সে দু'রাক'আত ফরয হয়ে যাবে। সালাতুল খাওফে ইমামের উপর দু'রাক'আত ফরয প্রমাণাদির আলোকে প্রমাণিত। অতএব, যে

ব্যক্তি তার ইকতিদা করবে তৎক্ষণাৎ তার উপর দু'রাক'আত ফরয হয়ে যাবে। যেমন– মুসাফির যদি কোন মুকীমের ইকতিদা করে তবে তাকে চার রাক'আত পড়তে হয়। এর দ্বারা বুঝা গেল, যে জিনিস ইমামের উপর আবশ্যক হবে, সেটি অবশ্যই মুকতাদীর উপরও আবশ্যক হবে। হ্যাঁ, এরূপ হতে পারে যে, কোন জিনিস মুকতাদীর উপর আবশ্যক কিন্তু ইমামের উপর আবশ্যক নয়। যেমন– কোন মুকীম ব্যক্তি যদি কোন মুসাফিরের ইকতিদা করে তা হলে মুকীম মুকতাদীর দায়িত্ব চার রাক'আত পড়া, আর মুসাফির ইমামের দায়িত্বে শুধু দু'রাক'আতই।

সারকথা, নিরাপদ ও মুকীম অবস্থায় ও সফরে নিরাপদ অবস্থায় যেমন– ইমাম ও মুকতাদীর নামায এক রকম হয়, এরূপভাবে শংকা অবস্থায়ও তাদের উভয়ের নামায এক রকম হওয়া উচিত।

এমনিভাবে কোন জিনিস ইমামের উপর আবশ্যক হওয়ার ফলে যেহেতু তার মুকতাদীর উপর আবশ্যক হওয়া জরুরি এবং সালাতুল খাওফে ইমামের উপর দু'রাক'আত আবশ্যক হওয়া প্রমাণিত সেহেতু মুকতাদীর উপরও দু'রাক'আত আবশ্যক বলে স্বীকার করতে হবে। আমাদের দাবিও তাই।

**সালাতুল খাওফের ধরণ ঃ**

হাদীসসমূহে সালাতুল খাওফের অনেক ধরন ও পদ্ধতি এসেছে। আবু বকর ইবনে আরাবী বলেন, এর ২৪টি ছুরত এসেছে। আল্লামা ইবনে হাযম র. তন্মধ্য থেকে ১৪টি ছুরতকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন। হাফিজ ইবনুল কাইয়্যিম র. তন্মধ্য থেকে ৬টি ছুরতকে মূল সাব্যস্ত করে. বাকি ছুরতগুলোকে এই ৬টির অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন।

সমস্ত ইমাম এর উপরে একমত যে, এর যতগুলো ছুরত আছে, তন্মধ্য থেকে যে কোন ছুরত অবলম্বন করলে তা জায়েয হবে। অবশ্য কোন কোন ছুরত উত্তম রয়েছে। উত্তম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মতবিরোধ আছে। কারও মতে একটি আবার অন্য কারও মতে অপরটি উত্তম। অবশ্য ইমাম আহমদ র. কোন ছুরতকে উত্তম বলেন না। বরং পরিস্থিতির দাবি লক্ষ্য করে যে ছুরত সঙ্গত হবে, তাই অবলম্বন করবে।

১. হানাফীদের মতে দু'টি ছুরত উত্তম।

**প্রথম সুরত ঃ**

ইমাম একদল নিয়ে নামায শুরু করবেন, অপর দল শত্রুর বিপরীতে অবস্থান করবে। এক রাক'আত শেষ হলে প্রথম দল স্বীয় নামায পূর্ণ করা ছাড়া শত্রুর

সম্মুখে চলে যাবে। দ্বিতীয় দল এসে ইমামের সাথে এক রাক'আত পড়বে। ইমামের সালাম ফিরানোর পর এ দল শত্রুর সম্মুখে চলে যাবে। প্রথম দল সে স্থানে অথবা, প্রথম স্থানে এসে লাহিকরূপে কিরাআত ছাড়া স্বীয় নামায পূর্ণ করে শত্রুর সামনে চলে যাবে। দ্বিতীয় দল মাসবুকরূপে স্বীয় নামায পূর্ণ করবে। এ ছুরতে নামায তরতীব সহকারে আদায় হয়ে যায়। অর্থাৎ, প্রথম দলের নামায প্রথমে শেষ হয়। আর দ্বিতীয় দলের নামায পরে। কিন্তু আসা-যাওয়া বেশি হয়।

**দ্বিতীয় ছুরত ঃ**

দ্বিতীয় দল ইমামের সাথে এক রাক'আত পড়ে নিজে নিজে সে স্থানে স্বীয় দ্বিতীয় রাক'আত পূর্ণ করে দুশমনের বিপরীতে চলে যাবে। এরপর প্রথম দল স্বীয় অবশিষ্ট নামায পড়বে। এমতাবস্থায় আসা-যাওয়া কম। কারণ, দ্বিতীয় দলের নামাযে বিলকুল আসা-যাওয়া হয়নি। তবে নামায তরতীবের খেলাফ সমাপ্ত হবে। কারণ, দ্বিতীয় দলের নামায আগে শেষ হবে।

২. ইমাম মালিক, শাফিঈ র. সাহল ইবনে আবু হাছমা রা. এর হাদীসে বর্ণিত ছুরতটিকে উত্তম সাব্যস্ত করেন। এটি হল ইমাম প্রথমে একদল নিয়ে এক রাক'আত পড়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। এই দলটি স্বীয় দ্বিতীয় রাক'আত একাকী পূর্ণ করে শত্রুর সামনে চলে যাবে। দ্বিতীয় দল এসে ইমামের সাথে অংশগ্রহণ করবে এবং ইমাম স্বীয় রাক'আত পূর্ণ করবেন।

ইমাম মালিক র. বলেন, ইমাম সালাম ফিরাবেন আর এই দল দাঁড়িয়ে স্বীয় দ্বিতীয় রাক'আত পূর্ণ করে একাকী সালাম ফিরাবে। ইমাম শাফিঈ র. বলেন, ইমাম তাশাহহুদ অবস্থায় বসে থাকবেন এবং এই দল যখন স্বীয় রাক'আত শেষ করবে তখন তাদেরকে নিয়ে সালাম ফিরাবেন। এই ছুরতে যদিও যাতায়াত কম, কিন্তু মুকতাদীর নামায ইমামের নামাযের পূর্বে অবশ্যই শেষ হবে। ইমামতির যে নিয়ম এটি তার পরিপন্থী। তাছাড়া, এটি যুক্তির পরিপন্থীও বটে।

والنظرُ يدفعُ ذالكَ لِانَّا لَم نَجِدْ فِى شيءٍ مِن الصَّلواتِ اَنَّ المأمومَ يُصَلِّى شيئًا مِنها قبلَ الامامِ وانِمَا يفعلُه المأمومُ مَع فعلِ الامامِ اَو بَعدَ فعلِ الامامِ وَانَّمَا يَلتَمِسُ عِلمَ مَا اختُلِفَ فِيهِ مِمَّا اَجمعَ عَليهِ ـ

**মালিক র.-এর যৌক্তিক প্রমাণের উত্তর ঃ**

নামাযে মুকতাদী ইমামের অধীনস্থ হয়ে থাকে। অতএব, মুকতাদীর নামায হয়ত ইমামের সাথে সাথে শেষ হবে (মুদরিক হলে) অথবা, ইমামের পরে শেষ

হবে (মাসবুক অথবা লাহিক হলে), কিন্তু মুকতাদীর নামায ইমামের নামাযের পূর্বে শেষ হতে পারবে না। অথচ শাফিঈ ও মালিকীদের এই পদ্ধতিতে প্রথম দলের নামায অবশ্যই ইমামের নামাযের পূর্বে শেষ হবে। ইমামের শুধু এক রাক'আত হল অথচ, প্রথম দল দু'রাক'আত পড়ে সালাম ফিরিয়ে দিল। সালাতুল খাওফের এ ছুরত উত্তম হতে পারে না।

فَإِن قالُوا قد رأينَا تحويلَ الوجهِ عنِ القبلةِ قد يجوزُ فى هٰذه الصلٰوةِ ولاَ يجوزُ فى غيرِهَا فَما يُنكرونَ قضاءَ المأمومِ قَبل فراغِ الامامِ كذالكَ جوّزَ فِى هٰذه الصلوةِ ولم يجوَّزْ فى غيرِها ـ

**একটি প্রশ্ন ঃ**

একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, কোন নামাযে কিবলা থেকে স্বীয় চেহারা ও সিনা ফিরানো জায়েয নেই। কিন্তু সালাতুল খাওফে এটা জায়েয আছে। অতএব, অনুরূপভাবে মুকতাদীর নামায ইমামের নামাযের পূর্বে শেষ হয়ে যাওয়া যদিও অন্য কোথাও জায়েয নেই, কিন্তু হতে পারে, সালাতুল খাওফে এটা জায়েয?

قِيلَ لهُ اِن تحويلَ الوجهِ عنِ القبلةِ قد رأينَاه ابيحَ فِى غيرِ هٰذه الصلوة لِلعذرِ فابيحَ فِى هٰذه الصلٰوةِ كَما ابيحَ فِى غيرِها وذالكَ اَنهم اَجمَعوا اَنَ مَن كانَ منهزِمًا فحضرتِ الصلوةُ فانّه يُصلى واِن كانَ علٰى غيرِ قبلةٍ ـ

فَلمّا كانَ قد يصلّى كلَّ الصلوةِ علٰى غيرِ قبلةٍ لعلةِ العدوّ ولاَ يفسدَ ذالكَ عليهِ صلٰوتَه كانَ انصرافهُ على غيرِ القبلةِ مِن بعدِ صلاتهِ احرٰى اَن لايضرّه ذالكَ، فلمّا وجدنَا اصلاً فِى الصلٰوةِ الٰى غيرِ القبلةِ مُجمعًا عليهِ اَنه قدْ يجوزُ بالعذرِ، عطفنَا عليهِ مَا اختلِفَ فِيه مِن استدبارِ القبلةِ فى الانصرافِ للعذرِ ولمّا لم نجدْ لِقضاءِ المأمومِ مِن قبلِ ان يفرغَ الامامُ من الصلٰوةِ اصلاً فِيمَا اجمعَ عليهِ يدلُّ عليهِ فنعطفهُ عليهِ ابطلنَا العملَ بهِ ورجعنَا الى الاٰثارِ الاخَرِ اللتىْ قدمنَا ذكرَها اللتىْ معَها التواترُ وشواهدُ الاجماعِ ـ

**উত্তর ॥** এই প্রশ্নের উত্তর হল– আমরা জানি, কোন কোন ওজরের কারণে কিবলার দিকে চেহারা ফিরানোর হুকুম বাদ পড়ে যায়। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, পরাজিত দল পালানোর সময় যদি নামাযের সময় হয়ে যায়, তখন সে দল স্বীয় নামায আদায় করে নিবে, যদিও তাদের চেহারা ও সিনা কিবলার দিকে না থাকুক না কেন, অতএব শত্রুর ভয়ের ওজরে যেহেতু পূর্ণ নামায কিবলা ছাড়া অন্য দিকে ফিরে আদায় করা জায়েয অতএব, নামাযের কোন অংশে কিবলা থেকে ফিরে অন্যদিকে ফিরে আদায় করা উত্তমরূপেই জায়েয হবে। এরূপভাবে আবাদির বাইরে, যানবাহনের উপর নফল নামায ইশারা করে, কিবলা ছাড়া অন্যদিকে ফিরে আদায় করা জায়েয আছে। অতএব, ওজরের কারণে কিবলা ছেড়ে ভিন্ন দিকে নামায পড়ার কোন না কোন নজির পাওয়া যায়। কিন্তু ইমামের পূর্বে মুকতাদীর নামায শেষ হয়ে যাওয়ার কোন নজির খুঁজে পাওয়া যায় না। কাজেই উপরোক্ত প্রশ্ন বাতিল, আমাদের যুক্তিই সঠিক।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আওজাযুল মাসালিক ঃ ২/২৬০, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ ১/১৭৫, ফাতহুল মুলহিম ঃ ২/১৭১, নববী ঃ ১/২৭৮, মাআরিফুস সুনান ঃ ৫/৩৭, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/২৪৪-২৮৭।

باب الاستسقاء كيف هو؟ وهل فيه صلوٰة ام لا؟

## অনুচ্ছেদ ঃ ইসতিসকা কিরূপ? তাতে কি নামায আছে?

ইসতিসকা শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল বৃষ্টি প্রার্থনা করা। শরীয়তের পরিভাষায় ইসতিসকার অর্থ হল– বিশেষ পদ্ধতিতে দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি দূর করার উদ্দেশ্যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট রহমতের বৃষ্টিতে সয়লাব হওয়ার জন্য দোয়া করা। ইসতিসকা সংক্রান্ত কয়েকটি বিতর্কিত মাসআলা রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি মাসআলার বিবরণ দেয়া হল–

### ১. ইসতিসকার নামায ঃ

ইসতিসকার তিনটি পদ্ধতি রয়েছে–

১. নামায ছাড়া শুধু বৃষ্টির জন্য দোয়া করা, ২. জুম'আর খুতবায় অথবা ফরয নামাযের পরে দোয়া করা, ৩. স্বতন্ত্র দু'রাক'আত নামায ও খুতবার পর দোয়া করা। এই তিনটি ছুরত সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। কিন্তু ইসতিসকার আসল কি-এ সম্পর্কে মতবিরোধ হয়ে গেছে। ইমামত্রয়, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ র. এর মতে ইসতিসকার মূল হল– নামায। ইমাম আবু হানীফা র. এর মতে ইসতিসকার আসল হল দোয়া। অবশ্য নামাযও বিধিবদ্ধ এবং মুসতাহাব। ইমাম

আবু হানীফা র. বলেন, প্রতিটি ব্যক্তি একাকী নামায পড়বে। জামাআতে নামায আদায় করা যদিও বিধিবদ্ধ ও মাসনূন, তা সত্ত্বেও সুন্নতে মুয়াক্কাদা নয়।

**২. ইসতিসকার নামাযে জোরে কিরাআত পড়বে, না আস্তে?**

১. ইমাম আবু হানীফা র. এর মতে ইসতিসকার নামাযে জোরে কিরাআত বিধিবদ্ধ নয়। কারণ, এটি দিনের নফল নামায। পক্ষান্তরে, দিনের নফলে সশব্দে কিরাআত বিধিবদ্ধ নয়।

২. ইমামত্রয়, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ র. ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে সশব্দে কিরাআতই মাসনূন। ইমাম তাহাভী র. এখানে ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ র. এর মাযহাবের সপক্ষে যুক্তি পেশ করেছেন।

فَفِى هٰذا الحديثِ ذكرُ الصلوةِ والجهرِ فيهَا بالقراءةِ ودلَّ جهرُه فيهَا بالقراءةِ اَنها كصلوةِ العيدِ التى تفعَلُ نهاراً فى وقتٍ خاصٍ؛ فحكمُها الجهرُ وكذالكَ ايضا صلٰوةُ الجمعةِ هِىَ مِن صلٰوةِ النهارِ ولكنَّها مفعولةٌ فِى يومٍ خاصٍ فحكمُه الجهرُ، فثبتَ بذالكَ اَن كذالكَ حكمَ الصلواتِ التىْ تصلّٰى بالنهارِ لاَفى سائرِ الايامِ ولكنْ لعارضٍ اَو فِى يوم خاصٍ فحكمُها الجهرُ وكلّ صلٰوة تفعلُ فى سائرِ الايامِ نهاراً لاَلعارضٍ ولاَ فى وقتٍ خاصٍ فحكمُها المخافتةُ، فثبتَ بِما ذكرنَا اَن صلٰوة الاستسقاءِ سنةٌ قائمةٌ لاينبغىْ تركُها وقد روىَ ذالكَ عن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم مِن غيرِ وجهٍ -

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

ইমাম তাহাভী র. হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে ইসতিসকার নামাযকে দুই ঈদের নামাযের সাথে তুলনা করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন–

فصلى ركعتين كما يصلى فى العيدين -

তাঁর অন্য একটি রেওয়ায়াতে জোরে কিরাআত পড়ার সুস্পষ্ট বিবরণ দেয়া আছে। তিনি বলেন– فصلى ركعتين ونحن خلفه يجهر فيهما بالقراءة

এই রেওয়ায়াতে সশব্দে কিরাআতের সুস্পষ্ট বিবরণই এর বিধিবদ্ধতার স্পষ্ট প্রমাণ। তাছাড়া, যুক্তির দাবি এটাই। কারণ, যে নামায দৈনিক পড়া হয় না, বরং কোন বিশেষ দিনে পড়া হয়, তাতে কিরাআত সশব্দে হয়ে থাকে। যেমন– জুমআ ও দুই ঈদের নামায। আর যে নামায দৈনিক দিনে আদায় করা হয়, সেগুলোতে কিরাআত হয় নিঃশব্দে। যেমন– জোহর ও আসরের নামায। এই মূলনীতির আলোকে ইসতিসকার নামায যেহেতু দৈনিক আদায় করা হয় না, সেহেতু এটি দিনে আদায় করলেও সশব্দে কিরাআত হবে। যেরূপভাবে জুমআ ও দই ঈদের নামায দিনে আদায় করা সত্ত্বেও সশব্দে কিরাআত পড়া হয়। সালাতে ইসতিসকাকে দুই ঈদের নামাযের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এতেও এ যুক্তির সমর্থন পাওয়া যায়।

৩. ইসতিসকা নামাযে খুতবা বিধিবদ্ধ কিনা?

১. ইমাম আবু হানীফা ও আহমদ ইবনে হাম্বল র. এর এক উক্তি মতে ইসতিসকা নামাযে খুতবা মাসনূন নয়।

২. সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামী আইনবিদ ও মুহাদ্দিসের মতে তাতে খুতবা মাসনূন।

৪. খুতবা নামাযের পূর্বে হবে না পরে?

১. হযরত আয়েশা, আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর, আবান ইবনে উসমান ও লাইস ইবনে সা'দ রা. প্রমুখের মতে সালাতে ইসতিসকার খুতবা জুম'আর মত নামাযের পূর্বে হবে।

২. ইমামত্রয়, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ র. ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে ইসতিসকার নামাযের খুতবা হবে নামাযের পরে। ইমাম তাহাভী র. যুক্তির আলোকে এটি প্রমাণ করেছেন।

فنظَرنَا فِي ذالكَ فوجدنَا الجمعةَ فِيها خطبةٌ وهيَ قبلَ الصلوٰةِ ورأينَا العيدينِ فِيهمَا خطبةٌ وهيَ بعد الصلوٰةِ، كذالكَ كانَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ يفعلُ، فاردنَا ان ننظرَ فِي خطبةِ الاستسقاءِ باىّ الخطبتينِ هي اشبهُ، فنعطفُ حكمَها علىٰ حكمِها، فراينَا خطبةَ الجمعةِ فرضاً وصلوةَ الجمعةِ مضمنةً بهَا لاتجزىَ الاَّ باصابتِها ورأينَا خطبةَ العيدينِ ليستْ كذالكَ لان صلوٰةَ العيدينِ تجزىُ ايضاً وان لم يخطبْ ورأينَا صلوةَ الاستسقاءِ

تجزئُ ايضاً وان لم يخطبْ الاترىٰ اَن اماماً لو صلّٰى بالناسِ فِى الاستسقاءِ ولم يخطبْ كانتْ صلاتُه مجزيةً غيرَ انه قَد اساءَ فِى تركِهِ الخطبةَ فكانتْ بِحكمِ خطبةِ العيدينِ اشبهَ منهَا بِحكمِ خطبةِ الجمعةِ، فالنظرُ علىٰ ذالكَ ان يكونَ موضعُها مِن صلٰوةِ الاستسقاءِ مثلَ موضعِهَا من صلٰوةِ العيدينِ فثبتَ بذالكَ انهَا بعدَ الصلٰوةِ لَاقبلَهَا وهٰذا مذهبُ ابى يوسفَ رحـ ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

ইমাম তাহাভী র. যুক্তি পেশ করেছেন যে, জুমআ ও দুই ঈদের নামাযে খুতবা হয়। কিন্তু জুম'আর নামাযে সালাতের পূর্বে, আর দুই ঈদের নামাযে সালাতের পরে খুতবা হয়ে থাকে। এবার আমাদের লক্ষ্যণীয় বিষয় হল– ইসতিসকার খুতবার সাদৃশ্য জুম'আর খুতবার সাথে, না দুই ঈদের খুতবার সাথে? আমরা দেখছি– জুম'আর খুতবা শর্ত। এছাড়া জুম'আর নামায আদায় হয় না। দুই ঈদের খুতবা শর্ত নয়। এছাড়াও ঈদের নামায আদায় হয়ে যায়। তবে তাতে খুতবা বর্জন করা খেলাফে সুন্নত। অপরদিকে ইসতিসকার নামাযও খুতবা ছাড়া আদায় হয়ে যায়। এতে খুতবা হওয়া শর্ত নয়, বরং সুন্নত। অতএব বুঝা গেল, দুই ঈদের খুতবার সাথে ইসতিসকার খুতবার সাদৃশ্য আছে, জুম'আর খুতবার সাথে নয়। অতএব, দুই ঈদের খুতবার ন্যায় ইসতিসকার খুতবাও হবে নামাযের পরে।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বযলুল মাজহুদ ঃ ২/২১২, ২১৮, মাআরিফুস সুনান ঃ ২/৪৯২, নববী ঃ ১/২৯২, আওজাযুল মাসালিক ঃ ২/৩০৮, ৩১৫, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ ১/২১৪,হিদায়া ঃ ১/১৫৬, নুখাবুল আফকার ঃ ৩/২৪৯, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/২৮৭-৩১২।

## باب صلٰوة الكسوف كيف هى؟

## অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের নামায কিরূপ?

কুসূফের আভিধানিক অর্থ হল– পরিবর্তন। পরিভাষায় কুসূফ বলে সূর্য গ্রহণকে। চন্দ্র গ্রহণকে বলে খুসূফ। বস্তুত সূর্য গ্রহণের নামাযের ধরন সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ হয়েছে।

১. হযরত ইমাম শাফিঈ, মালিক, আহমদ ইবনে হাম্বল, আবু সাওর র. ও উলামায়ে হিজাযের মতে সূর্যগ্রহণের নামায দুই রাক'আত। প্রতি রাক'আতে দুটি

করে রুকু। অতএব দু রাক'আতে রুকু এবং সিজদা হবে চার চারটি করে। فذهب قوم الخ দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. হযরত ইমাম তাউস, হাবীব ইবনে আবু সাবিত এবং আবদুল মালিক ইবনে জুরাইজ র. প্রমুখের মতে সূর্যগ্রহণের নামায দুই রাক'আত। প্রতি রাকআতে চার চারটি রুকু। وخالفهم فی ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. ইমাম কাতাদা, আতা ইবনে আবু রাবা, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ এবং ইবনুল মুনযির র. প্রমুখের মতে সূর্যগ্রহণের নামায দুই রাক'আত। প্রতি রাক'আতে তিন তিনটি রুকু। وخالف هؤلاء اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৪. ইমাম সাঈদ ইবনে জুবাইর, ইবনে জারীর তাবারী, ইয়াহইয়া এবং কোন কোন শাফিঈ মতাবলম্বীর মতে সূর্যগ্রহণের নামায দুই রাক'আত। কিন্তু রুকু সিজদার সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। বরং যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্যের আলো না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত রুকু সিজদার পুনরাবৃত্তি করতে থাকবে। وخالفهم فی ذالك اخرون। দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৫. ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখঈ র. প্রমুখের মতে সূর্যগ্রহণের নামায দুই রাক'আত। সাধারণ নামাযের ন্যায় প্রতি রাক'আতে রুকু হবে একটিই।

وهُو النظرُ عِندَنَا لِانا رأينَا سائرَ الصلواتِ مِن المكتوباتِ والتطوعِ معَ كلِّ ركعةٍ سجدتينِ، فالنظرُ علىٰ ذٰلكَ انَ يكونَ هٰذه الصلوةُ كذالكَ ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

ইমাম তাহাভী র. যুক্তির আলোকে হানাফী মাযহাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, নফল অথবা ফরয এরূপ কোন নামায পাওয়া যায় না, যার কোন রাক'আতে একাধিক রুকু আছে। বরং প্রতিটি রাক'আতে শুধু একটি করেই রুকু হয়। অতএব, সাধারণ নামাযের ন্যায় সূর্যগ্রহণের নামাযে প্রতি রাক'আতে একটি করে রুকু হওয়া উচিত।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বযলুল মাজহুদ ঃ নুখাবুল আফকার ঃ ৩/২৫৭, বযলুল মাজহুদ ঃ ২/২১৯, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/৩০০-৩১২।

## باب القراءة فى صلوٰة الكسوف كيف هى؟

## অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের নামাযে কিরাআত কিরূপ হবে?

১. ইমাম আবু হানীফা, মালিক, শাফিঈ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে, সূর্যগ্রহণের নামাযে নিঃশব্দে কিরাআত পাঠ মাসনূন। فذهب قوم الخ দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ র. প্রমুখের মতে সূর্যগ্রহণের নামাযে সশব্দে কিরাআত মাসনূন। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। যুক্তির আলোকে ইমাম তাহাভী র. এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন ও নিজে অবলম্বন করেছেন।

وقَد كانَ النظرُ فِى ذالكَ لِما اختلفُوا انا رأينَا الظهرَ والعصرَ يصليانِ نهارًا فِى سائرِ الايامِ ولايجهرُ فيهمَا بالقراءةِ ورأينَا الجمعةَ تصلّٰى فى خاصٍ منَ الايامِ ويجهرُ فيهَا بالقراءةِ فكانتِ الفرائضُ هٰكذاَ حكمُها مَاكانَ منهَا يفعلُ فى سائرِ الايامِ نهارًا خوفتَ فِيه ومَاكانَ مِنها يفعلُ فى خاصٍّ مِن الايامِ جهرَ فيه وكذالكَ جعلَ حكمَ النوافلِ ماكاَن مِنها يفعلُ فِى سائرِ الايامِ نَهَا راً خوفتَ فِيه بالقراءةِ وماكانَ مِنها يفعلُ فى خاصٍّ مِن الايامِ مثلَ صلٰوةِ العيدينِ يجهرُ فيه بِالقراءةِ ـ هٰذا مَالاَ اختلافَ بينَ الناسِ فيه ِوكانتْ صلوةُ الاستسقاءِفِى قولِ مَن يرٰى فِى الاستسقاءِ صلوةً هٰكذا حكمُها عندَه يجهرُ فيهَا بالقراءةِ ـ

وقد شذّ قولَه فِي ذالكَ مَارويناَ عن النبيّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ فِيما تقدَّمَ مِن كتابِناهٰذا فى جهرهِ بِالقراءةِ فى صلٰوةِ الاستقساءِ، فلمَّا ثبتَ ما وصفنَا فِى الفرائضِ والسننِ ثبتَ انَّ صلٰوة الكسوفِ كذالكَ ايضًا لمَّا كانتْ مِن السنةِ المفعولةِ فِى خاصٍ من الايامِ وجبَ اَن يكونَ حكمُ القراءةِ فيهَا كحكمِ القراءةِ فِى

السنن المفعولة في خاص من الايام وهو الجهر لا المخافتة قياسا ونظرا على ماذكرنا وهو قول ابى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وقد روى ذلك ايضا عن علي بن ابى طالب رض .

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

যে সব নামায দৈনিক আদায় করা হয়, চাই ফরয হোক যেমন– জোহর ও আসর নামায বা ফরয না হোক যেমন– জোহর ও আসরের সুন্নত, সেগুলোতে নিঃশব্দে কিরাআত হয়ে থাকে। যেসব নামায দিনে আদায় করা হয়, কিন্তু দৈনিক নয়, বরং কোন বিশেষ দিনে, চাই ফরয হোক যেমন– জুম'আর নামায় অথবা ফরয না হোক যেমন– দুই ঈদের নামায, সেগুলোতে সশব্দে কিরাআত হয়। এদিকে সূর্যগ্রহণের এই নামায দিনে আদায় করা হয়। অবশ্য দৈনিক নয়, বরং বিশেষ কোন সমস্যার কারণে এটা আদায় করতে হয়। অতএব এ মূলনীতির আলোকে সূর্যগ্রহণের নামাযের কিরাআত সশব্দেই প্রমাণিত হয়, নিঃশব্দে নয়।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বযলুল মাজহুদ ঃ মাআরিফুস সুনান ঃ ৫/২৯, নুখাবুল আফকার ঃ ৩/৩০২-৩, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/৩১২-১৫।

## باب التطوع بعد الوتر

## অনুচ্ছেদ ঃ বিতরের পর নফল

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, আমর ইবনে মায়মুন, মাকহুল র. প্রমুখের মতে বিতরের পর নফল জায়েয নেই। বিতরের পর নফল পড়লে পুনরায় বিতর পড়া আবশ্যক। فذهب قوم الخ দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. তাউস ইবনে কায়সান, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখঈ, ইমাম চতুষ্টয় বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে, বিতরের পর নফল নামায জায়েয আছে। এর কারণে বিতরের নামাযের উপর কোন প্রভাব পড়বে না। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

والذى روى عن الاخرين ايضا فليس له اصل فى النظر لانهم كانوا اذا ارادوا ان يتطوعوا صلوا ركعة فيشفعون به وترا متقدما قد قطعوا فيما بينه وبين ماشفعوابه بكلام وعمل ونوم، وهذا

لاأصلَ لهٗ ايضًا فى الاجماعِ فيعطفُ عليه هٰذا الاختلافُ، فلمّا كانَ ذالكَ كذلكَ وخالفهٗ مِن اصحابِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلّمَ مَن ذكرنا ورُوِىَ عن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ ايضًا خلافُهٗ انتفٰى ذالكَ ولم يجزِ العملُ بهٖ وهٰذا القولُ الذى بيّنّا قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمهمُ اللهُ تعالٰى -

### যৌক্তিক প্রমাণ ঃ

উল্লেখ্য প্রথম দল কোন কোন সাহাবীর আমল প্রমাণরূপে পেশ করেছেন, তাঁরা বিতরের নামায সর্বশেষে আদায় করতেন। কোন রাত্রে প্রথম রাতে বিতর পড়লে এবং এরপরে জাগ্রত হলে এক রাক'আত আদায় করে পূর্বেকার আদায়কৃত বিতর নামযকে জোড় বানিয়ে শেষে পুনরায় বিতর আদায় করতেন। ইমাম তাহাভী র. এর বিপরীতে হযরত ইবনে আব্বাস, আয়িয ইবনে আমর, আম্মার ইবনে ইয়াসির, আবু হোরায়রা ও আয়েশা রা. থেকে ফতওয়া ও আমল পেশ করেছেন। তাঁদের কেউ বিতরের পর নফলকে বিতর ভঙ্গকারী মনে করতেন না। তাছাড়া, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী ও আমলও বর্ণনা করেছেন। যদ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠের মত প্রমাণিত হয়। ইমাম তাহাভী র. বললেন, প্রথম দলের পেশকৃত সাহাবীগণের আমলের বিপরীতে আমাদের পেশকৃত সাহাবায়ে কিরামের আমল উত্তম। কারণ, তাদের আমল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উক্তিও আমলের অনুকূল। অথচ পূর্বোক্ত সাহাবায়ে কিরামের আমল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী ও আমলের অনকূল নয়। তাছাড়া, যুক্তিও এ আমল প্রত্যাখ্যান করছে। কারণ, বিতর পড়ে ঘুমানোর পর পুনরায় জাগ্রত হলে পূর্বে পঠিত বিতরকে জোড় বানিয়ে চার রাক'আত নফল আদায় করা এটা কিছুতেই সঠিক হতে পারে না। কারণ, এক নামাযের কোন রাক'আতের মাঝে কথাবার্তা, আমলে কাছীর এবং ঘুম ইত্যাদির মাধ্যমে বিচ্ছেদ সৃষ্টি নাজায়েয ও নামায ফাসিদ হওয়ার কারণ। অতএব কথাবার্তা, ঘুম ইত্যাদির পর এক রাক'আত পড়ে পূর্বেকার বিতরকে কিভাবে জোড় বানাবে? আমলে কাছীর তো সর্বসম্মতিক্রমে নামায ফাসিদের কারণ। অতএব এসব সাহাবীর এ আমল যুক্তিরও পরিপন্থী, আবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী ও আমলেরও খেলাফ, অতএব, তাঁদের এই আমল দ্বারা প্রমাণ পেশ করা ঠিক নয়।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নুখাবুল আফকার ঃ ৩/৩২৩-৩২৫, আওজাযুল মাসালিক ঃ ২/১৭১, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/৩২৩-৩৩০।

## باب جمع السور فى ركعة

## অনুচ্ছেদ ঃ এক রাক‘আতে কয়েক সূরা পাঠ

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. হযরত আমির শা’বী, আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান ও আবুল আলিয়া র. প্রমুখের মতে এক রাক‘আতে একাধিক সূরা পাঠ করা মাকরূহ। فذهب الى قوم الخ هذا দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম চতুষ্টয়, সুফিয়ান সাওরী, আতা ইবনে আবু রাবাহ, সাঈদ ইবনে জুবাইর, ইবরাহীম নাখঈ বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের মতে, এক রাক‘আতে একাধিক সূরা পাঠে কোন অসুবিধা নেই, বিনা মাকরূহ জায়েয। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وهٰذا الذىْ ذكرنَا معَ تواترِ الروايةِ فيهِ عَن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وكثرةِ مَن ذهبَ اليهِ من اصحابِه ومِن تابعيهم هو النظرُ، لِانَّا قد رأينَا فاتحةَ الكتابِ تقرأُ هى وسورةٌ غيرُهَا فى ركعةٍ ولا يكونُ بذلكَ بأسٌ ولايجبُ لفاتحةِ الكتابِ لِانها سورةُ ركعةٍ، فالنظرُ علىٰ ذالكَ انَ يكونَ كذالكَ مَاسواهَا مِن السورِ لَايجبُ ايضًا لكلِّ سورةٍ منه ركعةٌ وهٰذا مذهبُ ابى حنيفةَ وابىْ يوسفَ ومحمدٍ رحمهمُ اللهُ تعالىٰ -

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

এক রাক‘আতের মধ্যে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলিয়ে পড়া হয়। শুধু সূরা ফাতিহার জন্য স্বতন্ত্র একটি রাক‘আত হওয়া জরুরি নয়। অতএব এর প্রতি লক্ষ্য করে যুক্তির দাবি হল, যেমনিভাবে সূরা ফাতিহার জন্য স্বতন্ত্র একটি রাক‘আতের প্রয়োজন নেই, এরূপভাবে অন্য সূরাগুলোর জন্য স্বতন্ত্র একটি রাক‘আতের প্রয়োজন নেই। বরং এক রাক‘আতের মধ্যে একাধিক সূরা পাঠ করলে বিনা মাকরূহ জায়েয হবে। আমাদের মতও তাই।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নুখাবুল আফকার ঃ ৩/৩৬৬, ৩৬৭, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/৩৪৭-৩৫৫।

## باب المفصل هل فيه سجود ام لا ؟

## অনুচ্ছেদ ঃ মুফাসসালে সিজদা আছে কিনা?

সিজদায়ে তিলাওয়াত সংক্রান্ত কয়েকটি মতবিরোধ আছে–

১. সিজদায়ে তিলাওয়াতের হুকুম কি? ২. সিজদায়ে তিলাওয়াতের সংখ্যা কত? ৩. মুফাসসালাতে সিজদা আছে কিনা?

**১. সিজদায়ে তিলাওয়াতের হুকুম কি?**

১. হযরত উমর, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা., ইমাম শাফিঈ, মালিক, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ র. প্রমুখের মতে সিজদায়ে তিলাওয়াত সুন্নত। অবশ্য ইমাম আহমদ র. এর এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী নামাযের ভিতরে হলে ওয়াজিব, অন্যথায় সুন্নত।

২. ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ র. প্রমুখের মতে সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব।

وهٰذا هُو النظرُ عندنَا لِانَّا رأينَاهم لايختلفونَ اَن المسافرَ اِذا قرأَها وهُو علىٰ راحلتِه اومىٰ بِها ولم يكنْ عليهِ اَن يسجدُها علىٰ الارضِ فكانتْ هٰذه صفةَ التطوعِ لاصفةَ الفرضِ لِانَّ الفرضَ لايصلىٰ اِلا علىٰ الارضِ والتطوعُ يصلّٰى على الراحلةِ -

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

ইমাম তাহাভী র. স্বীয় যুক্তির মাধ্যমে সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব নয় প্রমাণ করেছেন। এটি ইমামত্রয়ের মত। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, মুসাফির যখন সিজদার আয়াত বাহনের উপর তিলাওয়াত করেন, তখন সওয়ারীর উপরই ইশারা করা যথেষ্ট। নিচে নেমে জমিনের উপর সিজদা করা জরুরি নয়। বস্তুত সওয়ারীর উপর ইঙ্গিত করা যথেষ্ট হওয়া এটা নফলের গুণ, ফরয (অথবা ওয়াজিবের) নয়। অতএব, ফরয (অথবা ওয়াজিব) নামায সওয়ারীর উপর আদায় হয় না। এবার যদি সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হত, তাহলে বাহনের উপর ইঙ্গিতের মাধ্যমে কখনও আদায় হত না। যেরূপভাবে ফরয, ওয়াজিব নামায সওয়ারীর উপর আদায় হয় না। অতএব, ইশারার মাধ্যমে বাহনের উপর সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় হয়ে যাওয়া ওয়াজিব না হওয়ার প্রমাণ।

২. সিজদায়ে তিলাওয়াতের সংখ্যা কত?

১. ইমাম মালিক, আতা ইবনে আবু রাবাহ ও মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, সাইদ ইবনে জুবাইর র. প্রমুখের মতে পূর্ণ কুরআন শরীফে মোট ১১টি স্থানে সিজদা রয়েছে। এটি ইমাম শাফিঈ র. এরও পুরনো উক্তি। হানাফীদের মতে যে ১৪টি সিজদা রয়েছে। তন্মধ্য হতে মুফাসসালাতের তিনটি সিজদা তথা সূরা নাজম, ইনশিকাক এবং আলাকের সিজদাগুলোকে তারা বাদ দেন।

২. ইমাম আবু হানীফা, দাঊদ জাহিরী র. এর মতে এবং ইমাম শাফিঈ র. এর পরবর্তী উক্তি অনুযায়ী কুরআন মজীদে মোট ১৪টি সিজদা রয়েছে। অবশ্য ইমাম আবু হানীফা র. এর মতে সূরা হজ্জে এক সিজদা এবং সূরা সোয়াদেও এক সিজদা। কিন্তু ইমাম শাফিঈ র. এর মতে সূরা হজ্জে দুই সিজদা, সূরা সোয়াদে কোন সিজদা নেই।

৩. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, লাইস, ইবনে ওয়াহাব, ইবনে হাবীব মালিকী র. প্রমুখের মতে পূর্ণ কুরআনে ১৫টি স্থানে সিজদা আছে। সূরা হজ্জে দুটি, অবশিষ্টগুলো হানাফীদের ন্যায়।

৩. মুফাসসালাতে সিজদা আছে কিনা?

১. ইমাম মালিক, সাঈদ ইবনে জুবাইর, হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, ইকরামা, তাউস ইবনে কায়সান, আতা ইবনে আবু রাবাহ, মুজাহিদ র. প্রমুখের মতে মুফাসসালাতে কোন সিজদা নেই। অতএব সূরা নাজম, ইনশিকাক ও আলাকে তাঁদের মতে কোন সিজদা হবে না। فذهب الى هذا الحديث قوم الخ দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী, ইবনে হাবীব মালিকী, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব র. প্রমুখের মতে মুফাসসালাতে সিজদা আছে। অতএব, সূরা নাজম, ইনশিকাক ও আলাকে সিজদা হবে। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَامَّا النظرُ فِي ذالكَ فعلىٰ غيرِ هٰذا المعنىٰ وذٰلكَ انَّا رأينا السجودَ المتفقَ عليهِ هو عشرُ سجداتٍ منهنَّ فِي الاعرافِ وموضعُ السجودِ فيهَا منهَا قولُهُ اِنَّ الذينَ عندَ ربِّكَ لايستكبرونَ

عَن عِبادتِه ويُسبِّحونَه ولَه يَسجدونَ ـ ومِنهنَّ الرعدُ وموضعُ السجودِ عندَ قولهِ عزوجلَّ ولله يسجدُ مَن فِي السمٰواتِ وَالارْضِ طَوعًا وكَرْهًا وظِلالُهم بالغُدوِّ والاٰصالِ ـ ومِنهنَّ النحلُ وموضعُ السجودِ منهَا عندَ قولِه تعالٰى ولله يَسجدُ مافِى السمٰواتِ والارضِ مِن دابةٍ الىٰ قولِه يؤمرونَ ـ ومنهنَّ فِى سورةِ بنِى اسرائيلَ وموضعُ السجودِ مِنهَا عندَ قولِه تعالٰى ويَخِرُّون لِلاذقَانِ سُجَّدًا اِلى قولِه خُشُوعًا ـ

ومِنهنَّ سورةُ مريمَ وموضعُ السجودِ مِنهَا عندَ قولِه اِذا تُتلٰى عَليهِم اٰيٰتُ الرحمٰنِ خروا سُجَّدًا وبُكِيًا ـ ومِنهنَّ سورةُ الحج فِيهَا سجدةٌ فِى اولِهَا عندَ قولِه اَلمْ تَرَانَ اللهَ يَسجدُ لهٗ مَن فِى السمٰواتِ وَمَنْ فِى الارضِ الٰى اخرِ الايةِ ـ ومِنهنَّ سورةُ الفرقانِ وموضعُ السجودِ مِنهَا عِند قوله اِذَا قيلَ لهُم اسْجُدُوا لِلرحمٰنِ اِلى اخرِ الايةِ ـ ومِنهنَّ سورةُ النملِ فيهَا سجدةٌ عندَ قولِه تعالٰى اَلَّايسجُدُوا لِلّٰه الذىْ يُخرِجُ الخَبْأَ اِلٰى اخرِ الايةِ ـ ومِنهنَّ الم تنزيلُ السجدةِ، فيهَا سجدةٌ عندَ قولِه تعالٰى اِنمَا يؤمِنُ باٰيٰتِنَا الَّذِينَ اِلىٰ اخِرِ الايةِ ـ ومنهنَّ حم تَنزِيلٌ مِن الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ وموضعُ السجودِ مِنهَا فِيه اختلافٌ ـ فقالَ بعضُهم موضِعهٗ تَعبدونَ وقَالَ بعضُهم موضعُه قانِ استَكبَرُوا فَالَّذينَ عِندَ ربكِ يُسبِّحونَ لَه بالَّيلِ والنَّهارِوهُم لايَسئمُونَ وكانَ ابو حنيفةَ وابو يوسفَ ومحمدٌ رحـ يذهِبونَ اِلى هٰذا المذهبِ الاخيرِ ـ

**প্রশ্নসহ যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

সমস্ত ইমামের সর্বসম্মত রায় অনুযায়ী পূর্ণ কুরআনে ১০টি সিজদা আছে। এগুলো সম্পর্কে কারও কোন মতবিরোধ নেই। শুধু ৫টি স্থান বিতর্কিত।

**সর্বসম্মত ১০টি স্থান ঃ**

১. সূরা আরাফে–

اِنَّ الذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَايَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسجُدُونَ ـ

২. সূরা রা'দে–

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَن فِى السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالغُدُوِّ وَالْاٰصالِ ـ

৩. সূরা নাহলে–

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الارضِ مِن دابةٍ وَالمَلٰئِكَةُ وَهُم لَايستَكْبِرُونَ ـ يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِّن فَوقِهِم وَيَفْعَلُونَ مَايُؤمَرُونَ ـ

৪. সূরা বনী ইসরাঈলে–

وَيَخِرُّوْنَ لِلاذقَانِ سُجَّدًا ............ خُشُوعًا ـ

৫. সূরা মারইয়ামে–

اُولٰئِكَ الَّذِينَ اَنعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ......... خَرُّوْا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ـ

৬. সূরা হজ্জে–

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ ...... يَفْعَلُ مَايَشَآءُ ـ

৭. সূরা ফুরকানে–

واذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرحمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحمٰنُ ....... نُفُوْرًا ـ

৮. সূরা নামলে–

اَلَّايَسْجُدُوْا لِلّٰه الَّذِىْ يُخْرِجُ الْخَبْأَ ...... الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ

৯. সূরা আলিফ-লাম-মীম তানযীলে–

اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا...... لَايَسْتَكْبِرُوْنَ ـ

১০. সূরা হা-মীম তানযীলে–

ইমাম মালিক ও শাফিঈ র. প্রমুখের মতে সিজদার স্থল تَعبُدُونَ আর হানাফীদের মতে সিজদার স্থল وَهُم لَايَسأَمُوْنَ

**বিতর্কিত ৫টি স্থান ঃ**

১. সূরা নাজমে- فَاسْجُدُوا لِلّٰه واعْبُدُوْا ـ

২. সূরা ইনশিকাকে- وَاِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ القرانُ لَايَسْجُدُونَ ـ

৩. সূরা আলাকে- لَاتُطِعْهُ واسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

৪. সূরা সোয়াদে- قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ ........ وخَرَّ رَاكِعًاوَّاَنَابَ ـ

৫. সূরা হজ্জে-

يٰاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا واعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

অতএব, আমরা লক্ষ্য করছি, সর্বসম্মত ১০টি স্থান সবই খবরের স্থল। যেগুলোতে সিজদার সংবাদ দেয়া হয়েছে। এগুলোর একটিতেও নির্দেশ নেই, যাতে সিজদার হুকুম দেয়া হয়েছে। কারণ, ১ নম্বরে ولهٗ يَسجُدونَ, ২ নম্বরে ولِلّٰه يَسجدُ مَا فى السَّمٰوات والارضِ ৩ নম্বরে ولله يسجد من فى السّمٰواتِ ومَا فى الارضِ ৪ নম্বরে يَخرُّونَ للاذقانِ سجدًا , এরূপভাবে সে ১০টি স্থানের প্রতিটিতে সিজদার সংবাদ দেয়া হয়েছে, সিজদার হুকুম নয়। এর ফলে একটি মূলনীতি বুঝা গেল যে, খবরের স্থানগুলোই সিজদার জায়গা, নির্দেশের স্থান নয়। কারণ, যে আয়াতে সিজদার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেটি হল শিক্ষাস্থল, তামিলস্থল নয়। অতএব, আমরা দেখছি, অনেক আয়াতে সিজদার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু সেসবের মধ্যে কারও মতেই সিজদায়ে তিলাওয়াত নেই, যেমন- وكُنْ مِن السَّاجِدينَ ও يٰمريمُ اقنُتِىْ لِربِّكِ واسْجُدِىْ । ফলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, খবরের স্থলেই সিজদায়ে তিলাওয়াত হবে, নির্দেশস্থলে নয়।

فالنظرُ على ذالكَ ان يكونَ كلُّ موضعٍ مِما اختُلفَ فيهِ هلْ فِيه سجودٌ ام لَا ان ننظرَ فِيه، فاِنْ كانَ موضعُ امرٍ فانَّمَا هوَ تعليمٌ فلاسجودَ فيهِ وكلُّ موضعٍ فِيه خبرٌ عنِ السجودِ فهوَ موضعُ سُجودِ التلاوةِ، فكانَ الموضعُ الذىْ اختلِفَ فيهِ مِن سورةِ النجمِ، فقالَ قومٌ هوَ موضعُ سجودِ التلاوةِ وقالَ اٰخرونَ هوَ ليسَ موضعَ سجدةِ تلاوةٍ

وهُو قولُه فَاسجُدُوا للّٰهِ واعْبدُوا فذالكَ امرٌ وليسَ بخبرٍ، فكانَ النظرُ على ماذكرنَا اَن لايكونَ موضعَ سجودِ التلاوةِ وكانَ الموضعُ الذىْ اختلِفَ فِيه ايضًا مِن اقْرأْ باسمِ ربّكَ هوَ قولُه كلّاَ لاتُطِعْهُ واسجُدْ واقْتَرِبْ فذالكَ امرٌ وليسَ بخبرٍ -

فالنظرُ علىٰ ماذكرْنَا اَن لايكونَ موضعَ سجودِ تلاوةٍ وكانَ الموضعُ الذى اختلِف فِيه مِن اِذا السَّماءُ انشقتْ هُو موضعَ سجودٍ اولا هُو قولُه فمالَهم لَايؤمِنونَ واذَا قرِئَ عَليهمُ القرانُ لَايَسجدونَ، فذالكَ موضعُ اخبارٍ لاموضعُ امرٍفالنظرُ علىٰ ماذكرنَا ان يكونَ موضعَ سجودِ التلاوةِ ويكونَ كلُّ شيْءٍ من السجودِ يردُّ الى ماذكرنَا فمَا كانَ مِنه امرًا ردَّ الى شكلِه مِما ذكرنَا، فلم يكنْ فيهِ سجودٌ ومَا كانَ مِنه خبرًا ردَّ الىٰ شكلِه مِن الاَخبارِ، فكانَ فيهِ سجودٌ، فهٰذاَ هوَ النظرُ فِى هٰذَا البابِ، فكانَ يجئُ علىٰ ذالكَ اَن يكونَ موضعُ السجودِ مِن حٓم هُو الموضعَ الذىْ ذهبَ اليهِ ابنُ عباسٍ رض لاِنه عندَه خبرٌ وهوَ قولُه فاِنِ استَكبَرُوْا فالذِينَ عندَ ربّكَ يُسبِّحُونَ لَهٗ بِاللّيلِ والنّهارِ وَهُم لَايَسئَمُوْنَ -

لَاكمَا ذَهبَ اليهِ مَن خالَفه، لِان اولئكَ جعلُوا السجدةَ عندَ امرٍ وهُو قولُه واسجُدُوا للّٰه الذىْ خَلَقَهُنَّ اِن كُنتُم ايَّاهُ تَعبُدونَ فكانَ ذالكَ موضعَ امرٍ وكانَ الموضعُ الاخرُ موضعَ خبرٍ وقد ذكرنَا اَن النظرَ يوجبُ اَنْ يكونَ السجودُ فِي مواضعِ الخبرِ لَافِى مواضعِ الامرِ فكانَ يجئُ علىٰ ذالكَ اَن لايكونَ فِى سورةِ الحجّ غيرُ سجدةٍ واحدةٍ، لِاَنَّ الثانيةَ المختلفَ فِيهَا اِنمَا موضعُها فِى قولِ مَن يَجعلُها سجدةً موضعُ امرٍ وهوَ قولُه ارْكعُوا واسْجُدُوا واعبُدُوا رَبّكُم الاٰيةَ، وقَد بينّا اَن مواضِعَ سجودِ التلاوةِ هِى مواضعُ الاخبارِ

لامواضعُ الامرِ، فَلو خلَّينَا والنظرَ لكانَ القولُ فِى سجودِ التلاوةِ اَن ننظرَ فَما كانَ منهُ موضعَ امرٍ لم نجعلْ فيهِ سجودًا ومَا كانَ منهُ موضعَ خبرٍ جعلنَا فيه سجودًا ولكنَّ اتباعَ ما ثبتَ عَن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ اولىٰ ـ

وقدِ اختلفَ فِى سورةِ ص فقالَ قومٌ فِيها سجدةٌ وقالَ اٰخرونَ ليسَ فِيهَا سجدةٌ فكانَ النظرُ عندنَا فِى ذالكَ ان يكونَ فِيهَا سجدةٌ، لِانَّ الموضعَ الذىْ جعلَه مَن جعلَه فِيها سجدةً هو موضعُ خبرٍ لاموضعُ امرٍ وهو قولُه فَاستَغفرَ ربَّهٗ وخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنابَ. فذالكَ خبرٌ فَالنظرُ فيهِ ان يردَّ حكمُه الى حكمِ اشكالِه مِن الاخبارِ، فيكونُ فيهِ سجدةٌ كمَا يكونُ فِيهَا ـ

আমরা উপরোক্ত মূলনীতির আলোকে বিতর্কিত স্থানগুলোতে চিন্তা করব যাতে খবরের স্থলে সিজদায়ে তিলাওয়াত প্রমাণিত হয় এবং নির্দেশস্থলে সিজদায়ে তিলাওয়াত না হয়। অতএব বিতর্কিত ৫টি স্থলের মধ্য থেকে সূরায়ে ইনশিকাক ও সূরা সোয়াদের নিম্নোক্ত দুটি আয়াত اِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ـ و خرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ খবরের স্থল হওয়ার কারণে এগুলোতে উপরোক্ত মূলনীতির আলোকে সিজদায়ে তিলাওয়াত হবে। অতএব সূরায়ে ইনশিকাকে সিজদায়ে তিলাওয়াত প্রমাণিত হওয়ার পর ব্যাপক আকারে মুফাসসালাতে ইমাম মালিক র. প্রমুখ কর্তৃক সিজদায়ে তিলাওয়াত অস্বীকার করা সহীহ নয়। সূরা সোয়াদে যুক্তির আলোকে সিজদায়ে তিলাওয়াত প্রমাণিত হয়, সাথে সাথে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমল দ্বারাও তা প্রমাণিত হয়। এই রেওয়ায়াতটি ইমাম তাহাভী, হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অতএব হাদীস ও যুক্তির আলোকে প্রমাণিত হওয়ার পর ইমাম শাফিঈ র. কর্তৃক সূরা সোয়াদ থেকে সিজদায়ে তিলাওয়াতকে অস্বীকার করার কোন কারণ আমরা খুঁজে পাই না।

বিতর্কিত স্থানগুলো থেকে অবশিষ্ট তিনটি অর্থাৎ, সূরা নাজম, সূরা আলাক ও সূরা হজ্জের আয়াতগুলো নির্দেশস্থল হওয়ার কারণে সিজদায়ে তিলাওয়াত না হওয়াই মূলনীতির দাবি। কিন্তু যেহেতু সূরা নাজম ও আলাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সিজদা একাধিক রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত, সেহেতু নসের বর্তমানে যুক্তি অগ্রহণযোগ্য। কিন্তু সূরা হজ্জের শেষ স্থল এর পরিপন্থী। এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন রেওয়ায়াত প্রমাণিত নয়। তাছাড়া, সাহাবায়ে কিরামের আমলও বিভিন্ন রকম। অতএব যুক্তির অনুকূল বিষয়গুলোই গ্রহণযোগ্য হবে। সূরা হজ্জের এ স্থানটি নির্দেশস্থল হওয়ার কারণে যৌক্তিকভাবে এতে সিজদা নেই বলে প্রমাণিত। অতএব, ইমাম শাফিঈ র. এতে সিজদা কিভাবে প্রমাণ করবেন?

মোটকথা, হানাফীদের মতে মুফাসসালাতের, সূরায়ে সোয়াদে সিজদা আছে এবং সূরা হজ্জের শেষে সিজদা নেই। উপরোক্ত বিবরণের আলোকে এটাই প্রমাণিত। এ হিসেবে পূর্ণ কুরআনে কারীমে সিজদা হবে মোট ১৪টি।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নুখাবুল আফকার ঃ ৩/৪০০, ৪০১, বযলুল মাজহুদ ঃ ২/৩১৪, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ ১/২২৩, আওজাযুল মাসালিক ঃ ২/৩৭৬, ৩৭৭, নববী ঃ ১/২১৫, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/৩৬২-৩৮৭।

## باب الرجل يد خل المسجد يوم الجمعة

## والامام يخطب هل ينبغى ان يركع ام لا ؟

## অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের খুতবাকালে শুক্রবার দিনে কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে তার জন্য নামায পড়া উচিত কিনা?

জুম'আর খুতবার মাঝে কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে তার জন্য তাহিয়্যাতুল মসজিদের দু'রাক'আত নামায পড়া কিরূপ? এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, জুমুআর খুতবার সময় তাহিয়্যাতুল মসজিদ ছাড়া সব ধরনের সুন্নত ও নফল পড়া নাজায়েয। তাছাড়া, এ সময় মসজিদে উপবিষ্ট ব্যক্তির জন্য সর্বসম্মতিক্রমে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করা নিষেধ। মতবিরোধ শুধু সে ব্যক্তির জন্য, যে খুতবার মাঝে মসজিদে প্রবেশ করে, সে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়তে পারবে কিনা?

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. ইমাম শাফিঈ, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, আবু সাওর, ইবনুল মুনযির, হাসান বসরী, মাকহুল, ইবনে উয়াইনা র. প্রমুখের মতে তার জন্য তাহিয়্যাতুল মসজিদ দু'রাক'আত পড়া মুস্তাহাব। তবে নেহায়েত সংক্ষেপে হওয়া চাই, যাতে খুতবা শুনতে পারে। গ্রন্থকার فذهب قوم الخ দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা, মালিক, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, ইবরাহীম নাখঈ, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন, সুফিয়ান সাওরী, কাতাদা র. এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবী ও তাবিঈর মতে খুতবার মাঝে আগন্তুকের জন্য তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়াও নাজায়েয ও মাকরূহে তাহরীমী। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وامَّا وجهُ النظرِ فاِنَّا رأينَا هُم لاَيختلفونَ اَن مَن كانَ فِى المسجدِ قبلَ ان يخطبَ الامامُ فاِنَّ خطبةَ الامامِ تمنعهُ مِن الصلٰوةِ فيصيرُ بِها فِي غيرِ موضعِ صلٰوةٍ، فالنظرُ على ذالكَ ان يكونَ كذالكَ داخلُ المسجدِ والامامُ يخطبُ داخلاً لهُ فِى غيرِ موضعِ صلٰوة فلاَينبغىْ اَن يصلِّى وَقدرأينَا الاصلَ المتفقَ عليهِ اَن الاوقاتِ التى تَمنعُ مِن الصلٰوةِ يستوىْ فِيهاَ مَن كانَ قَبلها فِى المسجدِ ومَن دَخلَ فيهَا المسجدَ فِى منعِها ايَّاهمَا مِن الصلٰوةِ، فلمَّا كانتِ الخطبةُ تمنعُ مَن كانَ قبلَها فِى المسجدِ عنِ الصلٰوةِ، كانتْ كذالكَ ايضًا تَمنعُ مَن دخلَ المسجدَ بَعدَ دخولِ الامامِ فِيهَا مِن الصلٰوةِ، فهٰذا هوَ وجهُ النظرِ فِى ذالكَ وهوَ قولُ ابىْ حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمهمُ اللهُ۔

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

যারা ইমামের খুতবা শুরুর পূর্বে মসজিদে থাকে, তাদের জন্য খুতবা আরম্ভ হওয়ার পরে নামায পড়া সর্বসম্মতিক্রমে নিষিদ্ধ। অতএব, যে ব্যক্তি খুতবার সময় মসজিদে প্রবেশ করবে, তার জন্য নামায পড়া নিষিদ্ধ হবে। কারণ, আমরা একটি সর্বসম্মত মূলনীতি লক্ষ্য করছি যে, নামাযের নিষিদ্ধ ওয়াক্তগুলোতে পূর্ব থেকেই যারা মসজিদে অবস্থান করছেন এবং যারা সে নিষিদ্ধ ওয়াক্তগুলোতে মসজিদে প্রবেশ করেন, তাদের সবার জন্য হুকুম সমান। অতএব, জুম'আর খুতবার সময় উপস্থিত লোকদের জন্য যেহেতু নামায নিষেধ, অতএব এ সময়ে প্রবেশকারীদের জন্যও নামায নিষেধ হবে। কাজেই জুম'আর খুতবার সময় কারও জন্যই তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া জায়েয হতে পারে না।

فَاِن قالَ قائلٌ فقدْ رُوِىَ عَن رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ انه قالَ اِذا دخلَ احدُكم المسجدَ فلايجلسُ حتى يركعَ ركعتينِ وذكرفِى ذالكَ ماحدّثنا يونسُ قالَ ثنَاسفيانُ عن عثمانَ بنِ ابىْ سليمانَ سمعَ عامرَبنَ عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ رضـ يخبرُ عن عَمرِ وبنِ سُلَيْمٍ عَن ابِى قتادةَ رضـ اَن النبىَّ صلى اللهُ عليهِ وسلّمَ قالَ اِذَا دخَلَ احدُكمُ المسجدَ فَلْيركَعْ ركْعَتَينِ قبلَ ان يجلسَ حدثنَا ربيعُ الجِيزىُّ قالَ ثنَا ابو الاسودِ قالَ ثنَا بكرُبن مضرَ عن ابنِ عجلانَ عن عامرِ بنِ عبدِ اللهِ فذكرَ باسنادهِ مثلَه احدثنَا صالحُ بنُ عبدِ الرحمٰنِ قَالَ ثنَا القعنبىُّ قالَ ثنَا مالكٌ عن عامرِ بنِ عبدِ اللهِ فذكرَ باسنادٍ مثلَه حدثَنا ابنُ مرزوقٍ قالَ ثنَا ابُو اسحاقَ الضريرُ يعنىْ ابراهيمَ بنَ زكريَاقالَ ثنَا حمادُ بنُ سلمةَ عن سهيلِ بنِ ابى صالحٍ عن عامرِ بنِ عبد اللهِ بنِ الزبيرِ عن عَمرِ وبنِ سليمٍ الزرقىِّ رضـ عَن جابرِ بنِ عبد اللهِ عنِ النبىِّ صلى اللهُ عليهِ وسلّمَ مثلَه فهٰذا يدلُّ علٰى اَنه يَنبغىْ لِمن يدخلُ المسجدَ والامامُ يخطبُ اَلّايجلسَ حتّى يُصلىَ ركعتينِ ـ

قِيلَ لهٗ مَا فى ذالكَ دليلٌ علٰى ماذكرتَ اِنما هٰذا علٰى مَن دخلَ المسجدَ فِى حالٍ يحلُّ فيهَا الصلوةُ ليسَ علٰى مَن دخلَ المسجدَ فِى حالٍ لايحلُّ فيهَا الصلوةُ ـ اَلاترٰى اَن مَن دخلَ المسجدَ عندَ طلوعِ الشمسِ وعندَ غروبِها او فِى وقتٍ مِّن هٰذه الاوقاتِ المنهىِّ عنِ الصلٰوةِ فيهَا اَنه لاينبغىْ لهٗ ان يصلِّىَ واَنَّهٗ ليسَ مِمن امرهٗ النبىُّ صلى اللهُ عليهِ وسلّم ان يصلىَ ركعتينِ لِدخولهِ المسجدَ لِانه قد نُهِىَ عنِ الصلٰوةِ حينئذٍ فكذالكَ الذىْ

دخلَ المسجدَ والامامُ يخطبُ ليسَ لهُ أن يصليَ وليسَ ممن امرَه النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ بذالكَ وانمَا دخلَ فِى امرِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّمَ الذى ذكرتَ كلُّ مَن لوكانَ فِى المسجدِ قبلَ ذالكَ فاثرَ أن يصليَ كانَ له ذلكَ،فامَّا مَن لوكانَ فِى المسجدِ قبلَ ذالكَ لم يكنْ لهُ ان يصليَ حينئذٍ فَليسَ بداخلٍ فى ذالكَ وليسَ له يُصلِّى قياساً علىٰ ماذكرنَا مِن حكمِ الاوقاتِ المنهيِّ عَن الصلوٰة فِيها التى وَصفْنَا ـ

**একটি প্রশ্নোত্তর ঃ**

উপরোক্ত রেওয়ায়াতগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয়, কেউ যদি ইমামের খুতবা দান কালে মসজিদে প্রবেশ করে, তার জন্য উচিত বসার পূর্বে দুরাকাত নামায আদায় করা।

এর উত্তরে বলা হবে, উপরোক্ত হাদীসে তাহিয়্যাতুল মসজিদের দু'রাকাত নামায সে ব্যক্তির জন্য যে এরূপ কোন সময় মসজিদে প্রবেশ করে যখন নামায আদায় করা জায়েয হয়। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি এরূপ সময়ে মসজিদে প্রবেশ করে যখন নামায আদায় করা জায়েয নয়, তার জন্য নয়।

আপনি কি লক্ষ্য করেন নি? যখন কেউ সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয় অথবা নামাজের কোন নিষিদ্ধ সময়ে মসজিদে প্রবেশ করে, তার জন্য সে সময় নামায আদায় করা অনুচিত এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করার পর দু'রাক'আত আদায়ের নির্দেশ দেননি। কারণ, এ সময় তাঁর জন্য নামায আদায় করা নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে যে ইমামের খুতবা দান কালে মসজিদে প্রবশে করবে, তার জন্য নামায পড়া জায়েয নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাকে নামায পড়ার নির্দেশ দেননি। বস্তুতঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ সে ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, যে এর পূর্বে মসজিদে ঢুকে নামায আদায়ে প্রত্যাশী হয়। সে নামায আদায় করতে পারবে। ইমামের খুতবা দানকালে কেউ প্রবেশ করলে, সে তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায আদায় করতে পারবে না। যেমন আদায় করতে পারবে না সে ব্যক্তি যে নামাযের নিষিদ্ধ ওয়াক্তে মসজিদে প্রবেশ করে।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নুখাবুল আফকার ঃ ৩/৭, বযলুল মাজহুদ ঃ ২/১৯১, নববীঃ ১/২৮৭, নায়লুল আওতার ঃ ৩/১৩৩, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/৩৯৫-৪০৮।

## باب الرجل يدخل المسجد والامام فى صلٰوة الفجر ولم يكن ركع ايركع اولايركع؟

## অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের ফজর নামাযে রত অবস্থায় কেউ সুন্নত না পড়ে এলে তা আদায় করতে পারে কিনা?

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

মসজিদে ফজরের জামা'আত শুরু হয়ে গেছে, এমতাবস্থায় কেউ যদি সুন্নত না পড়ে মসজিদে প্রবেশ করে, তবে কি সে ফজরের সুন্নত পড়তে পারে?

১. ইমাম শাফিঈ, আহমদ ইবনে হাম্বল, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন, ইবরাহীম নাখঈ, সাঈদ ইবনে জুবাইর, আতা ইবনে আবু রাবাহ, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, উরওয়া ইবনে যুবাইর র. প্রমুখের মতে জামাআত শুরু হওয়ার পর সুন্নতের নিয়ত বাধা জায়েয নেই। চাই সুন্নত থেকে অবসর হওয়ার পর ফরযের উভয় রাক'আত পাওয়ার আশা হোক না কেন। কিন্তু যদি কেউ পড়ে নেয়, তবে মাকরূহে তাহরীমী সহকারে সুন্নত সহীহ হয়ে যাবে। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম মালিক র. এর মতে জামাআত শুরু হওয়ার পর ফজরের সুন্নত পড়তে পারে। তবে দু'টি শর্তে–

(১) সুন্নত মসজিদের বাইরে পড়বে, চাই মসজিদ বড় হোক বা ছোট হোক।

(২) সুন্নতের পর উভয় রাক'আত জামাআতের সাথে পাওয়ার আশা থাকবে।

যদি মসজিদের ভিতরে সুন্নত পড়ে অথবা প্রথম রাকআত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা হয় তবে সুন্নতের নিয়ত বাধা নিষিদ্ধ ও মাকরূহ।

৩. ইমাম আবু হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, আওযাঈ, সুফিয়ান সাওরী র. প্রমুখের মতে এক রাক'আত পাওয়ার আশা হলেও সুন্নত পড়তে পারে। মসজিদ ছোট হলে, ভিতরে পড়তে পারবে না, বরং বাইরে পড়বে। মসজিদে বড় হলে ভিতরেই পড়তে পারে, তবে কাতারের সাথে মিলে পড়তে পারবে না। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَاَمَّا مِن طريقِ النظرِ فاِنَّ الذينَ ذهبُوا اِلى انهُ يدخلُ فِى الفريضةِ ويَدَعُ الركعتينِ فاِنهم قَالُوا تَشاغلُه بالفريضةِ اولٰى مِن تشاغلِه بالتطوعِ وَافضلُ، فكانَ مِن الحجةِ عليهم فِى ذالكَ انَهُم قَد اَجمعُوا انه لَو كانَ فِى منزلهِ فعلِمَ دخولَ الامامِ فى صلٰوةِ الفجرِ انَه ينبغىْ لهٗ ان يركعَ ركعتَى الفجرِ مَالم يخَف فوتَ صلٰوةِ الامامِ، فاِن خافَ فوتَ صلٰوةِ الامامِ لم يصلِّهما،لِانه اِنما اُمر اَن يجعلَهمَا قبلَ الصلٰوةِ ولم يُجمعُوا اَن تشاغلَه بالسعىِ الٰى الفريضةِ افضلُ مِن تشاغلِه بِهما فِى منزلِه وقَد اكِّدتَا مالَم يُوَكَّدْ شئٌ مِنَ التطوُّعِ، وروِىَ انَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ لَم يكنْ على شئٍ مِن التطوعِ ادومَ مِنه عليهِمَا - واَنه قالَ لا تَتركُوهُما وانِ طردتْكم الخيلُ، فلمَّا كانتَا قد اُكِّدتَا هٰذا التاكيدَ ورغِّبَ فيهمَا هذا الترغيبَ ونُهِىَ عن تركِهما هٰذا النهىَ وكانتَا تركعانِ فِى المنازلِ قبلَ الفريضةِ كانتَا ايضًا فِى النظرِ اَن تُركعَا فِى المساجدِ قبلَ الفريضةِ قياسًا ونظرًا علىٰ ماذكرنَا مِن ذالكَ وهوَ قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمَهم اللهُ تعالىٰ -

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, ফজরের জামাআত শুরু হয়ে গেছে এবং সে ঘরে থাকা অবস্থায় জামাআত শুরু হয়েছে বলে জানতেও পেরেছে, এমতাবস্থায় যদি জামাআত ছুটে যাওয়ার আশংকা না হয়, তবে তার জন্য সুন্নত পড়া উত্তম। নফলগুলোর মধ্যে ফজরের সুন্নতের ব্যাপারে অনেক তাকিদ এসেছে। বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সুন্নত যতটা দায়েমীভাবে আদায় করতেন ততটা অন্য কোন নফলের ব্যাপারে করতেন না। তিনি আরও ইরশাদ করেছেন, তোমাদেরকে ঘোড়া মাড়িয়ে ফেললেও এ দু'রাক'আত (সুন্নত) বর্জন কর না। যেহেতু ফজরের সুন্নতের এতটা তাকিদ করা হয়েছে এবং

জামাআত শুরু হওয়ার পর জামাআত ছুটে যাওয়ার আশংকা না হলে ঘরের মধ্যে সুন্নত পড়া সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয আছে, অতএব, মসজিদে পড়াও জায়েয হওয়া উচিত। যুক্তির দাবিও তাই।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নুখাবুল আফকার ঃ ৩/৩৭, বযলুল মাজহুদ ঃ ২/২৬৩, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ ১/২০৬, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/৪০৯-৪২২।

## باب الصلوة فى اعطان الابل

## অনুচ্ছেদ ঃ উটের বাথানে নামায পড়া

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, হাসান বসরী, আবু সাওর র. প্রমুখের মতে উটের বাথানে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী। বরং ইমাম আহমদ র. এর একটি রেওয়ায়াত অনুযায়ী নামায ফাসিদ হয়ে যায়। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. হানাফী, শাফিঈ, মালিকী বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে উটের বাথানে নামায পড়া বিনা মাকরূহ জায়েয। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وامَّا حكمُ ذالكَ مِن طريقِ النظرِ فَانَّا رأينَاهُم لايختلفونَ فِى مرابضِ الغنمِ اَن الصلوٰةَ فِيها جائزةٌ وانمَا اختلفُوا فِى اَعطانِ الابلِ، فقد رأينَا حكمَ لُحمانِ الابلِ كحكمِ لُحمانِ الغنمِ فِى طهارتِها ورأينَا حكمَ ابوالِهاكحكمِ ابوالِها فِى طهارتِهَا او نجاستِها فكانَ يجئُ فِى النظرِ ايضًا اَن يكونَ حكمُ الصلوٰةِ فِى موضعِ الابلِ كَهوَ فِى موضعِ الغنمِ قياسًا ونظرًا علٰى مَاذكرنَا وهٰذا قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمَهم اللهُ تعالٰى .

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

বকরির বাথানে বিনা মাকরূহে নামায পড়া জায়েয আছে। এ ব্যাপারে সবাই একমত। ইখতিলাফ হল, উটের বাথান সম্পর্কে। আমরা দেখি উট এবং বকরি

উভয়ের পক্ষে হুকুম সমান। উভয়টির গোশত পবিত্র। উভয়টির প্রস্রাবের হুকুমও সমান। যাদের মতে বকরির পেশাব পবিত্র, তাদের মতে উটের পেশাবও পবিত্র। যাদের মতে বকরির প্রস্রাব অপবিত্র তাদের মতে উটের প্রস্রাবও অপবিত্র। অতএব, যুক্তির দাবি হল, উভয়টি যেরূপভাবে অন্যান্য আহকামে সমান, এরূপভাবে নামাযের হুকুমেও বলা যায়– যেরূপভাবে বকরির বাথানে নামায পড়া বিনা মাকরূহ জায়েয, এরূপভাবে উটের বাথানেও বিনা মাকরূহ জায়েয।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বযলুল মাজহুদ ঃ ১/২৭৭, নায়লুল আওতার ঃ ২/২২, নুখাবুল আফকার ঃ ৩/১০৮, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/৪৩৬-৪৪৪।

## باب الامام يفوته صلوة العيد هل يصليها من الغد ام لا ؟

## অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের ঈদের নামায ছুটে গেলে পরবর্তী দিন তা আদায় করবে কিনা?

### মাযহাবের বিবরণ ঃ

ঈদুল ফিতরের চাঁদের খবর দেরিতে আসার কারণে অথবা অন্য কোন ওজরে ঈদের দিন সময়মত অর্থাৎ, সূর্য হেলার পূর্বে আদায় করতে না পারলে পরবর্তীতে কাযা করতে পারবে কিনা? এটি একটি বিতর্কিত মাসআলা।

১. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, ইবনুল মুনযির র. প্রমুখের মতে যদি কোন ব্যক্তি বিনা ওজরে ঈদুল ফিতরের নামায না পড়ে, তবে এর কোন কাযা নেই। যদি ভীষণ ওজরের কারণে সব মানুষ ইমাম সহকারে নামায পড়তে না পারে, তবে পরবর্তী দিন সূর্য হেলার পূর্বে তা কাযা করতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় দিনের পর এরূপভাবে ঈদের দিন সূর্য হেলার পর কাযা করার অবকাশ নেই। গ্রন্থকার فذهب قوم الخ দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম শাফিঈ, মালিক, আবু সাওর র. প্রমুখের মতে যদি ঈদের দিন সূর্য হেলার পূর্বে ঈদুল ফিতরের নামায না পড়ে, চাই ওজরের কারণে হোক, অথবা বিনা ওজরে তবে এরপর কাযা করার কোন অবকাশ নেই। গ্রন্থকার وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইমাম তাহাভী র. এর ঝোঁকও এদিকে। তিনি যুক্তির আলোকে এটি প্রমাণ করেছেন। তাছাড়া, ইমাম তাহাভী র.এ উক্তিটি ইমাম আবু হানীফা র. এর দিকেও সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। কিন্তু আবু হানীফা র. এর এ উক্তি কোথাও পাওয়া যায় না যে, ওজর সত্ত্বেও দ্বিতীয় দিনে কাযা জায়েয নেই। বরং হানাফী গ্রন্থরাজিতে ব্যাপক আকারে হানাফীদের মাযহাব এটাই বর্ণিত আছে যে, ওজর

হলে ঈদুল ফিতরের নামায দ্বিতীয় দিনে কাযা করতে পারে। অতএব ইমাম আবু হানীফা র. এর দিকে ইমাম তাহাভী র. এর এই সম্বন্ধ হানাফী গ্রন্থরাজির পরিপন্থী। হতে পারে, ইমাম সাহেব র. থেকে ব্যাপক আকারে নাজায়েযের কোন রেওয়ায়াত ইমাম তাহাভী র. এর নিকট পৌঁছেছিল। যার ফলে, তিনি এই সম্বন্ধ করেছেন। এই অনুচ্ছেদের শেষে ইমাম তাহাভী র. এর উক্তি وهو قول ابى حنيفة فيما رواه عنه بعض الناس الخ এদিকেই ইঙ্গিতবাহী।

وقد روٰى هٰذا الحديثَ شعبةُ عَنْ اِبى بشرٍ كمَا رواه سعيدُ ويحيٰى لَاكما رَواه عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ حدثَنا ابنُ مرزوقٍ قالَ ثنَا وهبٌ قالَ ثنَا شعبةُ عن ابى بشرٍ قالَ سمعتُ ابا عميرِ بنِ انسٍ رض ح وحدَّثنا ابنُ مرزوقٍ قالَ ثنَا ابُو الوليدِ قالَ ثنَا شعبةُ عن ابىْ بشرٍ فذكرَ مثلَه باسنادِه غيرَ انَّه قَالَ وامرَهم اِذا اصبحُوا اَن يخرجُوا اِلى مصلَاهم فمعنٰى ذالكَ ايضًا معنٰى ماروٰى يحيٰى وسعيدٌ عَن هشيمٍ وهٰذا هو اصلُ الحديثِ. ولمَّالم يكنْ فِى الحديثِ مَا يدلُّ علىٰ حكمِ مَااختلفُوا فِيه مِن الصلوٰةِ فِى الغدِ فنظرنَا فِى ذٰلكَ فرأينَا الصلواتِ علىٰ ضربينِ فمِنهَا ماالدهرُ كلُّه لهَا وقتٌ غيرُ الاوقاتِ التىْ لايصلّٰى فيها الفريضةُ، فكانَ مافاتَ منهَا فِى وقتِه فالدهرُ كلُّه لَهاوقتٌ يقضٰى فِيه غيرُما نهىَ عن قضائِها فِيه مِن الاوقاتِ، ومِنها مَاجعلَ لهٗ وقتٌ خاصٌّ ولَم يجعلْ لِاحدٍ ان يصليهُ فِى غيرِ ذالكَ الوقتِ مِن ذالكَ الجمعةُ حكمَهااَن يصلى يوَم الجمعةِ مِن حينَ تزولُ الشمسُ الى ان يدخلَ وقت العصر، فاذا خرج ذالك الوقت فاتت ولم يجز ان يصلى بعد ذالكَ فِى يومِها ذالكَ ولَافِيمَا بعدَه، فكانَ مالَايقضٰى فِى بقيةِ يومِه بعدَ فواتِ وقتِه لايقضٰى بعدَ ذالكَ ومَا يقضٰى بعدَ فواتِ وقتِه فِى بقيةِ يومِه ذلكَ قضِىَ مِن الغدِ وبعدَ ذالكَ.

وكلٌّ هٰذا مجمعٌ عليه وكانتْ صلوةُ العيدِ جعلَ لها وقتٌ خاصٌّ فِى يومِ العيدِ اخرهُ زوالُ الشمسِ، وكلٌّ قد اجمعَ على انها اِذا لم تصلَّ يومئذٍ حتىٰ زالتِ الشمسُ انها لاتصلّى فِى بقيةِ يومِها فلمَّا ثبتَ اَن صلوٰةَ العيدِ لاتقضٰى بعدَ خروجِ وقتِها فِى يومِها ذالكَ ثبتَ اَنهَا لاتقضٰى بعدَ ذالكَ فِى غدٍ ولا غيرِه، لِانَّا رأينا مَاللذِىْ فاتَه اَن يقضِيَهُ مِن غدِ يومِه جائزلَهُ انَ يقضِيَه مِن بقيةِ اليومِ الذِىْ وقتُه فِيه ومَا ليسَ لِلذِىْ فاتَه اَن يقضِيَهُ مِن بقيةِ يومِه ذالكَ فليسَ لهُ ان يقضِيَهُ مِن غدِه، فصلوٰةُ العيدِ كذالكَ لَمَّاثبتَ اَنها لاتقضٰى اِذا فاتتْ فِى بقيةِ يومِها ثبتَ اَنها لَاتقضٰى فِى غدِه فهٰذا هُو النظرُ فِى هٰذا البابِ وهوَ قولُ ابى حنيفةَ رحمَهم اللهُ تعالٰى فِيمَا رواهُ عندَ بعضِ الناسِ ولَم نجِدْه فِى روايةِ ابى يوسفَ عنه هٰكذا كانَ فى روايةِ احمدَ رحمهُم اللهُ تعالى -

**দ্বিতীয় দলের প্রমাণ ও নজরে তাহাভী ঃ**

এখান থেকে অনুচ্ছেদের শেষ পর্যন্ত রেওয়ায়াতের আলোকে যৌক্তিক প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। সেটি হল– হাফিজে হাদীসগণের রেওয়ায়াতে ঈদের নামাযের উল্লেখ নেই। গর হাফিজে হাদীসের রেওয়ায়াতে নামাযের উল্লেখ রয়েছে। অতএব, হাফিজে হাদীসগণের রেওয়ায়াতের প্রাধান্য হওয়া উচিত।

অতঃপর আমরা দেখি নামায দুই প্রকার–

১. সর্বদা সর্বকালে যে নামায আদায় করা হয়, এর ওয়াক্ত নিষিদ্ধ সময়গুলো ছাড়া সবই। অতএব, যদি আসল ওয়াক্ত ছুটে যায়, তবে নিষিদ্ধ ওয়াক্ত ছাড়া সব ওয়াক্তে তা কাযা করা জায়েয। যেমন– পঞ্চ নামায।

২. বিশেষ ওয়াক্তের নামায, যেগুলো সর্বদা প্রতিদিন পড়া হয় না। বরং এগুলোর জন্য বিশেষ ওয়াক্ত রয়েছে, সে ওয়াক্ত ছাড়া অন্য কোন সময় এগুলো পড়া জায়েয নেই। অতএব, যদি ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়, তবে সেদিন ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার পর কিংবা এরপর অন্য কোন দিন এগুলো কাযা করা জায়েয নেই। যেমন– জুম'আর নামায। অতএব, যদি এটাকে জুম'আর দিন স্বীয় ওয়াক্ত মত

পড়তে না পারে, তবে ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার পর সে শুক্রবার দিনে, এর পরবর্তী অন্য কোন দিনে এর কাযা করতে পারে না।

এবার উভয় প্রকার নামায সম্পর্কে চিন্তা-ফিকিরের পর আমাদের সামনে একটি মূলনীতি স্পষ্ট হয় যে, যে নামায স্বীয় ওয়াক্তে ছুটে যায় এবং সে দিনের বাকি অংশে তা কাযা করা জায়েয নয়– সেটা এ দিনের পর অন্য কোন দিনেও কাযা করা জায়েয নেই। যেমন– জুম'আর নামায দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। কারণ, সূর্য হেলার পর থেকে আসরের সময় আসা পর্যন্ত যদি তা আদায় না করা হয়, তবে না দিনের বাকি অংশে তা কাযা করা জায়েয, না এর পরবর্তী অন্য কোন দিন। আর যে নামায স্বীয় ওয়াক্তে ছুটে গেলে সে দিনের বাকি অংশে কাযা করা জায়েয আছে, সেটি সে দিনের পর অন্য কোন দিনেও কাযা করা জায়েয আছে। যেমন– পাঞ্জেগানা নামায। এগুলোর কোন একটি নামাযও যদি স্বীয় ওয়াক্তে ছুটে যায়, তবে এ দিনের বাকি অংশে এবং তৎপরবর্তী অন্য কোন দিনেও কাযা করা জায়েয আছে। এসব বিষয় সর্বসম্মত, কারও কোন মতবিরোধ নেই।

এবার দেখুন ঈদুল ফিতরের নামায। এই নামাযটি সর্বদা পড়া হয় না। বরং এর জন্য একটি বিশেষ ওয়াক্ত রয়েছে। অর্থাৎ, শাওয়ালের ১ম তারিখ সূর্য সাদা আলোকোজ্জ্বল হওয়ার পর থেকে সূর্য হেলা পর্যন্ত।

যদি আসল ওয়াক্ত অর্থাৎ, সূর্য হেলার পূর্বে এর নামায না পড়তে পারে, তবে সূর্য হেলার পর দিনের বাকি অংশে তা কাযা করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয নেই। অতএব, উপরোক্ত মূলনীতির আলোকে এর কাযা এ দিনের পর অন্য কোন দিনেও জায়েয না হওয়া উচিত। কারণ, আসল ওয়াক্ত ছুটে যাওয়ার পর যে নামাযের কাযা সেদিনের বাকি অংশে জায়েয নেই, সে নামাযের কাযা পরবর্তী কোন দিনেও জায়েয নয়। অতএব, ঈদুল ফিতরের কাযা ১ম দিনের বাকি অংশের মত দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিনেও জায়েয হবে না।

**সতর্কবাণী ঃ**

ওজরের কারণে ঈদুল ফিতরের নামায পড়া না গেলে শুধু দ্বিতীয় দিনে তা কাযা করা যায়। এটাই হানাফীদের মাযহাব। যদিও এ বিষয়টি উপরোক্ত মূলনীতির খেলাফ, তা সত্ত্বেও এর বৈধতার ব্যাপারে সুস্পষ্ট হাদীস রয়েছে। কাজেই সুস্পষ্ট হাদীসের বিপরীতে ইমাম তাহাভী র. এর এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নুখাবুল আফকার ঃ ৩/১১৭, ১১৮, বযলুল মাজহূদ ঃ ২/২১১, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/৪৪৫-৪৫২।

## باب الصلوة فى الكعبة

## অনুচ্ছেদ ঃ কাবা শরীফে নামায পড়া

কাবা ঘরে নফল নামায পড়া সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। অবশ্য ফরযের ব্যাপারে বিতর্ক আছে।

১. ইমাম মালিক, আহমদ ইবনে হাম্বল র. এবং কোন কোন আহলে জাহিরের মতে কাবা ঘরের ভিতরে ফরয নামায পড়া জায়েয নেই। কারণ, কাবা ঘরের দিকে ফিরে নামায পড়ার নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ রয়েছে- فولوا وجو هكم شطره। গ্রন্থকার فذهب قوم الخ দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন। পক্ষান্তরে, ভেতরে নামায পড়লে কাবা ঘরের কোন অংশকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে হয়।

২. ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, সুফিয়ান সাওরী র. বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে কাবা ঘরের ভিতরেও নফলের ন্যায় ফরয নামায পড়া জায়েয আছে। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وامّا حكمُه مِن طريقِ النظرِ فِان الذينَ ينهَونَ عنِ الصلوٰةِ فِيه اِنمَا نَهوا عَن ذالكَ لِاِن البيتَ كلَّه عندَهم قِبلةٌ قالُوا فَمن صلّى فِيه فقدْ استدبرَ بعضَه فهوَ كمستدبرٍ بعضَ القبلةِ، فلَا تُجزيه صلاتُه ـ

**একটি প্রশ্ন ঃ**

ইমাম তাহাভী র. এর পক্ষ থেকে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। এর সারনির্যাস হল, কাবা ঘরের ভিতর ফরয নামায পড়তে যারা নিষেধ করেন, তাদের এ নিষেধের কারণ হল, তাদের মতে পূর্ণ কাবা ঘর কিবলা। অতএব, নামাযের সময় পূর্ণ কাবা ঘর সম্মুখে রাখা জরুরি। ভিতরে নামায পড়লে কাবা ঘরের কোন অংশ সামনে থাকবে, আবার কোন অংশের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে হবে। আর কাবা ঘরকে পিছ দিয়ে নামায হতে পারে না।

فكانَ مِن الحجةِ عَليهِم فِى ذالكَ انّا رأينَا مَن استدبرَالقبلةَ اَو ولّيهَا يمينَه او شمالَه اَن ذالكَ كلَّه سواءٌ واَن صلاتَه لاتُجزيه وكانَ مَن صلّى مستقبلَ جهةٍ من جهاتِ البيتِ اجزأتْه الصلوٰةُ باِتفاقِهم وليسَ هُوَ فى ذالكَ مستقبلَ جهاتِ البيتِ كلِّها ـ

لِانَّ مَا عنْ يمينِ مَا استقبلَ مِن البيتِ ومَا عنِ يسارِه ليسَ هوَ مستقبلَه وكمَا كانَ لم يتعبدْ باستقبالِ كلِّ جهاتِ البيتِ فِى صلاتِه وانِما تعبدَ باستقبالِ جهةٍ من جهاتِه فلايضُره تركُ استقبالِ مَا بقِىَ مِن جهاتِه بعدَها كانَ النظرُ علىٰ ذالكَ ان مَن صلّى فيهِ فقدِ استقبلَ احدىٰ جهاتِه واستدبرَ غيرَها فمَا استدبرَ مِن ذالكَ فهوَ فى حكمِ مَا كانَ عن يمينِ مااستقبلَ مِن جهاتِ البيتِ وعن يسارِه اِذا كانَ خارجًا مِنه فثبتَ بذالكَ ايضا قولُ الذينَ اجازُوا الصلٰوةَ فِى البيتِ وهوَ قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمهمُ اللهُ تعالىٰ -

**যৌক্তিক প্রমাণ ও উত্তর ঃ**

ইমাম তাহাভী র. বলেন, তাদের এ প্রমাণ সহীহ নয়। কারণ, আমরা দেখি, কেউ পূর্ণ কিবলাকে নিজের পিছন দিকে অথবা, ডান বা বাম দিকে রেখে নামায পড়লে, তার নামায সহীহ হয় না। যদি কেউ কাবা ঘরের বাইরে কাবার কোন অংশের দিকে ফিরে নামায পড়ে এবং পূর্ণ কাবা সামনে না রাখে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার নামায হয়ে যাবে। অথচ সে এমতাবস্থায় সমস্ত দিক সামনে রাখেনি। কারণ, সে কাবার কোন অংশ সামনে রেখেছে, তার ডান ও বাম দিক সামনে রাখেনি, তাছাড়া শরীয়ত কাবা ঘরের প্রতিটি অংশ ও প্রতিটি দিককে সামনে রাখার দায়িত্ব অর্পণ করেনি। বরং কোন এক অংশ অথবা কোন একটি দিক সামনে রাখলেই নামায সহীহ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। অতএব, এদিকে লক্ষ্য করলে যুক্তির দাবি হল, যে ব্যক্তি কাবা ঘরের ভিতরে এর কোন অংশ সামনে রাখে আর কোন অংশ পিছনে থেকে যায়, তবে তার নামাযও সে ব্যক্তির ন্যায় সহীহ হয়ে যাবে, যে কাবার বাইরে কাবার কোন অংশ ও কোন দিককে সামনে আর অপরদিককে ডানে এবং বামে রেখে নামায পড়েছে। অতএব, কাবা ঘরের ভিতরে নামায না জায়েয হওয়ার ব্যাপারে তাদের পেশকৃত যৌক্তিক প্রমাণ ঠিক নয়। বরং কাবার ভিতরে ফরয, নফল সর্বপ্রকার নামাযই যুক্তির আলোকে জায়েয।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নুখাবুল আফকার ঃ ৩/১২৮, নববী ঃ ১/৪২৮, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/৪৫২-৪৬১।

## باب من صلى خلف الصف وحده

## অনুচ্ছেদ ঃ যে কাতারের পিছনে একাকী নামায পড়ে

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, ইবরাহীম নাখঈ, হাসান ইবনে সালিহ, ওয়াকী', আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা, হাম্মাদ, ইবনে হাযম র. এবং আহলে জাহির প্রমুখের মতে জামা'আত অবস্থায় কাতারের পিছনে একা দাড়িয়ে নামায পড়লে তা সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যাবে। গ্রন্থকার فذهب قوم الخ দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ, মালিক, আওযাঈ, হাসান বসরী, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, সুফিয়ান সাওরী র. বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে, কাতারের পিছনে একাকী নামায পড়লে নামায ফাসিদ হবে না। অবশ্য এরূপ করা মাকরূহ। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

فَإِن قَالَ قَائِلٌ فَمَا مَعنٰى قولِه ولَا تعُد؟ قِيل له ذالكَ عندَنا يحتملُ معنيينِ يَحتملُ ولا تعُد اَن تركعَ دونَ الصفِّ حتّٰى تقومَ فِي الصفِّ كمَا قد روٰى عنهُ ابُو هريرةَ رض حدثَنا ابنُ ابى داوٗدَ قالَ ثنَا المقدميُّ قالَ حدثنِى عمرُ بن عليٍّ قالَ ثنَا ابنُ عجلانَ عنِ الاعرجِ عَن ابِى هريرةَ رض قالَ قالَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم إذا اتىٰ احَدُكم الصلٰوةَ فلا يَركعْ دونَ الصفِّ حتّٰى يأخذَ مكانَه مِن الصفِّ ويحتملُ قولُه ولا تعُد اى ولَا تعُد اَن تسعٰى اِلى الصلٰوة سعيًا يَحفزُك فيه النفَسُ كمَا قدجاءَ عنهُ فِى غيرِ هٰذا الحديثِ ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

যুক্তির দাবী হল, যে কাতারের পিছনে একাকী নামায পড়ে তার নামায সহীহ হবে। কারণ, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কোন কাতারে নামায শুরু করে আর তাঁর সামনের কাতারে তার বরাবর এক ব্যক্তির স্থান খালি হয়ে যায়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে এ ব্যক্তির জন্য আগে যেয়ে এই স্থানে দাঁড়ানো জায়েয আছে। এর ফলে তার নামায ফাসিদ হবে না। অতএব নিজের কাতার ছেড়ে সামনের

কাতারে গিয়ে পৌঁছলে উভয় কাতারের মাঝে যে স্থান থেকে চলে যাবে এ স্থানটি কাতার নয়। এটি সফে অন্তর্ভুক্ত নয়। রবং কাতারের বাইরে। অতএব মুসল্লির কাতার ব্যতীত অন্যত্র অবস্থান যদিও সামান্য সময়ের জন্য হোকনা কেন তার নামায ফাসিদের কারণ হয় না। অতএব, যদি কাতার ছাড়া অন্যত্র অবস্থান নামায ভঙ্গের কারণ হত তবে অবশ্যই এ ব্যক্তির নামায সহীহ হত না। যেরূপভাবে কোন ব্যক্তি নামায অবস্থায় কোন অপবিত্র স্থানে সামান্য সময়ের জন্য দাড়ালেও তার নামায ফাসিদ হয়ে যায়।

মোটকথা, এ ব্যক্তির জন্য যেহেতু নিজের কাতার ছেড়ে সামনে অগ্রসর হলে দুই কাতারের মাঝে সফ ছাড়া অন্যত্র অবস্থান নামায ভঙ্গের কারণ হয় না, সেহেতু যে ব্যক্তি কাতারের পিছনে একাকী নামায পড়ে তাঁর কাঁতার ছাড়া অন্যত্র অবস্থানও নামায ভঙ্গের কারণ হবে না। যুক্তির দাবী অনুসারে তাই প্রমাণিত হয়।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বযলুল মাজহুদ ঃ ১/৩৬৫, নুখাবুল আফকার ঃ ৩/১৫০, ১৫১, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/৪৬১-৪৭৫।

باب الرجل يدخل فى صلوة الغداة فيصلى منها ركعة ثم تطلع الشمس۔

## অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের নামাযের এক রাক'আত পড়ার পর যদি সূর্যোদয় ঘটে

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

যদি কেউ ফজরের নামায শুরু করে, অতঃপর এক রাক'আত পড়ার পরেই সূর্যোদয় ঘটে, তবে এই ব্যক্তি দ্বিতীয় রাক'আত পড়ে নামায পূর্ণ করবে, না কি সূর্যোদয়ের কারণে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে? এ বিষয়ে মতানৈক্য আছে।

১. হযরত ইমাম শাফিঈ, মালিক, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ র. প্রমুখের মতে এরূপ ব্যক্তি দ্বিতীয় রাক'আত পড়ে এমতাবস্থায় নামায পূর্ণ করবে। সূর্যোদয়ের কারণে তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে না। গ্রন্থকার فذهب قوم الخ দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ র. প্রমুখের মতে নামাযের মাঝে সূর্যোদয় ঘটলে তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। وخالفهم فى ذالك اخرون। দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

**ইমামত্রয়ের প্রমাণ ঃ**

ইমামত্রয় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি হাদীস প্রমাণরূপে পেশ করেন–

من ادرك من صلوة الغداة ركعة قبل ان تطلع الشمس فليصل اليها اخرى ـ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে সুস্পষ্ট ভাষায় সূর্যোদয়ের পর দ্বিতীয় রাক'আত পড়ে নামায পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

✪ ইমাম তাহাভী র. তার প্রমাণ রদ করার জন্য উত্তর দিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও ঠিক দ্বি-প্রহরের সময় নামায পড়তে নিষেধ করেছেন– روى عن عبد الله (اى ابن مسعود رض) انه قال ـ كنا ننهى عن الصلوة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار ـ অতএব, হতে পারে, ইমামত্রয়ের من ادرك من صلوة الغداة ركعة الخ রেওয়ায়াত তিন ওয়াক্ত সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞার হাদীসের পূর্বেকার। আর এই নিষেধের হাদীসের কারণে বৈধতা রহিত হয়ে গেছে।

✪ ইমামত্রয় বলতে পারেন, তিন ওয়াক্তে নামাযের নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীসটি নফলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ফরযের ক্ষেত্রে নয়। অতএব, সূর্যোদয়ের সময় নফল নামায নিষিদ্ধ হতে পারে, ফরয নয়। যেমন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত নামায পড়তে নিষেধ করেছেন এবং এই নিষেধাজ্ঞা সর্বসম্মতিক্রমে নফল সংক্রান্ত, ফরয সংক্রান্ত নয়। এ দুটি সময়ে যেমন– ফরয পড়া নিষেধ নয়, এরূপভাবে উপরোক্ত তিন ওয়াক্তেও ফরয পড়া নিষেধ হবে না। কাজেই ফজর নামাযের মাঝে সূর্যোদয় ঘটলে নামায ফাসিদ হবে না। কারণ, ফজর নামায তো ফরয, নফল নয়।

✪ ইমাম তাহাভী র. উত্তর দিয়েছেন, এই তিন ওয়াক্তের নিষেধাজ্ঞাকে নফলের সাথে বিশেষিত করা সহীহ নয়। বরং এতে ফরযগুলোও অন্তর্ভুক্ত। কারণ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যোদয়ের সময় ফরয নামাযও আদায় করেননি। লাইলাতুত তা'রীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত সাহাবায়ে কিরামসহ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এমতাবস্থায় সূর্যোদয় ঘটে যায়, সূর্যের উত্তাপের কারণে তাঁরা জাগ্রত হন এবং তৎক্ষণাৎ ওযু করে নামাযের জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নামায পড়তে নিষেধ করেছেন এবং তিনি সে স্থান থেকে রওয়ানা হয়ে যান। এরপর সূর্য যখন উপরে উঠে যায়, তখন থেমে ফজরের নামায জামা'আত সহকারে আদায় করেন। অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায

দেরিতে পড়েন। সূর্যোদয়ের সময় তা পড়া থেকে বিরত থাকেন। অথচ স্বযং তাঁর ইরশাদ রয়েছে–

من نسى صلوة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها ـ

অর্থাৎ, যদি ভুলে অথবা ঘুমের কারণে নামায না পড়া হয়, তবে স্মরণ হওয়া মাত্রই তা যেন পড়া হয়।

এতে বুঝা গেল, তিন ওয়াক্তের নিষেধে ফরযও অন্তর্ভুক্ত। অন্যথায় তিনি লাইলাতুত তা'রীসের (শেষ রাত্রে অবতরণের রজনীর) এ ঘটনায় ঘুম থেকে জাগ্রত হয়েই নামায আদায় করতেন। সূর্যোদয় এর জন্য প্রতিবন্ধক হতে পারত না। উপরোক্ত আলোচনার পর এবার আমরা ইমাম তাহাভী র.-এঃযুক্তি পেশ করছি।

وَامَّا وجهُه مِن طريقِ النظرِ فانَّا رأينَا وقتَ طلوعِ الشمسِ اِلى ان ترفع وقتا قد نهى عن الصلوة فيه فاردنا ان ننظر فى حكم الاوقاتِ التىْ ينهٰى فيهَا عنِ الاشياءِ هلْ يكونُ على التطوعِ مِنها دونَ الفرائضِ او علٰى ذٰلكَ كلّه، فرأينَا يومَ الفطرِ ويومَ النحرِ قَد نهٰى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ عن صيامِهمَا وقامتِ الحجةُ عنهُ بذالكَ، فكانَ ذالك النهىُ عِندَ جميعِ العلماءِ علٰى اَن لاَيُصامَ فِيهِما فريضةً ولاتطوعً فكانَ النظرُ على ذالكَ فِى وقتِ طلوعِ الشمسِ الذىْ قَدنُهِى عنِ الصلٰوةِ فِيه اَن يكونَ كذالكَ لاَتصلّٰى فيه فريضةً ولا تطوعً وكذالكَ يَجىءُ فِى النظرِ عندَ غروبِ الشمسِ ـ

وَاَمَّا نَهىُ النبىِّ صلى اللهُ وسلمَ عن الصلٰوةِ بعدَ العصرِ حتّٰى تغيبَ الشمسُ وبعدَ الصبحِ حتّٰى تطلعَ الشمسُ، فانَّ هٰذينِ الوقتينِ لم ينهَ عن الصلٰوةِ فِيهما للوقتِ وإنَما نهٰى عن الصلٰوةِ فيهِما للصلٰوةِ وقَد رأينَا ذالكَ الوقتَ يجوزُ لِمن لم يصلِّ اَن يصلىَ فِيه الفريضةَ والصلوةَ الفائتةَ، فلمَّا كانتِ الصلٰوةُ هِى الناهيةُ وهى فريضةً كانتْ اِنما ينهٰى عن غيرِ شكلِها مِنَ النوافِلِ لاَعنِ الفرائِضِ وهٰذا قولُ ابىْ حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمهمُ اللهُ تعالى ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

সূর্যোদয়ের সময়টিতে একটি ইবাদত অর্থাৎ, নামায আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। এবার আমাদের লক্ষ্য করা উচিত যে, অন্যান্য নিষিদ্ধ ওয়াক্তে শুধু নফল নাকি ফরয সম্পর্কেও নিষেধাজ্ঞা এসেছে? আমরা লক্ষ্য করে দেখছি, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। এতে ফরয, নফল সবই অন্তর্ভুক্ত। এসব দিবসে যেরূপভাবে নফল রোযা রাখা নিষেধ সেরূপভাবে সর্বসম্মতিক্রমে ফরয রোযা রাখাও নিষেধ। অতএব, রোযা রাখার জন্য নিষিদ্ধ সময়গুলোতে যেমন– ফরয ও নফল রোযা উভয়টি নিষিদ্ধ এরূপভাবে নামাযের জন্য নিষিদ্ধ সময়গুলোতেও ফরয, নফল উভয় প্রকার নামায নিষিদ্ধ হবে। এ কারণে সূর্যোদয়ের সময় ফরয, নফল সব নিষিদ্ধ হবে। শুধু নফল নামায বিশেষভাবে নিষেধ বলা ঠিক হবে না।

এবার আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং ফজরের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়গুলোতে নফলের সাথে নিষেধাজ্ঞা বিশেষিত থাকা, ফরয তার অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারণ নয়, বরং নামাযের কারণে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কারণ, আমরা দেখছি, আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় ফরয নামায– যেমন-আসরের নামায কেউ এখনও পড়ল না, তাহলে পূর্ণ ওয়াক্তের কোন একাংশে পড়তে পারবে। এরূপভাবে অন্য কোন ফরয নামাযও কাযা করতে পারবে।

এমনিভাবে ফজরের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ে ফরয নামায আদায় করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ফজর এখন পর্যন্ত পড়ল না, এটি অথবা অন্য কোন ছুটে যাওয়া ফরয নামায তখনকার কোন সময়ে আদায় করতে পারে।

এই দুটি সময়ে ফরয নামায সর্বসম্মতিক্রমে নিষিদ্ধ নয়। এটা এর প্রমাণ, এসব ওয়াক্তের কারণে নিষেধাজ্ঞা আসেনি। অর্থাৎ, সত্ত্বাগতভাবে সময়ের মধ্যে কোন অসুবিধা নেই, বরং এই নিষেধ নামাযের কারণে। বস্তুত এই নামায অর্থাৎ, ফজর ও আসর ফরযের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, এটা সমজাতীয় নামায ফরযগুলোর জন্য প্রতিবন্ধক হতে পারে না। বরং অসমজাতীয় তথা নফল নামাযের জন্য প্রতিবন্ধক হতে পারে।

মোটকথা, এ দুটি সময়ে যেহেতু নিষেধাজ্ঞা এসেছে নামাযের কারণে, আর প্রথমোক্ত তিনটি সময়ের নিষেধাজ্ঞা ওয়াক্তের কারণে, কাজেই এই তিনটি ওয়াক্তকে সে দুটি ওয়াক্তের উপর কিয়াস করে এগুলোর নিষেধকে নফলের সাথে কিয়াস করা এবং সূর্যোদয়ের সময় ফজর নামায পূর্ণ করার অনুমতি দান বিশুদ্ধ হতে পারে না। আমাদের বক্তব্য তাই। যুক্তির আলোকে তাই প্রমাণিত হয়।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বযলুল মাজহুদ ঃ ১/২৪০, নববী ঃ ১/২২১, নুখাবুল আফকার ঃ ৩/১৭১, ফয়যুল বারী ঃ ২/১১৮, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/৪৭৫-৪৮৮।

## باب صلوة الصحيح خلف المريض

## অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর পিছনে সুস্থ ব্যক্তির নামায

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

যদি কেউ ওজরের কারণে বসে নামায পড়ে, তবে সুস্থ লোকদের জন্য তার পিছনে ইকতিদা করা সহীহ কিনা? যদি সহীহ হয়, তবে মুকতাদী দাঁড়িয়ে ইকতিদা করবে, না বসে?

১. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, আওযাঈ, হাম্মাদ, ইবনুল মুনযির, দাউদ জাহিরী র. প্রমুখের মতে মুকতাদীদের জন্য বসে ইকতিদা করা জরুরি, দাঁড়িয়ে ইকতিদা করা জায়েয নেই। অবশ্য যদি নামাযের মাঝে ইমাম বসে যায়, তবে মুকতাদীর জন্য বসা জরুরি নয়, বরং দাঁড়িয়ে থাকবে। ইমাম তাহাভী র. فذهب قوم الخ দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ, আবু ইউসুফ, সুফিয়ান সাওরী, আবু সাওর, র. এর মতে মুকতাদীদের ওজর না হলে দাঁড়িয়ে ইকতিদা করা জরুরি। বসে ইকতিদা করা সহীহ নয়। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. ইমাম মালিক, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ও আমির শা'বী র. প্রমুখের মতে বসে নামায আদায়কারী ইমামের পিছনে সুস্থ ব্যক্তির ইকতিদা সহীহ নেই, বরং তার জন্য কোন সুস্থ ইমাম তালাশ করা জরুরি। ইমাম না পেলে একাকী নামায পড়বে। وقال محمد بن الحسن يقول لايجوز لصحيح ان ياتم بمريض الخ দ্বারা তাঁদেরকে বুঝানো হয়েছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে ইকতিদা সহীহ, তবে ধরনের ক্ষেত্রে মতবিরোধ আছে।

وَامَّا وجهُه مِن طريقِ النظرِ فانَّا رأينَا الاصلَ المجتمعَ عليهِ اَن دخولَ المأمومِ فِى صلٰوةِ الامامِ قَدْ يوجبُ فرضًا علٰى المأمومِ ولم يكنْ عليهِ قبلَ دخولِهِ ولم نَره يُسقِطُ عنهُ فرضًا قَد كانَ عليهِ قبلَ دخولِهِ، فمِن ذالكَ اَنا رأينَا المسافرَ يدخلُ فى صلٰوةِ المقيمِ فيجبُ عليهِ ان يصلىَ صلوةَ المقيمِ اربعًا ولم يكنْ ذالكَ واجبًا عليهِ قبلَ دخولِهِ معهٗ وَانما اَوجبَه عليه دخولَه معهٗ وَرأينَا مقيمًا

لَودخلَ فِى صلٰوةِ مسافرٍ صلّٰى بصلاتِه حتّٰى اِذا فرغَ اتٰى بتمامِ صلٰوةِ المقيمِ فلَم يسقُطْ عنِ المقيمِ فرضٌ بدخولِه مَعَ المسافرِ وكانَ فرضُه على حالِه غيرَساقِطٍ منهُ شئٌ فالنظرُ علٰى ذالكَ اَن يكونَ كذلكَ الصحيحُ الذىْ كانَ عليهِ فرضُ القيامِ اِذاَ دخَل مَعَ المريضِ الذىْ قد سقَطَ عَنه فرضُ القيامِ فِى صلاتِه اَن لاَيكونَ ذٰلك الدخولُ مسقِطاً عَنه فرضًا كانَ عليهِ قبلَ دخولِه فِى الصلٰوةِ ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

একটি সর্বসম্মত মূলনীতি হল, মুকতাদী ইমামের সাথে নামাযে অন্তর্ভূক্ত হলে, কোন কোন সময় এমন ফরয আবশ্যক হয়, যে ফরয এ মুকতাদীর উপর ইমামের সাথে নামাযে দাখিল হওয়ার পূর্বে ছিল না। কিন্তু কখনও কখনও এরূপ ফরয বাতিলের কারণ হয় না, যা ইমামের সাথে নামাযে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বে তার উপর আবশ্যক ছিল। যেমন– মুসাফির যখন মুকীম ইমামের পিছে ইকতিদা করে, তখন তার উপর চার রাক'আত পূর্ণ করা আবশ্যক হয়। অথচ ইকতিদার পূর্বে তার উপর চার রাক'আত আবশ্যক ছিল না, বরং শুধু দুই রাক'আত ছিল। আর যখন মুকীম ব্যক্তি কোন মুসাফির ইমামের ইকতিদা করে, তখন মুকীমের চার রাক'আতে হ্রাস পায় না, বরং ইকতিদার পূর্বে তার উপর যেমন চার রাক'আত ফরয ছিল, ইকতিদার পরেও সে চার রাক'আতই অবশিষ্ট থাকবে। ইমামের অবসর গ্রহণের পর স্বীয় অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করা আবশ্যক হয়ে যায়।

অতএব, যেহেতু মূলনীতি হল, মুকতাদীর উপর ইকতিদার কারণে কোন অতিরিক্ত ফরয আবশ্যক হতে পারে, কিন্তু মুকতাদী থেকে এরূপ কোন ফরয বাদ পড়ে না, যা তার উপর ইকতিদার পূর্বে আবশ্যক ছিল। এই মূলনীতির দিকে লক্ষ্য করলে সুস্থ ব্যক্তির উপর যেহেতু কিয়াম তথা দাঁড়ানো ফরয, সেহেতু মাজুর উপবিষ্ট ইমামের ইকতিদার কারণে মুকতাদীর এই ফরয বাতিল হতে পারে না। এটাই যুক্তির দাবি।

فاِنْ قَالَ قائلٌ فاِنّا قدْ رأينَا العبدَ الذىْ لاَجمعةَ عليهِ يدخلُ فِى الجمعةِ فيُجزيهِ مِن الظهرِ ويسقُطُ عنهُ فرضٌ قد كانَ عليهِ قبلَ دخولِه مَع الامامِ فِيهَا قِيلَ لهٗ هٰذا يؤكّدُ مَا قلنَا وَذالكَ اَنّ

العبدَ لَم يَجِبْ عليهِ جمعةٌ قبلَ دخولِه فِيهَا فَلمَّا دخلَ فِيهَا مَعَ مَن هِي علَيه كَانَ دخولُه اِياهَا يُوجبُ عليهِ مَاهوَ واجبٌ علىٰ امامِه فصارَ بذٰلك اِذا وجَبَ عليهِ مَاهو واجبٌ علىٰ اِمامِه فِي حكمِ مسافرٍ لَاجُمعةَ عَليهِ دخلَ فِي الجمعةِ فقَد صارتْ واجبةً عليهِ لِوجوبِها علىٰ اِمامِه وصارتْ مُجزيةً عنهُ مِن الظهرِ لِانَّها صارتْ بدلاً مِنهَا فكذٰلكَ العبدُ لمَّا وجبتْ علَيه الجمعةُ بدخولِه فِيهَا اَجزأتْه مِن الظهرِ لِانها صارَت بدلاًمِنهَا ـ

فقَد ثبتَ بِماذكرْنَا اَن دخولَ الرجلِ فِي صلٰوةِ غيرِه قدْ يُوجبُ عليهِ مَالَم يكنْ واجبًا عليهِ قبلَ دخولِه فِيهَا ولا يسقُطُ عنهُ مَاكانَ واجبًا عَليهِ قبلَ دخولِه، فثَبتَ بذٰلكَ انَّ الصحيحَ الذىْ القيامُ فِي الصلٰوةِ واجبٌ عليهِ اِذاَ دخلَ معَ مَن قدْ سقَطَ عنهُ فرضُ القيامِ فِي صلاتِه لَم يكنْ يَسقُطُ عَنه بدخولِه مِن القيامِ مَاكانَ واجبًا عليهِ قَبلَ ذالكَ ـ

وهٰذا قولُ اَبي حنيفةَ وابى يوسفَ وكانَ محمدُ بنُ الحسنِ رح يقولُ لايجوزُ لصحيحٍ اَن يأتمَّ بِمريضٍ يصلِّى قاعدًا وانْ كانَ يركعُ ويَسجُدُ ويذهبُ اِلى انَّ ماكانَ مِن صلٰوةِ رسولِ اللّٰهِ صلى اللّٰهُ عليهِ وسلمَ قَاعدًا فِي مرضِه بالنَّاسِ وهُم قِيامٌ مخصوصٌ لِانه قدْ فعلَ فيهَا مَالايجوزُ لاحدٍ بعدَه اَن يفعلَه مِن اخذِه فِي القراءةِ مِن حيثُ انتهٰى اَبو بكرٍ رض وخروجِ ابى بكرٍ رض مِن الامامةِ الىٰ اَن صَارَ مأمومًافِي صلٰوةٍ واحدةٍ وهٰذا لاَيَجوزُ لاحدٍ مِنْ بَعدِه باتفاقِ المسلمينَ جميعًا فدلَّ ذٰلكَ علىٰ انَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللّٰهُ عليهِ وسلَّمَ قَد كانَ خصَّ فِي صلاتِه تلكَ بِمَا مَنعَ منه غيرَه ـ

**একটি প্রশ্ন ও এর উত্তর ঃ**

এই মূলনীতির উপর একটি প্রশ্ন হয় যে, গোলামের উপর জুম'আর নামায ফরয নয়, বরং তার উপর চার রাক'আত জোহরের নামায ফরয। এই গোলাম যখন জুম'আর ইমামের ইকতিদা করে, তখন এটা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়, তার উপর থেকে পূর্বের ওয়াজিব জোহরের নামায বাতিল হয়ে যায়। এতে বুঝা গেল, কোন কোন ফরয ইকতিদার কারণে মুকতাদী থেকে বাতিল হয়ে যায়। অতএব, অনুরূপভাবে আমরা বলব, সুস্থ ব্যক্তির উপর কিয়াম যে ফরয ছিল তা উপবিষ্ট ইমামের ইকতিদার কারণে বাতিল হয়ে যাবে। অতএব, উপরোক্ত মূলনীতি ও এর উপর নির্ভরশীল দাবি কোনটিই ঠিক থাকে না।

**উত্তর॥** এর উত্তর হল, এই প্রশ্ন উপরোক্ত মূলনীতিকে ভঙ্গ করে না বরং আরও মজবুত করে। কারণ, গোলামের উপর জুমআ ফরয ছিল না। কিন্তু যখন সে ইমামের ইকতিদা করল, তৎক্ষণাৎ তার উপর সেটি ফরয হয়ে গেল, যা ইমামের উপর ফরয ছিল অর্থাৎ, জুম'আর নামায। আমরা মূলনীতি বর্ণনা করেছিলাম, যে বিষয় মুকতাদীর উপর প্রথমে ফরয হয় না, সেটি ইকতিদার কারণে ফরয হতে পারে। কিন্তু যে জিনিস মুকতাদীর উপর প্রথম থেকেই ফরয, সেটি ইকতিদার কারণে বাতিল হতে পারে না।

সন্দেহ হতে পারে যে, গোলামের এই ইকতিদার কারণে জোহরের নামায তার থেকে বাতিল হয়ে যায়, যেটি ইকতিদার পূর্বে তার উপর আবশ্যক ছিল। এই সন্দেহের উত্তর হল, ইমামের ইকতিদার সাথে সাথেই এই গোলামের উপর জুম'আর নামায ফরয হয়ে গেল। পক্ষান্তরে, জুম'আর নামায জোহরের বদল, অতএব বদলের কারণে মূল জিনিসটি বাতিল হয়ে গেছে, ইকতিদার কারণে নয়। যেমন– মুসাফিরের উপর জুম'আর নামায ফরয নয়। কিন্তু ইকতিদার কারণে তার উপর এটা ফরয হয়ে যায়। যখন জুম'আর নামায ফরয হয়ে গেছে, যেটি জোহরের বদল, সেহেতু বদলের বর্তমানে আসল তথা জোহরের নামায তার থেকে বাতিল হয়ে যায়।

মোটকথা, জোহর বাতিল হওয়ার কারণ ইকতিদা নয়, বরং জোহরের বদল জুম'আর নামায পাওয়া যাওয়ার কারণে। অতএব, আমাদের মূলনীতি ও দাবি ঠিক। অর্থাৎ, উপবিষ্ট ইমামের ইকতিদার কারণে সুস্থ ব্যক্তির ফরয কিয়াম বাতিল হতে পারে না।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নুখাবুল আফকার ঃ ৩/২০১-২০৯, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/৪৮৯-৫০১।

## باب الرجل يصلى الفريضة خلف من يصلى تطوعا

## অনুচ্ছেদ ঃ নফল আদায় কারীর পিছনে ফরয নামায পড়া

### মাযহাবের বিবরণ ঃ

নফল নামায আদায়কারীর পিছনে ফরয নামায আদায়কারীর ইকতিদা সহীহ কিনা? বিষয়টি বিতর্কিত।

১. ইমাম শাফিঈ, আতা ইবনে আবু রাবাহ, তাঊস ইবনে কায়সান, সুলায়মান ইবনে হারব, দাঊদ জাহিরী র. প্রমুখের মতে নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর ইকতিদা সহীহ। ইমাম আহমদ র. থেকে এটি একটি রেওয়ায়াত। فذهب قوم الخ দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. হানাফী, মালিকী, ইবরাহীম নাখঈ, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, ইয়াহইয়া, আবু কিলাবা র. প্রমুখের মতে এরূপভাবে ইমাম আহমদ র. এর একটি রেওয়ায়াত অনুযায়ী নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর ইকতিদা সহীহ নয়। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وامَّا حكمُه مِن طريقِ النظرِ فاِنَّا قَدرأينا صلٰوةَ المأمومينَ مضمّنةً بِصلٰوةِ امامِهم بِصحتِها وفسادِها يوجبُ ذالكَ النظرُ الصحيحُ مِن ذالكَ اَنارأينَا الامامَ اِذا سهَاوجبَ علىٰ مَن خلفَه لسهوِهِ مَاوجبَ عَليه ولَو سَهَواهُم ولَم يسهَ هُو لَم يجِبْ عليهِم مَا يجبُ علىٰ الامامِ اِذا سهَا، فلمَّا ثبتَ اَن المأمومينَ يجبُ عليهِم حكمُ السهوِ لِسهوِ الامامِ وينتَفىْ عنهُم حكمُ السهوِ بانتفائِه عَنِ الامامِ ثبتَ اَن حكمَهم فِى صلاتِهم حكُم الامامِ فِى صلاتِه وكانَ صلاتُهم مضمنةً بِصلاتِه ولمَّا كانتْ صلاتُهم مضمّنَةً بصلاتِه لَم يَجُز اَنَ يكونَ صلاتُهم خلافَ صلاتِه فثَبتَ بذالكَ اَن المأمومَ لايجوزُ ان تكونَ صلاتُه خلافَ صلٰوة امامِهِ۔

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

মুকতাদীর নামায ইমামের নামাযের অধিভুক্ত। সহীহ ও ফাসিদ হওয়ার ক্ষেত্রে এটি ইমামের নামাযের অধীনস্থ। বিশুদ্ধ যুক্তির দাবিও তাই। এ কারণে যদি ইমামের ভুল হয়ে যায়, তবে মুকতাদীদের উপরও ইমামের সাথে সাথে সিজদায়ে সাহু আবশ্যক হয়ে যায়। আর যদি মুকতাদীদের ভুল হয়ে যায়, ইমামের ভুল না হয়, তবে ইমাম-মুকতাদী কারও উপর সিজদায়ে সাহু আবশ্যক হয় না। এতে বুঝা গেল, মুকতাদীদের নামায, ইমামের নামাযের অধীনস্থ। অতএব, মুকতাদীদের নামায ইমামের নামাযের খেলাফ হতে পারে না।

فَاِنْ قَالَ قائلٌ فَانّا قَدرَأيناهُم لَم يختلفوا اَن لِلرجلِ اَن يصلِّىَ تطوعًا خَلفَ مَن يصلِّىْ فريضةً، فلمّا كانَ المصلىْ تطوعًا يجوزُ اَن يأتمَّ بِمنْ يصلِّىْ فريضةً كانَ كذلكَ يجوزُ للمصلِّىْ فريضةً اَن يُصليَها خلفَ مَن يصلىْ تطوعًا۔

قِيلَ لَهٗ اَن سببَ التطوعِ هُو بعضُ سببِ الفريضةِ وذالكَ انَّ الذىْ يدخُلُ فى الصلٰوةِ ولاَ يُريدُشيئًا عنْ ذالكَ مِن نافلةٍ ولاَ فريضةٍ يكونُ بذالكَ داخلاً فِى نافلةٍ واِذاَ نوٰى الدخولَ فِى الصلٰوةِ ونوٰى الفريضةَ كانَ بذٰلكَ داخلاً فِى الفريضةِ فصاريَكونُ ذٰلكَ داخلاً فِى الفريضةِ بالسببِ الذىْ دَخلَ بِه فِى النافلةِ وبسبب اُخرَ، فلمّا كانَ ذالكَ كذٰلكَ كانَ الذىْ يُصلىْ تطوعًا وهُو يأتمُّ بُمصلٍّ فريضةً هُو فِى صلوٰةٍ لهٗ فى كلِّها امامٌ والذىْ يصلِّىْ فريضةً ويأتمُّ بِمنْ يُصلِّىْ تطوعًا هُو فِى صلوةٍ له فِى بعضِ سببِهَا الذىْ بِه دَخلَ فِيهَا امامٌ وليسَ لهٗ فِى بقيتِه امامٌ فلَم يَجُز ذالكَ۔

**একটি প্রশ্নোত্তর ঃ**

প্রশ্ন হতে পারে, ফরয আদায়কারীর পিছনে নফল আদায়কারীর ইকতিদা সর্বসম্মতিক্রমে সহীহ। অথচ এমতাবস্থায় মুকতাদীর নামায ইমামের নামাযের পরিপন্থী। কাজেই যেরূপভাবেই ফরয আদায়কারীর পিছনে নফল আদায়কারীর ইকতিদা সহীহ, এরূপভাবে নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর ইকতিদাও সহীহ হওয়া উচিত।

**উত্তর॥** এর উত্তর হল– নফল নামাযের কারণ ফরয নামাযের কারণের অংশ হয়ে থাকে। অতএব, নফল নামায শুধু নামাযে দাখিল হওয়ার কারণে সহীহ হয়ে যায়। নফলের নিয়ত করুক, অথবা ফরযের নিয়ত। কিন্তু ফরয নামায সহীহ হওয়ার কারণে শুধু নামাযে প্রবেশ করা যথেষ্ট নয়, বরং এর সাথে সাথে ফরযের নিয়ত করাও জরুরি। এতে প্রতীয়মান হয়, ফরয নামাযের জন্য নফলের কারণের সাথে সাথে অতিরিক্ত কারণের প্রয়োজন হয়। অতএব যদি নামায আদায়কারী ব্যক্তি কোন ফরয আদায়কারীর ইকতিদা করে, তবে সে এরূপ ইমামের ইকতিদা করল, যিনি সমস্ত কারণের সমন্বয়কারী অর্থাৎ ইমামের মধ্যে নামাযে প্রবেশ ও ফরযের নিয়ত উভয় কারণ বিদ্যমান। নফল আদায়কারীর জন্য শুধু নামাযে প্রবেশ করাই যথেষ্ট। কাজেই ফরয আদায়কারী ইমামের নামায সে নফল আদায়কারীর নামাযকে অন্তর্ভুক্ত করবে। আর যদি ফরয আদায়কারী ব্যক্তি কোন নফল আদায়কারীর ইকতিদা করে, তবে সে এরূপ ইমামের অনুসরণ করল, যার মধ্যে শুধু নামাযে প্রবেশ বিদ্যমান এবং এই মুকতাদীর জন্য নামাযে প্রবেশের সাথে সাথে ফরযের নিয়তেও ইমামের প্রয়োজন আছে। কাজেই এমতাবস্থায় মুকতাদী নামাযে প্রবেশের ক্ষেত্রে ইমাম পেয়েছে, কিন্তু ফরযের নিয়তের ক্ষেত্রে ইমাম পায়নি। কাজেই নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর ইকতিদা সহীহ হতে পারে না।

**দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ**

فان قال قائل الخ থেকে এক লাইনে আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। সেটি হল হযরত উমর রা. গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় নামায পড়িয়ে সে নামায দোহরিয়ে নেন। কিন্তু মুকতাদীগণ দোহরাননি। এতে বুঝা যায়, মুকতাদীদের নামায ইমামের নামাযের অধীনস্থ নয়।

**উত্তর ঃ** فقال مخالفهم انما فعل ذالك لانه لم يتيقن الخ থেকে প্রায় দশ লাইনে এর উত্তর দেয়া হয়েছে।

✪ সেটি হল হযরত উমর রা. এর অন্তরে নামাযের পূর্বে গোসল ফরয হওয়ার ইয়াকীন ছিল না। ফলে নিজের জন্য সতর্কতার দিক অবলম্বন করেছেন, অন্যদের জন্য নামায দোহরানোর নির্দেশ দেননি।

✪ তাছাড়া হযরত উমর রা. বলেন, اني قد احتلمت। অর্থাৎ, আমার সন্দেহ হল, যে নামাযের পূর্বে স্বপ্নদোষ হয়েছে কিনা এবং এ বিষয়টি আমি টের পাইনি। গোসল ছাড়াই নামায পড়ে ফেলেছি। অতঃপর যেখানে যেখানে

নাপাকির চিহ্ন আছে মনে হয়েছে কাপড়ের সে অংশটুকু আমি ধুয়ে ফেলেছি। সূর্য উপরে উঠার পর নামায দোহরিয়েছি। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, নামাযের পূর্বে হযরত উমর রা.-এর গোসল ফরয হওয়ার ইয়াকীন ছিল না। বরং সন্দেহ ছিল। মূলনীতি হল– ইয়াকীন সন্দেহের কারণে দুরীভূত হয় না।

✪ তাছাড়া এর উপর এটাও দলীল হতে পারে যে, ইমামের নামায ফাসিদ হলে মুকতাদীর নামায ফাসিদ হয়ে যায়। যেমন একবার হযরত উমর রা. মাগরিব নামাযে কিরাআত ভুলে গেছেন। ফলে তিনি নিজের ও সমস্ত মুকতাদীর নামায দোহরিয়েছেন। কারণ, তাঁর নামায ফাসিদ হওয়ার কারনে মুকতাদীদের নামায ও ফাসিদ হয়ে যায়। বস্তুতঃ কিরাআত বাদ দেয়ার কারনে নামায ফাসিদ হওয়ার বিষয়টি বিতর্কিত। আর পবিত্রতা বাদ দেওয়ার কারণে নামায ফাসিদ হওয়ার বিষয়টি সর্বসম্মত। যেহেতু বিতর্কিত বিষয়টিতে নামায দোহরিয়েছেন, অতএব সর্বসম্মত বিষয়টিতে উত্তম রূপেই নামায দোহরানো উচিত ছিল। যেহেতু হযরত উমর রা. গোসল ফরযের মাসআলায় নামায দোহরাননি, অতএব নামাযের পূর্বে গোসল ফরয হওয়ার বিষয়টি ইয়াকীনী ছিল না বলে অবশ্যই মেনে নিতে হবে।

**তৃতীয় প্রশ্ন ঃ**

فان قال قائل الخ থেকে প্রায় তিন লাইনে আরেকটি প্রশ্ন করা হয়েছে। সেটি হল হযরত উমর রা. থেকে এর পরিপন্থী বিবরণ রয়েছে। এক ব্যক্তি হযরত উমর রা.-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি নামাযে সম্পূর্ণরূপে কিরাআত পড়িনি। উত্তরে হযরত উমর রা. বললেন, তুমি কি রুকু সিজদা পূর্ণাঙ্গ করনি? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, পূর্ণাঙ্গ করেছি। তখন হযরত উমরা রা. বললেন, তাহলে তোমার নামায পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। এতে বুঝা যায়, নামাযে কিরাআত আবশ্যক নয়। অতএব আপনি কিরাআত সংক্রান্ত বিষয় দ্বারা যে প্রমাণ পেশ করেছেন সেটি বাতিল।

**উত্তর ঃ** قيل له قد روى هذا عن عمر رض من حيث ذكرتم الخ থেকে প্রায় ৭ লাইনে উত্তর দেয়া হয়েছে। সেটি হল, যে রেওয়ায়াত আমরা পেশ করেছি সেটির সনদ মুত্তাসিল, আর তোমাদের পেশকৃত হাদীসটির সনদ মুত্তাসিল নয়। অতএব, আমাদের রেওয়ায়াতটি উত্তম হবে। তাছাড়া যুক্তির দাবী হল, ইমামের নামায ফাসিদ হলে, মুকতাদীর নামায ফাসিদ হয়ে যায়। চাই মুকতাদী জানুক বাঅজানুক। যেহেতু হযরত উমর রা. জানতেন আমার নামায ফাসিদ হলে মুকতাদীদের নামাযও ফাসিদ হয়ে যাবে– এ মাসআলা জানা সত্ত্বেও হযরত উমর

রা. কর্তৃক মুকতাদীদেরকে নামায দোহরানোর ঘোষণা না দেয়া এর স্পষ্ট প্রমাণ যে, নামাযের পূর্বেকার স্বপ্নদোষ সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না। অন্যথায় অবশ্যই নামায দোহরানোর নির্দেশ দিতেন। অতএব ইমামের নামায ও মুকতাদীর নামাযের হুকুমে কোন পার্থক্য নেই। এটাই আমাদের আলিমত্রয়ের মাযহাব। এই উত্তরটির সমর্থন যুগিয়েছেন পাঁচজন বিশিষ্ট মনীষীর ফতওয়া দ্বারা وقد قال بذالك طاوس ومجاهد الخ থেকে অনুচ্ছেদের শেষ পর্যন্ত এ ফতওয়াগুলো উক্ত তাবিঈন থেকে বর্ণনা করেছেন।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বযলুল মাজহুদ ঃ ১/৩৩৪, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/৫০১-৫১৪।

## باب صلوة المسافر

## অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফিরের নামায

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

একটি সর্বসম্মত বিষয় হল, সফরের কারণে দু'রাক'আত ও তিন রাক'আত বিশিষ্ট নামাযে কসর হয় না এবং এ ব্যাপারেও সবাই একমত যে, চার রাক'আত বিশিষ্ট নামাযে সফরের কারণে কসর জায়েয, তবে মতানৈক্য হল, এ কসর আযীমত না রুখসত?

১. ইমাম শাফিঈ, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ্ র. প্রমুখের মতে কসর রুখসত, পূর্ণাঙ্গ আদায় আযীমত। ইমাম মালিক ও আহমদ র. এর একটি রেওয়ায়াতও অনুরূপ। ইমাম শাফিঈ র. এর মতে কোন কোন জায়গায় কসর উত্তম, আর কোন কোন স্থানে পূর্ণাঙ্গ আদায়। গ্রন্থকার فذهب قوم الخ দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, সুফিয়ান সাওরী, হাম্মাদ র. প্রমুখের মতে কসর আযীমত ও ওয়াজিব। এটা ছেড়ে পূর্ণাঙ্গ আদায় করা জায়েয নেই। এটিই ইমাম মালিক ও আহমদ র. এর একটি রেওয়ায়াত। মতানৈক্যের ফল হল, যদি কেউ সফরে চার রাক'আত পড়ে এবং প্রথম বৈঠক না করে, তবে শাফিঈ র. এর মতে তার নামায জায়েয হয়ে যাবে। কিন্তু হানাফীদের মতে তার নামায জায়েয হবে না। কারণ, দু'রাক'আতে বসা তার উপর ফরয ছিল। এটা সে তরক করেছে। দু'রাক'আতে বসা ফরয হওয়ার কারণ মুসাফিরের জন্য প্রথম বৈঠক নেই, বরং শেষ বৈঠক আছে, যা নামাযের ফরযের অন্তর্ভুক্ত। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইমাম তাহাভী র. যুক্তির আলোকে হানাফীদের উক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

وكانَ النظرُ عندنَا فِى ذالكَ انَّا رأينَا الفروضُ المجتمعَ عليهَا لابدَّ لِمن هِى عليه مِن اَن ياتىَ بِها ولا يكونَ له خيارٌ فِى اَن لايأتىَ بِما عليهِ مِنها وكانَ مااَجمعَ عليهِ اَن لِلرجلِ ان يأتىَ بِه اِن شاءَ وانِ شَاء لم يأتِ به، فهوَ التطوعُ اِن شاءَ فعلَه وان شاءَ تركه، فهذه هِى صفةُ التطوعِ ومالاَ بدَّ مِن الاتيانِ به فهوَ الفرضُ وكانتِ الركعتانِ لابدَّ من المجئ بِهما ومَا بعدهُما ففيه اختلافٌ، فقومٌ يقُولونَ لايَنبغىْ ان يؤتىٰ به وقومٌ يقولونَ للمسافرِ ان يجئَ به اِن شاءوَلهُ ان لايجئَ به، فالركعتانِ موصوفتانِ بصفةِ الفرضِ فِيهمَا فريضةٌ ومَا بعدَ الركعتينِ موصوفٌ بصفةِ التطوعِ فهو تطوعٌ۔

فثبتَ بذٰلكَ اَن المسافرَ فرضُه ركعتانِ، وكانَ الفرضُ على المقيمِ اربعًا فِيمَا يكونُ فرضُه على المسافرِ ركعتينِ فكمَا لاينبغىْ للمقيمِ ان يُّصلىَ بعدَ الاربعِ شيئًا مِن غيرِ تسليمٍ فكذلكَ لاينبغىْ لِلمسافرِ ان يصلىَ بعدَ الركعتينِ شيئًا بغيرِ تسليمٍ فهُذا هو النظرُ عندنَا فِى هذا البابِ وهو قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمهمُ اللهُ تعالى ۔

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

একটি সর্বসম্মত বিষয় হল, যার উপর কোন নামায ফরয, তার জন্য সে নামায এর মূল ধরনের উপর আদায় করা জরুরি। এর পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি করা কোনক্রমেই জায়েয নেই। যদি চার রাক'আত ফরয হয়, তবে চার রাক'আত। আর দু'রাক'আত ফরয হলে, দু'রাক'আত পড়াই আবশ্যক। বেশকম করার অধিকার তার নেই।

আর একটি সর্বসম্মত বিষয় হল, যে নামায আদায়ের ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে– ইচ্ছে করলে আদায় করবে, অন্যথায় আদায় করবে না– এটা ফরয নামায নয়, বরং নফল। বস্তুত মুসাফিরের জন্য দু'রাক'আত আদায় করা সর্বসম্মতিক্রমে আবশ্যক ও জরুরি। দু'রাক'আতের পর অতিরিক্ত দু'রাক'আত

সম্পর্কে মতবিরোধ হয়েছে। কেউ নিষেধ করেন, আবার কেউ ইখতিয়ার দেন যে, ইচ্ছে হলে বাকি দু'রাক'আতও আদায় করতে পারেন। এতে বুঝা গেল, মুসাফিরের উপর সর্বসম্মতিক্রমে শুধু দু'রাক'আতই ফরয, এর বেশি ফরয নয়। অন্যথায় যদি অতিরিক্ত দু'রাক'আতও ফরয হত, তবে এ দু'রাক'আত পড়া না পড়ার ইখতিয়ার মুসাফিরের জন্য হত না। মুসাফিরের জন্য ইখতিয়ার থাকাই অতিরিক্ত দু'রাক'আত ফরয না হওয়ার প্রমাণ।

সারকথা, যারা কসরকে রুখসত বলে পূর্ণাঙ্গ আদায়ের অনুমতি দেন, তাদের মতেও মূলত ফরয শুধু দু'রাক'আতই, এর চেয়ে বেশি নয়। যে সব নামাযে মুসাফিরের ফরয দু'রাক'আত, সেগুলোতে মুকিমের ফরয চার রাক'আত। কাজেই যেরূপভাবে মুকিমের জন্য সালামের পূর্বে স্বীয় চার রাক'আতের অতিরিক্ত আদায় করা জায়েয নেই, অনুরূপভাবে মুসাফিরের জন্য স্বীয় দু'রাক'আতের উপর বিনা সালামে আরও বাড়ানো জায়েয নেই, যুক্তির দাবি এটাই। বরং ফরযের পরিমাণেহ্রাস-বৃদ্ধির ইখতিয়ার মুসল্লির নেই।

যেহেতু কেউ কেউ কসরকে সফরের কোন কোন অবস্থার সাথে বিশেষিত করেন, সেহেতু তাদের বিপরীতে ইমাম তাহাভী র. এ ব্যাপারেও একটি যুক্তি পেশ করেন যে, সফর সাধারণভাবেই কসরের কারণ। চাই আনুগত্যের সফর হোক অথবা অবাধ্যতার। চাই মুসাফিরের সাথে সফরের পাথেয় থাকুক বা না থাকুক। চাই মুসাফির ভ্রমণ অবস্থায় থাকুক অথবা কোন জায়গায় অবস্থান করুক। তবে শর্ত হল, তার এই অবস্থান সফরের হুকুম থেকে যেন বের না করে। চাই এ মুসাফির কোন শহরে অবস্থান করুক বা শহর ছাড়া অন্যত্র।

সারকথা, চার রাক'আত বিশিষ্ট নামাযে কসর পড়ার হুকুম সাধারণ সফরের কারণে। সাধারণ সফরই ইল্লত বা সফরের কারণ। ইমাম তাহাভী র. এর উপর যুক্তি কায়েম করেছেন।

### ইমাম তাহাভী র. এর যুক্তি ঃ

ইমাম তাহাভী র. বলেন, মুকিমের উপর সর্বাবস্থায় নামায পূর্ণাঙ্গ আদায় করা আবশ্যক। চাই সে মুকিম ইবাদতে থাকুক বা অবাধ্যতায় অথবা অন্য কোন অবস্থায়, শহরে থাকুক অথবা বাইরে, ভ্রমণ অবস্থায় থাকুক কিংবা (বাড়িতে) অবস্থান করুক, তার উপর নামায পূর্ণাঙ্গ আদায়ের হুকুম সাধারণ ইকামতের কারণে। কাজেই পূর্ণাঙ্গ আদায়ের কারণ যেরূপ, সাধারণত ইকামত এরূপভাবে কসরের কারণও সাধারণ সফরই হবে। কাজেই কসরকে সফরের কোন অবস্থার

সাথে বিশেষিত করা ঠিক হবে না। মুকিমের উপর যেমন সর্বাবস্থায় নামায পূর্ণাঙ্গ আদায় করা জরুরি, মুসাফিরের উপরও সর্বাবস্থায় কসর করা আবশ্যক হবে।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য-ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/৫২১-৫৪৫, নুখাবুল আফকার ঃ ৩/২৫৩-২৫৫, মাআরিফুস সুনান ঃ ৪/৪৫৪, বযলুল মাজহুদ ঃ ২/২২৯, নায়লুল আওতার ঃ ৩/৭৬, নববী ঃ ১/২৪১, আওজাযুল মাসালিক ঃ ২/৬৩, ফয়যুল বারী ঃ ২/৩৯৫।

## باب الوتر يصلى فى السفر على الراحلة ام لا؟

## অনুচ্ছেদ ঃ সফরে বাহনের উপর বিতর নামায পড়বে কিনা?

### মাযহাবের বিবরণ ঃ

সফর অবস্থায় বাহনের উপর নফল নামায পড়া সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। অবশ্য বিতর নামায সম্পর্কে মতানৈক্য হয়েছে।

১. ইমাম শাফিঈ, মালিক ও আহমদ, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, আতা ইবনে আবু রাবাহ, হাসান বসরী, সালিম ইবনে আবদুল্লাহ র. প্রমুখের মতে যেহেতু বিতর নামায সুন্নত সেহেতু তার জন্য নফল নামাযের মত সফর অবস্থায় তা বাহনের উপর ইশারায় আদায় করাও জায়েয। গ্রন্থকার فذهب قوم الخ দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন, ইবরাহীম নাখঈ, উরওয়া ইবনে জুবাইর র. প্রমুখের মতে যেহেতু বিতর নামায ওয়াজিব, সেহেতু তাঁদের মতে এটা বাহনের উপর আদায় করা সহীহ নয়। যেমন সহীহ নয় ফরয নামায আদায় করা, বরং বাহন থেকে নেমে আদায় করতে হয়। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَقَد رأينَا الاصلَ المجتمعَ عليهِ ان الصلوٰةَ المفروضةَ ليسَ للرجلِ ان يصليَها قاعدًا وهو يطيقُ القيامَ وليسَ لهٗ ان يصليَها فى سفرِهٖ على راحلتِهٖ وهو يطيقُ النزولَ ورأينَا يصلِّى التطوعَ على الارضِ قاعدًا وهوَ يطيقُ القيامَ ويصليهِ فِى سفرِه علٰى راحلتِهٖ فكانَ الذى يصليْه قاعدًا وهو يطيقُ القيامَ هو الذىٗ يصليهِ فى السفرِ على راحلتِهٖ والذى لَايصليْهِ قاعدًا وهو يطيقُ

القيامَ هُوَ الذىْ لايصليهِ فى السفرِ على راحلتِه هٰكذا الاصولُ المتفقُ عليهَا ثم كانَ الوترُ باتفاقِهم لايصليهِ الرجلُ على الارضِ قاعدًا وهو يطيقُ القيامَ فالنظرُ على ذٰلكَ اَن لايصليَه فى سفرِه على الراحلةِ وهو يطيقُ النزولَ، فمِن هٰذه الجهةِ عندىْ ثبتَ نسخُ الوترِ على الراحلةِ وليسَ فِى هٰذا دليلٌ على انه فريضةٌ اوتطوعٌ وهٰذا قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمَهم اللهُ تعالىٰ ۔

### যৌক্তিক প্রমাণ ঃ

এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, দাঁড়াতে সক্ষম হলে বসে, অনুরূপভাবে বাহন থেকে নামা ও দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকলে বাহনের উপর থেকে নফল নামায পড়া জায়েয আছে, ফরয নামায পড়া জায়েয নেই। চিন্তার বিষয় হল, যে নামায দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকলেও বসে পড়া জায়েয আছে, সেটি বাহনের উপর পড়াও জায়েয আছে। যেমন– নফল নামায। বস্তুত: যে নামায দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বসে পড়া জায়েয নেই, সেটি বাহনের উপর পড়াও জায়েয নেই। যেমন– ফরয নামায। মূলনীতি এটাই।

এবার বিতরের নামাযের প্রতি লক্ষ্য করুন। দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকলে তা বসে পড়া সর্বসম্মতিক্রমে না জায়েয। বস্তুত যে নামায দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকলে বসে পড়া জায়েয নেই, সেটা বাহনের উপর পড়াও জায়েয নেই। কাজেই যুক্তির আলোকে বিতর নামায বাহনের উপর আদায় করা জায়েয নেই।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নুখাবুল আফকার ঃ ৩/৩২৯, বযলুল মাজহুদ ঃ ২/২৪১, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/৫৪৬-৫৫০।

## باب الرجل يشك فى صلوته فلا يدرى اثلاثا صلى ام اربعا

## অনুচ্ছেদ ঃ যার নামাযে সন্দেহ হয়, তিন রাক'আত পড়েছে না চার রাক'আত?

### মাযহাবের বিবরণ ঃ

যদি মুসল্লির নামাযে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, কয় রাক'আত নামায হল, যেমন– চার রাক'আত নামাযে তিন রাক'আত বা চার রাক'আত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হল, এমতাবস্থায় সে কি করবে? এ বিষয়ে মতবিরোধ হয়েছে।

১. ইমাম হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, কাতাদা, আতা ইবনে আবু রাবাহ, মা'মার র. প্রমুখের মতে নামাযের মধ্যে সন্দেহ হলে শুধু সিজদায়ে সাহু করাই যথেষ্ট। গ্রন্থকার فذهب قوم الخ দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম শাফিঈ, মালিক, আহমদ, আমির শা'বী, সাইব ইবনে ইয়াযীদ, সালিম ইবনে আবদুল্লাহ র. এর মতে নামাযের মাঝে সন্দেহ হলে কমের উপরই নির্ভর করা ওয়াজিব এবং সেসব জায়গাতে বসা জরুরি, যার সম্পর্কে শেষ রাক'আত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমনিভাবে সিজদায়ে সাহুও আবশ্যক। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, যুফার র. প্রমুখের মতে এই মাসআলাতে বিস্তারিত বিবরণ হল, যদি মুসল্লির এই সন্দেহ এই প্রথমবার হয়, তবে তার উপর পুনরায় নামায দোহরিয়ে পড়া ওয়াজিব। আর যদি সন্দেহ তার সব সময় হয়ে থাকে, তবে দোহরিয়ে পড়া ওয়াজিব নয়। বরং তার উচিত চিন্তা-ফিকির করা। প্রবল ধারণা যা হবে তার উপর আমল করবে। আর যদি কোন দিকেই প্রবল ধারণা না হয়, তবে কমের উপর নির্ভর করবে এবং শেষে সিজদায়ে সাহু করবে। তাছাড়া, কমের উপর নির্ভর করলে যে রাক'আত সম্পর্কে শেষ রাক'আত হওয়ার সম্ভাবনা, সেসব রাক'আতে বৈঠক করাও জরুরি। وقال اخرون الحكم فى ذالك ان ينظر المصلي الى اكبر رايه فى ذالك الخ দ্বারা তাঁদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইমাম তাহাভী র. এখানে ইমামত্রয় তথা শাফিঈ, মালিক ও আহমদ র. এর মতের সপক্ষে। তাঁর যুক্তি তাঁদের পক্ষে।

وامَّا وجهُ ذالكَ مِن طريقِ النظرِ فانَّا قد رأينَا الاصلَ المتفقَ عليهِ فِى ذٰلكَ اَن هٰذا الرجلَ قبلَ دخولهِ فِى الصلوةِ قد كانَ عليهِ اَن يأتىَ باربعِ ركعاتٍ، فلمَّا شكَّ فِى ان يكونَ جاءَ ببعضِها وجبَ النظرُ فِى ذالكَ ليعلمَ كيفَ كانَ حكمُه، فرأيناه لوشكَّ فِى اَن يكونَ قد صلّٰى لكانَ عليهِ اَن يصلىَ حتى يَعلم يقينًا انه قدْ صلّٰى ولاَيعملَ فى ذالكَ بالتحرّى فكانَ النظرُ علىٰ هٰذا اَن يكونَ كذلكَ هُوَ فِى كلِّ شيْءٍ مِن صلوتِه كانَ ذالكَ عليهِ فرضٌ وعليهِ اَن يأتىَ بِهِ حتّٰى يعلمَ يقينًا انه قد جاءَ بهِ۔

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

নামাযীর উপর নামাযে প্রবেশের পূর্বে যত রাক'আত ফরয থাকে, নামাযে প্রবেশ করার পরে তত রাক'আতই ফরয থাকে। এবার আমাদের দেখতে হবে, নামাযের মাঝে যদি রাক'আত সংখ্যায় সন্দেহ হয়, তবে এর হুকুম কি হতে পারে? লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, যদি কারও নামায পড়া ও না পড়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তবে তার উপর হুকুম হল, সে নামায দোহরিয়ে পড়া, যাতে নামায আদায়ের ইয়াকীন হয়ে যায়। এখানে শুধু চিন্তা-ফিকির করাই যথেষ্ট নয়। এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে যুক্তির দাবি হল, নামাযের প্রতিটি অংশ সুনিশ্চিতরূপে আদায় করা। বস্তুত এটা চিন্তা-ফিকিরের দ্বারা অর্জন হতে পারে না। বরং কমের উপর নির্ভর করলেই তা অর্জিত হতে পারে। কাজেই রাক'আত সংখ্যায় সন্দেহ হলে চিন্তা-ফিকিরের হুকুম হবে না বরং কমের উপর নির্ভরের হুকুম হবে।

فَان قالَ قائلٌ اِن الفرضَ عليهِ غيرُ واجبٍ حتى يَعلمَ يقيناً انه واجبٌ عليه ـ

قِيلَ له ليسَ هٰكذا وجدنَا العباداتِ كلَّها، لِانا قَدتعبَّدنا اَنه اِذااغمِىَ علينَا فِى يومِ ثلٰثينَ مِن شعبانَ فاحتملَ انَ يكونَ مِن رمضانَ فيجبُ علينَا صومُه واحتمل اَن يكونَ مِن شعبانَ فلاَيكونُ علينَا صومُه اَنه ليسَ علينَا صومُه حتّٰى نَعلمَ يقيناً اَنه مِن شهرِ رمضانَ فنصومُه ـ وكذالكَ رأينَا اٰخرَ شهرِ رمضانَ اِذا اغمِىَ علينَا فِى يومِ الثلٰثينَ فاحتملَ ان يكونَ مِن شهرِ رمضانَ فيكونُ علينَا صومُه واحتملَ اَن يكونَ مِن شوّال فلايكونُ علينَا صومُه امرنَا بِان نصومَه حتى نعلمَ يقينًا انه ليسَ علينَا صومُه فكانَ مَن دخلَ فى شيئٍ بيقينٍ لَم يخرجْ منهُ اِلاَّبيقينٍ ـ

فالنظرُ علىٰ ذالكَ اَن يكونَ كذلكَ مَن دخلَ فى صلاتِه بيقينٍ اَنَّها عَليهِ لم يحلَّ لهُ الخروجُ منهَا اِلا بيقينٍ اَنه قد حُلَّ له الخروجُ مِنها وقد جَاءَ مَا استشهدْنَا بِهِ مِن حكمِ الاغماءِ فِى شعبانَ وشهرِ رمضانَ عنِ النبىِّ صلى اللّٰهُ عليه وسلَّمَ متواترًا كَما ذَكرنَاه ـ

**একটি প্রশ্ন ও এর উত্তর ঃ**

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে, যেরূপভাবে নিশ্চিতরূপে আদায় না করলে কোন জিনিস আদায় হয় না, এরূপভাবে নিশ্চিতরূপে ফরয না হলে কোন জিনিস বান্দার উপর আবশ্যক হয় না। অতএব, যে রাক'আত সম্পর্কে সন্দেহ হবে, যেমন– তিন এবং চার রাক'আতের মধ্যে সন্দেহ হলে চতুর্থ রাক'আত সংশয়যুক্ত। এটি বান্দার উপর ফরয আছে কিনা এ ব্যাপারে ইয়াকীন নেই। কারণ, হতে পারে সে এটি আদায় করেছে, বস্তুত দৃঢ় বিশ্বাস বা ইয়াকীন না হলে, কোন জিনিস বান্দার উপর আবশ্যক হয় না। অতএব, ইয়াকীন না থাকার কারণে বান্দার উপর এ চতুর্থ রাক'আত ফরয নয়। কাজেই, সন্দেহ হলে চিন্তা-ফিকিরের মাধ্যমে চার রাক'আত হওয়ার ফয়সালা করলে অসুবিধা কি?

**উত্তর॥** সমস্ত ইবাদতের অবস্থা এমন নয়। কারণ, চাঁদ দেখার ব্যাপারে আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যদি ২৯শে শাবান কোন কারণে চাঁদ দেখা না যায়, তবে ৩০ তারিখে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে, শাবানের অন্তর্ভুক্তও হতে পারে, যাতে রোযা রাখা ফরয নয়, পহেলা রমযানও হতে পারে, যাতে রোযা রাখা ফরয। এমতাবস্থায় আমাদের উপর রোযা না রাখারই হুকুম। এমনিভাবে ২৯ রমযানে যদি কোন কারণে চাঁদ না দেখা যায়, তবে ৩০ তারিখ সম্পর্কে দুটি সম্ভাবনা আছে। এটি রমযান মাসের অন্তর্ভুক্তও হতে পারে, যাতে রোযা রাখা ফরয, আবার শাওয়ালের ১ম তারিখও হতে পারে, যাতে রোযা না রাখা জরুরি, বরং রোযা রাখা হারাম। এমতাবস্থায় আমাদের উপর হুকুম হল, রোযা রাখা, রোযা না রাখা নয়।

চাঁদ দেখার এ মাসআলা থেকে আমাদের সামনে একটি মূলনীতি স্পষ্ট হয়েছে যে, কোন জিনিসে নিশ্চিতরূপে প্রবেশের পর ইয়াকীন ছাড়া বের হওয়া জায়েয নেই। এ কারণে শাবানের রোযা ভঙ্গ অবস্থা থেকে রোযার দিকে এবং রমযানের রোযা অবস্থা থেকে রোযা ভঙ্গ ও ঈদের দিকে চলে আসা ইয়াকীন ছাড়া জায়েয নেই। কাজেই এ যুক্তির দাবি হল, নামাযের মাসআলাটিও অনুরূপ হবে। অর্থাৎ, নামাযেও নিশ্চিতরূপে প্রবেশের পর ইয়াকীন করা ব্যতীত বেরিয়ে আসা জায়েয হবে না। যখন ইয়াকীন হয়ে যাবে যে, আমার নামায পূর্ণ হয়ে গেছে তখন তা থেকে বেরিয়ে আসা জায়েয হবে। কাজেই তিন ও চার রাক'আতের মাঝে সন্দেহ হলে, যদি কমের উপর নির্ভর না করে এবং চিন্তা-ফিকির করে চার রাক'আত হওয়ার সিদ্ধান্ত দেয় তবে চার রাক'আত পূর্ণ হওয়ার ইয়াকীন ব্যতীত নামায থেকে বেরিয়ে আসতে হয়, যা উপরোক্ত

মূলনীতির পরিপন্থী। অতএব সন্দেহ হলে, কমের উপর নির্ভর করাই নির্ধারিত, যাতে নিশ্চিতরূপে নামায থেকে বের হতে হয়।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বযলুল মাজহুদ ঃ ২/১৪৮, নববী ঃ ১/২১১, নুখাবুল আফকার ঃ ৩/২৪৯-২৫৭, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/৫৫১-৫৬১।

## باب سجود السهو فى الصلوة هل هو قبل التسليم او بعده؟

## অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে সিজদায়ে সাহু সালামের পূর্বে না পরে?

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

সিজদায়ে সাহু সালামের পূর্বে হবে, না পরে– এ বিষয়ে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে। তবে এ ইখতিলাফটি শুধু উত্তমতার ক্ষেত্রে,সাধারণ বৈধতার ক্ষেত্রে কোন মতবিরোধ নেই।

১. ইমাম শাফিঈ, আওযাঈ, যুহরী, সা'দ ইবনে সাঈদ, রবী'আতুর রাই ও লাইস র. এর মতে সিজদায়ে সাহু সাধারণত সালামের পূর্বে। গ্রন্থকার فذهب الى هذه الاثار قوم الخ দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম মালিক, আবু সাউদ র. এর মতে সিজদায়ে সাহু নামাযের কোন ত্রুটির কারণে ওয়াজিব হলে, সে সিজদা হবে সালামের পূর্বে, আর কোন বৃদ্ধির কারণে ওয়াজিব হলে, সিজদা হবে সালামের পরে। এটাকেই القاف بالقاف والدال بالدال দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। অর্থাৎ, সালামের পূর্বে সিজদা হবে ত্রুটির কারণে, আর পরে হবে বৃদ্ধির কারণে। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, সুফিয়ান সাওরী, হাসান বসরী, ইবরাহীম নাখঈ, আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা র. প্রমুখের মতে সিজদায়ে সাহু সাধারণত সালামের পরে। দ্বিতীয় وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৪. ইমাম আহমদ র.-এর মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেসব ছুরতে সালামের পূর্বে সিজদা প্রমাণিত, সেখানে সালামের পূর্বে সিজদার উপর আমল করা হবে। যেখানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সালামের পর সিজদা প্রমাণিত, সেখানে সালামের পর সিজদা করবে। যেসব ছুরতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কিছু প্রমাণিত নেই, সেখানে ইমাম শাফিঈ র. এর মাযহাব অনুসারে সিজদায়ে সাহু হবে সালামের পূর্বে।

সারকথা, ইমামত্রয় কোন না কোন ছুরতে সিজদায়ে সাহু সালামের পূর্বে হওয়ার প্রবক্তা। কিন্তু হানাফীগণ সর্বাবস্থায় সালামের পর সিজদায়ে সাহুর প্রবক্তা। এ মাসআলায় ইমাম তাহাভী র. সিজদায়ে সাহু সালামের পরে প্রমাণ করেছেন। তাঁর যুক্তি দেখুন।

وامَّا وجهُه مِن طريقِ النظرِ فانَّا رأينا الرجلَ اذا سَها فِى صلاتِه لم يؤمرْ بالسجودِ للسهوِ ساعةً كانَ السهو وامرَ بتاخيره فقالَ قائلونَ الى مَا بعدَ السلامِ وقالَ اخرونَ الٰى اٰخرِصلاتِه قبلَ السلامِ وكانَ مَن تلاَ سجدةً فِى صلاتِه فَوجبَ عليهِ بتلاوتِه اَوذكرَ وهُو فِى صلاتِه اَن عليه لِما تقدمَ مِنهَا سجدةً انَه يؤمَر اَن ياتىَ بهَا حينئذٍ ولَا يومرُ بتاخيرِهَا اِلى غيرِ ذٰلكَ الموضوعِ مِن صلاتِه، فكانَ ما يجبُ مِن السجودِ فِى الصلوةِ يوتٰى به حيثُ وجبَ مِنها ولا يؤخرُ اِلى مَا بعدَ ذالكَ وكانَ سجودُ السهوِ قَد اجمعَ علٰى تاخيرِه عَن موضعِ السهوِ حتّٰى يمضىَ كلُّ الصلوةِ اِلا السلامَ، فانهٗ قد اختِلفَ فِى تقديمِه قبلَ السجودِ للسهوِ وفِى تقديمِ السجودِ للسهوِ عَليه، فكانَ النظرُ على مَاذكرنَا ان يكونَ حكمُ السلامِ المختلفِ فِيه حكمَ ما قبلَه مِن الصلوةِ المجتمعِ عليهِ فكمَا كانَ ذالكَ مقدمًا علٰى سجودِ السهوِ كانَ كذالكَ السلامُ ايضًا مقدمًا علٰى سجودِ السهوِ قياسًا ونظرًا على ماذكرنَا وهٰذا قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمَهم اللهُ تعالٰى ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

নামাযে কারও ভুল হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ সিজদা করার নির্দেশ নেই, বরং দেরি করতে হবে। অবশ্য কতটুকু সময় দেরি করবে এ বিষয়ে মতবিরোধ আছে। কেউ বলেন, সালামের পর পর্যন্ত দেরি করবে, কেউ বলেন, সালামের পূর্ব পর্যন্ত। তবে বাকি নামাযের সর্বশেষ পর্যন্ত।

এদিকে আমরা লক্ষ্য করছি, যদি কেউ নামাযের মধ্যে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে, তবে তার উপর তৎক্ষণাৎ সিজদা করা জরুরি, দেরি করা জায়েয নেই। ভুলে গেলে নামাযের মধ্যে যখনই স্মরণ হবে, তৎক্ষণাৎ সিজদা করার নির্দেশ রয়েছে। কাজেই সর্বসম্মতিক্রমে সিজদায়ে তিলাওয়াত তৎক্ষণাৎ

আদায়ের এবং সিজদায়ে সাহু দেরিতে আদায়ের নির্দেশ রয়েছে। অর্থাৎ, নামাযের কাজগুলো থেকে অবসর হওয়ার পর সিজদায়ে সাহু আদায় করবে। অবশ্য নামাযের কাজগুলো থেকে সালাম সম্পর্কে মতবিরোধ আছে যে, এরপরও দেরি করবে কিনা? যুক্তির দাবি হল, বিতর্কিত কাজ, তথা সালামকে সর্বসম্মত কাজের উপর কিয়াস করা। তথা যেরূপভাবে নামাযের সমস্ত কাজের পর সিজদায়ে সাহু করার নির্দেশ অনুরূপভাবে নামাযের একটি কাজ হল সালাম, সিজদা তারও পরে হবে। যাতে সমস্ত কর্মের হুকুম একই রকম থাকে।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বযলুল মাজহুদ ঃ ২/১৪৪, নুখাবুল আফকার ঃ ৩/৩৭৮-৩৮১, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/৫৬১-৫৬৮।

## باب الكلام فى الصلوة لما يحدث فيها من السهو

## অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে ভুল হলে, তাতে কথা বলা

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

নামাযের মধ্যে ইচ্ছাকৃত কথা বললে, যদি সেটি নামাযের সংশোধনের জন্য না হয়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে নামায ভঙ্গের কারণ হবে। যদি নামাযের সংশোধনের জন্য মুকতাদী স্বীয় ইমামের সাথে অথবা ইমাম স্বীয় মুকতাদীর সাথে কথা বলেন, এমনিভাবে কারও সাথে ভুলক্রমে কথা বলেন তবে নামায ভঙ্গ হবে কিনা এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে।

১. ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক, আহমদ, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ র. প্রমুখের মতে ভুলক্রমে অথবা হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে কথা বললে, নামায ভঙ্গ হবে না। তবে শর্ত হল, কথা দীর্ঘায়িত না হতে হবে। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, ইবরাহীম নাখঈ, কাতাদা, হাম্মাদ, আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব র. প্রমুখের মতে কথাবার্তা ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলক্রমে, হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই হোক কিংবা ভুলক্রমে, নামায সংশোধনের উদ্দেশ্যে হোক অথবা এ উদ্দেশ্যে না হোক, সর্বাবস্থায় কথাবার্তা সাধারণত নামায ফাসিদ হওয়ার কারণ। এটাই ইমাম মালিক র. এর আর একটি রেওয়ায়াত। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ইমাম মালিক র. এর একটি রেওয়ায়াত হল– নামায সংশোধনের জন্য কথা বললে তা নামায ফাসিদের কারণ নয়।

ইমাম আহমদ র. থেকে এ মাসআলায় চারটি রেওয়ায়াত আছে। তিন রেওয়ায়াত মাযহাবত্রয়ের ন্যায়, চতুর্থ রেওয়ায়াত হল, যদি কেউ তার নামায এখনও পূর্ণ হয়নি, এটা জেনে কথা বলে, তবে এরূপ কথা নামায ভঙ্গের কারণ হবে, চাই সে কথা স্বীয় ইমামকে নামায পূর্ণ করার নির্দেশ দেয়ার জন্যই হোক না কেন। যদি কেউ এই ইয়াকীনের সাথে কথা বলে যে, তার নামায পূর্ণ হয়ে গেছে, এরপর সে জানতে পেরেছে তার নামায এখনও পূর্ণ হয়নি, তবে এরূপ কথাবার্তা তার নামায ভঙ্গের কারণ হবে না।

وامّا وجهُ ذالكَ مِن طريقِ النظرِ فانّا قَد رأينَا اشياءَ يدخلُ فِيهَا العبادُ تمنعُهم مِن اشياءَ، فمِنها الصلوةُ تمنعُهم مِن الكلامِ والافعالِ التیْ لاتفعلُ فيهَا ۔ ومِنهَا الصيامُ يمنعُهم مِن الجماعِ والطعامِ والشرابِ ومِنها الحجُّ والعمرةُ يمنعانِهم مِن الجماعِ والطيبِ واللباسِ ۔ ومِنها الاعتكافُ يمنعُهم مِن الجماعِ والتصرفِ فكانَ مَن جامعَ فی صيامِه او اَكلَ اوشربَ ناسيًا مختلفًا فِی حكمهٖ، فقومٌ يقولونَ لايخرجهٗ ذالكَ مِن صيامِه تقليدُ الاٰثار رووهَا۔

وقومٌ يقولونَ قد اخرجَه ذالكَ مِن صيامِه وكلُّ مَن جامَع فی حجتِه او عمرتِه او اعتكافِه متعمدًا اوناسيًا، فقدْ خرجَ بذٰلكَ مِمَّا كانَ فِيه مِن ذالكَ فكانَ مايخرجُه مِن هذه الاشياءِ اِذا فعلَ ذالكَ متعمّداً فهوَ يخرجُه مِنها اِذا فعلَه غيرَ متعمدٍ وكانَ الكلامُ فی الصلٰوةِ يقطعُ الصلٰوةَ اِذا كانَ علٰی التعمدِ كذلكَ، فالنظرُ علی ماذكرنَا مِن ذالكَ ان يكونَ ايضًا يقطعُها اِذا كانَ علٰی السهوِ ويكونُ حكمُ الكلامِ فِيهَا علی العمدِ والسهوِ سواءً كمَا كانَ حكمُ الجماعِ فی الاعتكافِ والحجِ والعمرةِ علٰی العمدِ والسهوِسواءً، فهٰذَا هوَ النظرُ ايضًا فِی هٰذا البابِ وقد وافقَ ماصححنَا عليهِ معانیَ الاثارِ وهو قولُ ابی حنيفةَ وابی يوسفَ ومحمدٍ رحمهمُ اللهُ تعالٰی ۔

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

অনেক ইবাদত এরূপ রয়েছে, যেগুলোতে প্রবেশ করলে কোন কোন জিনিস নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যেমন–

১. নামায়– এটি কথাবার্তা ও নামায পরিপন্থী সব কাজ নিষেধ করে। নামাযে প্রবেশ করা মাত্রই অনেক জিনিস নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

২. রোযা– এটি খানাপিনা ও সহবাসের জন্য প্রতিবন্ধক।

৩. হজ্জ ও উমরা– এর ফলে সুগন্ধি ও বিশেষ পোশাক ব্যবহার করা নিষেধ হয়ে যায়।

৪. ইতিকাফ– এটি সহবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রতিবন্ধক।

এবার এসব ইবাদতে যদি এগুলোর প্রতিবন্ধক এসে যায়, তবে ভুল ও ইচ্ছার ছুরতে এগুলোর কি হুকুম হয় তা দেখুন। রোযাতে যদি কোন ব্যক্তি নিষিদ্ধ খানাপিনা ও সহবাসের কোন একটি ইচ্ছাকৃতভাবে করে, তবে রোযা ফাসিদ হয়ে যায়। আর যদি বিস্মৃতির কারণে হয়ে যায়, তবে কারও মতে ফাসিদ হয়, আর কারও মতে হয় না। হজ্জ অথবা উমরা ও ইতিকাফে কোন নিষিদ্ধ জিনিসে লিপ্ত হলে, যেমন– সহবাস করলে, চাই ইচ্ছাকৃত হোক বা বিস্মৃতির ভিত্তিতে, সর্বাবস্থায় হজ্জ, উমরা ও  ইতিকাফ সর্বসম্মতিক্রমে ফাসিদ হওয়ার কারণ হয়। এতে বুঝা গেল যে সব জিনিসের সম্মুখীন ঐচ্ছিকভাবে হলে ফাসাদের কারণ হয়, তা ভুলক্রমে হলেও ফাসাদের কারণ হয়। বস্তুতঃ নামাযে ইচ্ছাকৃত কোন ওজর ব্যতীত কথাবার্তা বললে, সর্বসম্মতিক্রমে তা নামায ভঙ্গের কারণ। অতএব, তা ভুলক্রমে হলেও নামায ভঙ্গের কারণ হওয়া উচিত। যাতে ভুল ও ইচ্ছার হুকুম এক রকম হয়ে যায়, যেরূপভাবে অন্যান্য ইবাদত তথা হজ্জ, উমরা ও ইতিকাফে উভয়ের হুকুম সমান হয়ে থাকে।

বাকি রইল রোযার হুকুম দ্বারা কারও সন্দেহ হতে পারে। কারণ, রোযাতেও নিষিদ্ধ জিনিস তথা খানাপিনা ও সহবাসের সম্মুখীন ভুলক্রমে হলেও রোযা ভঙ্গের কারণ হওয়া বিতর্কিত বিষয়।

এই সন্দেহের উত্তর হল, রোযার হুকুম বিতর্কিত। হজ্জ, উমরা ও ইতিকাফের হুকুম সর্বসম্মত। কাজেই সর্বসম্মত বিষয় ধর্তব্য হবে। তাছাড়া, ইতিবাচক ইবাদতের দিক দিয়ে নামাযের শক্তিশালী মিল রয়েছে– হজ্জ, উমরা ও ইতিকাফের সাথে। কারণ, হজ্জ, উমরা, ইতিকাফ ও নামায সবই করণীয় কাজ, বর্জনীয় নয়। কিন্তু রোযাতে খানাপিনা ও সঙ্গম বর্জনীয়। কাজেই হজ্জ, উমরা ও ইতিকাফে যেরূপভাবে নিষিদ্ধ জিনিসের অস্তিত্ব ইচ্ছাকৃতভাবে হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে দুটোই ভঙ্গের কারণ, এরূপভাবে নামাযেও উভয়টি ভঙ্গের কারণ

হবে। রোযার ইখতিলাফের দিকে লক্ষ্য করা হবে না। তাছাড়া, আর একটি কথা হল, রোযাতে নিষিদ্ধ কতগুলো জিনিসের সম্মুখীন হলে রোযা ভঙ্গের কারণ হয় না, এটি কতগুলো হাদীসের ভিত্তিতে।

সারকথা, হজ্জ, উমরা ও ইতিকাফের ভিত্তিতে যেরূপভাবে ভুল ও ইচ্ছার মাঝে কোন পার্থক্য নেই, এরূপভাবে নামাযের হুকুমেও কোন পার্থক্য হবে না। নামাযের ভিতর কথাবার্তা সাধারণভাবেই নামায ভঙ্গের কারণ হবে।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বযলুল মাজহুদ ঃ ২/১৩৭, নুখাবুল আফকার ঃ ৪/১৭, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/৫৬৯-৫৮৮।

## باب الاشارة فى الصلوة

## অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে ইঙ্গিত করা

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

নামাযের মাঝে সালাম অথবা অন্য কোন জিনিসের জন্য ইঙ্গিত করা, যার ফলে শ্রোতা অন্তরের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বুঝতে পারে, তা নামায ভঙ্গের কারণ কি না? এ বিষয়ে মতবিরোধ আছে।

১. কোন কোন আহলে জাহিরের মত, এরূপভাবে ইঙ্গিত করলে তা হবে নামাযে কথাবার্তার ন্যায়। এর কারণে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম চতুষ্টয় বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে এ ধরনের ইঙ্গিতের ফলে নামায ফাসিদ হবে না। তবে এরূপ করা মাকরূহ (তানযীহী)। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وليستِ الاشارةُ فِى النظرِ مِن الكلامِ فِى شيئٍ لِان الاشارةَ اِنما هِى حركةُ عضوٍ وقد رأينا حركةَ سائرِ الاعضاءِ غيرِ اليدِ فِى الصلٰوةِ لَاتقطعُ الصلٰوةَ فكذالكَ حركةُ اليدِ ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

ইশারা অর্থ একটি অঙ্গকে নাড়াচাড়া দেয়, গতিশীল করা। হাত ছাড়া বাকি কোন অঙ্গের নাড়াচাড়া নামায ভঙ্গের কারণ নয়। এটি সর্বসম্মত বিষয়। অতএব, অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় হাতের নড়াচড়াও নামায ভঙ্গের কারণ না হওয়া উচিত। যুক্তির দাবি এটাই।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নুখাবুল আফকার ঃ ৪/৬৩, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/৫৯০-৫৯৯।

## باب المرور بين يدى المصلى هل يقطع عليه ذالك صلوته؟

## অনুচ্ছেদ ঃ মুসল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রমণ নামায ভঙ্গের কারণ কিনা?

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

কালো কুকুর, গাধা ও মহিলা মুসল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে নামায ফাসিদ হবে কিনা? এ বিষয়ে মতবিরোধ আছে।

১. ইমাম আহমদ র. থেকে প্রসিদ্ধ রেওয়ায়াত, আসহাবে জাওয়াহির, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, হাসান বসরী, ইকরামা, আতা ইবনে আবু রাবাহ এর মতে কাল কুকুর অতিক্রম করার ফলে নিশ্চিতভাবে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। গাধা অথবা মহিলা অতিক্রম করলে নামায ফাসিদ হওয়ার ব্যাপারে তার মধ্যে সন্দেহ আছে। ইমাম আহমদ র. থেকে একটি রেওয়ায়াত এটিও যে, উপরোক্ত তিনটি জিনিসের অতিক্রমের ফলে নামায ফাসিদ হয়ে যায়। একদল আলিমের উক্তিও তাই। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা, মালিক, শাফিঈ, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ইবনে হাসান, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখঈ, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন র. প্রমুখ বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে কাল কুকুর, গাধা কিংবা রমণী কারও অতিক্রমণই নামায ভঙ্গের কারণ নয়। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَامَّا وجهُه مِن طريقِ النظرِ فانَّا رأينَا هُم لَايختلفُونَ فِى الكلبِ غيرِ الاسودِ اَن مروره بينَ يدِي المصلىْ لا يقطعُ الصلوةَ فاردنَا ان ننظرَ فِى حكمِ الاسودِ هلْ هوَ كذالكَ ام لاَ؟ فرأينَا الكِلابَ كلّهَا حرامٌ اكلُ لحومِها مَا كانَ مِنها اسودَ ومَا كانَ مِنها غيرَ اسودَ، فلَم يكنْ حرمةُ لحومِها لِالوَانِهَا ولكنْ لِعللِها فِى انفُسِهَا ـ وكذالكَ كلُّ مَا نهِىَ عَن اكله مِن كلِّ ذِى نابٍ مِن السباعِ وكلُّ ذى مخلبٍ مِن الطيرِ ومِن الحمرِ الاهليةِ لايفترقُ فِى ذالكَ حكمُ شيْءٍ مِنها لِاختلافِ الوانِها ـ وكذالكَ اسوارُها كلُّها

فالنظرُ علىٰ ذالكَ ان يكونَ حكمُ الكلابِ كلِّها فِى مرورِها بينَ يدىِ المصلىْ سواءً فكمَا كانَ غيرُ الاسودِ مِنها لَايقطعُ الصلٰوةَ فكذالكَ الاسودُ -

ولمَّا ثبتَ فِى الكلابِ بالنظرِ ماذكرنَا كانَ الحمارُ اولىٰ اَن يكونَ كذالكَ لِانه قدِ اختِلفَ فِى اكلِ لحومِ الحمُرِ الاهليةِ فاجازَه قومٌ وكرِهَه اُخرونَ فاِذَا كانَ مَالايوكَلُ لحمُه باتفاقِ المسلمينَ لايَقطعُ مرورُه الصلوةَ كانَ مَا اختلِفَ فِى اكلِ لحمِهٖ احرٰى اَن لَايقطعَ مرورُه الصلٰوةَ فهٰذا هو النظرُ فى هٰذا البابِ وهو قولُ ابىْ حنيفةَ وابىْ يوسفَ ومحمدٍ رحمَهمُ اللهُ تعالىٰ -

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

কালো ছাড়া অন্য রংয়ের কুকুর অতিক্রম করলে নামায ফাসিদ হবে না বলে সবাই একমত। তবে মতবিরোধ হল, কালো কুকুর সম্পর্কে। তার অতিক্রমণ নামায ভঙ্গের কারণ কিনা? আমরা চিন্তা করে দেখলাম, কালো কুকুর ও অন্যান্য কুকুর সবই এক ধরনের হারাম। এগুলোর গোশ্ত হালাল নয়। হারাম হওয়ার কারণ, এগুলোর রং নয়, বরং এগুলোর হাকীকতেই হারামের কারণ বিদ্যমান রয়েছে। এমনিভাবে সমস্ত জন্তু যেগুলোর গোশ্ত খাওয়া নিষেধ (দাঁতাল হিংস্র প্রাণী, পাঞ্জাবিশিষ্ট পাখি ও প্রতিপালিত গাধা) এর গোশত এবং উচ্ছিষ্টের হুকুম একই রকম। রঙের পার্থক্যের কারণে এগুলোর হুকুমের কোন পার্থক্য হয় না। অতএব, কুকুর ছাড়া সমস্ত প্রাণীর কোনটিতেই কোন হুকুমে রংয়ের পার্থক্য বিলকুল ধর্তব্য না হওয়া, এমনিভাবে মুসল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রম ছাড়া অন্য কোন হুকুমেও কুকুরের রংয়ের পার্থক্য ধর্তব্য না হওয়া একটি সর্বসম্মত বিষয়। সেহেতু যুক্তির দাবি হল, নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমের হুকুমেও রংয়ের পার্থক্য ধর্তব্য না হওয়া। বরং যেরূপভাবে কালো কুকুর ছাড়া অন্য কুকুরের অতিক্রমণ নামায ভঙ্গের কারণ নয়, এরূপভাবে কালো কুকুরের অতিক্রমণ নামায ভঙ্গের কারণ নয়। যেহেতু কুকুরের অতিক্রমণ নামায ভঙ্গের কারণ নয়, অতএব, গাধার অতিক্রমণও এর কারণ হবে না। কারণ, কুকুর হারাম সর্বসম্মতভাবে, আর গৃহপালিত গাধা হারাম হওয়ার বিষয়টি সর্বসম্মত নয়। বরং

কারও কারও মতে গৃহপালিত গাধার গোশত হালাল। যেহেতু সর্বসম্মত হারাম কুকুরের অতিক্রমণ নামায ভঙ্গের কারণ নয়, অতএব বিতর্কিত গাধার অতিক্রমণও উত্তমরূপে নামায ভঙ্গের কারণ হবে না। বাকি রইল মহিলার অতিক্রমণ, নামায ভঙ্গের কারণ নয় কেন? ইমাম তাহাভী র. এটি অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, বনী আদমের অতিক্রমণ চাই পুরুষ হোক বা মহিলা, এটা নামায ভঙ্গের কারণ নয়।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নববী ঃ ১/১৯৭, বযলুল মাজহুদ ঃ ১/৩৭১, নুখাবুল আফকার ঃ ৪/৮৩-৮৫, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/৫৯৯-৬১০।

## باب الرجل ينام عن الصلوٰة او ينساها كيف يقضيها ؟

## অনুচ্ছেদ ঃ নামায না পড়ে ঘুমিয়ে থাকলে অথবা তা ভুলে গেলে কিভাবে কাযা করবে?

### মাযহাবের বিবরণ ঃ

কেউ ঘুমিয়ে পড়লে অথবা নামায ভুলে গেলে এমতাবস্থায় নামাযের ওয়াক্ত চলে গেলে তার নামায কাযা করার পদ্ধতি কি? এ সম্পর্কে মতবিরোধ আছে–

১. অধিকাংশ আহলে জাহির এবং কোন কোন গায়রে মুকাল্লিদের মতে একটি ছুটে যাওয়া নামায দু'বার কাযা করা ওয়াজিব। একবার যখন নামায স্মরণে আসবে আর দ্বিতীয়বার যখন পরবর্তী দিন এই নামাযের ওয়াক্ত আসবে। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. কোন কোন আহলে জাহির এবং কোন কোন মুহাদ্দিসের মতে কাযা একবারই। কিন্তু যখন স্মরণে আসে তখনই নয়, বরং এর সাথে যে ফরয নামাযের ওয়াক্ত আসছে তাতে সে ফরয নামাযের সাথে ছুটে যাওয়া নামায কাযা করবে। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. ইমাম চতুষ্ঠয় বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে শুধু একবার কাযা ওয়াজিব। ইমামত্রয়ের মতে ঠিক তখন পড়া জরুরি, যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হবে অথবা নামাযের কথা স্মরণে আসবে। এমনকি সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত এবং ঠিক দ্বিপ্রহরের মত মাকরূহ সময়েও। কিন্তু হানাফীদের মতে কাযা ওয়াজিব হওয়ার সময় প্রশস্ত। স্মরণে আসা এবং জাগ্রত হওয়ার পর যে কোন সময়ে তা পড়া যেতে পারে।

অতএব, মাকরূহ সময়ে তা পড়া দুরুস্ত নেই। অবশ্য ইমাম চতুষ্টয় এ ব্যাপারে একমত যে, আসন্ন কোন নামাযের ওয়াক্ত আসার অপেক্ষা করা যাবে না। দ্বিতীয় خالفهم الخ দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وامَّا مِن طريقِ النظرِ فانا رأينَا اللهَ عزَّ وجلَّ اوجبَ الصلٰوةَ لمواقيتِها واوجبَ الصيامَ لميقاتِه فِي شهرِ رمضانَ ثم جَعلَ علىٰ مَن لم يصُمْ شهرَ رمضانَ عدةً مِن ايامٍ اُخرَ فَجعلَ قضاءَه فى خِلافِه مِن الشهورِ و لم يجعلْ مَع قضائِه بعددِ ايامِه قضاءَ مثلِها فِيمَا بعدَ ذالكَ فالنظرُ علىٰ ماذكرنَا انَ يكونَ كذالكَ الصلوةُ اِذا نسيتْ او فاتَت اَن يكونَ قضاؤُها يجبُ فِيمَا بعدَها وانِ لَم يكنْ دَخلَ وقتٌ مثلُها ولايجبُ معَ قضائِها مرةً قضاؤُها ثانيةً قياسًا ونظرًا علىٰ ماذكرنَا مِنَ الصيامِ الذىْ وصفنَا وهٰذا قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمَهم اللهُ تعالى -

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

আল্লাহ্ তা'আলা নির্দিষ্ট সময়ে নামায ফরয করেছেন। প্রতিটি নামাযের সময় আলাদা ও সুনির্ধারিত। যেমন– রোযাকে একটি বিশেষ সময়ে অর্থাৎ, রমযান মাসে নির্ধারিত করেছেন। অতঃপর আমরা দেখি, কেউ যদি রমযান মাসে রোযা না রাখতে পারে, তবে রমযানের পর কাযারূপে সে পরিমাণ দিন রোযা রাখা তার উপর আবশ্যক। কাযা করলে একবারই তা যথেষ্ট, দ্বিতীয়বার এসব দিনের কাযার কোন প্রয়োজন নেই। বরং এর কোন প্রমাণও নেই। যুক্তির দাবি হল, রোযার কাযা যেমন অরমযানে হয়ে থাকে, অথচ এই সময় অর্থাৎ, অবশিষ্ট এগার মাস রোযা রাখার সময় নয়। এরূপভাবে ছুটে যাওয়া নামাযের কাযার জন্যও অন্য কোন নামাযের ওয়াক্ত হওয়া জরুরি হবে না। এমনিভাবে একবার কাযা করার পর পুনরায় রোযা কাযা জরুরি বরং বিধিবদ্ধই নয়। এরূপভাবে একবার কাযা করার পর পুনরায় নামায কাযা করাও জরুরি বরং বিধিবদ্ধই না হওয়া উচিত।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নুখাবুল আফকার ঃ ৪/১১৬-১১৭, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/৬১০-৬১৯।

## باب دباغ الميتة هل يطهرها ام لا ؟

## অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের চামড়া সংস্কারের ফলে পবিত্র হয় কিনা?

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. ইমাম মালিক র.-এর একটি রেওয়ায়াত, আহমদ, ইবনে মুবারক, আওযাঈ র. প্রমুখের মতে, মৃতের চামড়া সংস্কারের ফলেও পবিত্র হয় না। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ র. প্রমুখের মতে সংস্কারের পর চামড়া পবিত্র হয়ে যায় وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

واما وجهُهُ مِن طريقِ النظرِ فإنَّا قدرأينا الاصلَ المجتمعَ عليهِ اَن العصيرَ لابأسَ بشربِهٖ والانتفاعِ بهٖ مَالم يُحدثْ فِيه صفاتُ الخمرِ، فاذَا حدثتْ فيهِ صفاتُ الخمرِ حرمَ بذٰلكَ ثم لَايزالُ حرامًا كذٰلكَ حتّٰى تحدثَ فِيه صفاتُ الخلِّ، فاذَا حدَثتْ فِيه صفاتُ الخلِّ حلَّ فكانَ يحلُّ بحدوثِ الصفةِ ويحرمُ بحدوثِ صفةٍ غيرِهَا وانِ كانَ بدنًا واحدًا، فالنظرُ علٰى ذالكَ اَن يكونَ كذلكَ جلدُ الميتةِ يحرمُ بحدوثِ صفةِ الموتِ فِيه ويحلُّ بحدوثِ صفةِ الامتِعةِ فيهِ مِن الثيابِ وغيرِها فيهِ واِذا دُبغَ فصارَ كالجلودِ والامتِعةِ فقد حدَثتْ فيهِ صفةُ الحلالِ فالنظرُ علٰى ماذكرْنَا اَن يحلَّ ايضًا بحدوثِ تلكَ الصفةِ فيهِ ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

সর্বসম্মত একটি মূলনীতি হল, গুণ পরিবর্তনের ফলে দ্রব্যের হুকুমও পরিবর্তিত হয়ে যায়। কোন জিনিস কোন গুণের কারণে হারাম হয়, যখন এসব গুণ পরিবর্তিত হয়ে সেগুলোতে বৈধতা এসে যায়, তখন গুণের পরিবর্তনের ফলে সেটি হালাল হয়ে যায়। যদিও হাকীকত একই হোক না কেন। যেমন– আঙ্গুরের রস পান করা, তদ্বারা উপকৃত হওয়া ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে মদ তথা শরাবের গুণ সৃষ্টি না হয়। যখন মদের গুণ সৃষ্টি হয়, তখন সেটা

ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে সিরকার গুণ সৃষ্টি না হয়। এরপর যখন সিরকার গুণ সৃষ্টি হয়, তখন হারাম থেকে হালালের দিকে চলে আসে। এরূপভাবে মৃতের চামড়ার অবস্থাও অনুরূপ। যখন তাতে মৃত্যুগুণ সংযুক্ত হয়, তখন সেটি নাপাক হয়ে যায়, অতঃপর সংস্কারের ফলে যখন তা থেকে নাপাকের গুণ দূরীভূত হয়ে তার মধ্যে দ্রব্যের গুণ সৃষ্টি হয়, তখন উপরোক্ত মূলনীতি তথা 'গুণের পরিবর্তনে হুকুমের পরিবর্তন হয়'– এর আলোকে পবিত্র হয়ে যায়।

وحجةٌ اخرىٰ اَنَّا قدْ رأينا اصحابَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ لمَّا اسلمُوا لَم يأمُرهُم رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم بطرحِ نِعالِهم وخِفافِهم وانطاعِهم التىْ كانُوا اتَّخذُوهَا فِى حالِ جاهليتِهم وانما كانَ ذالكَ مِن ميتةٍ او مِن ذبيحةٍ فذَبيحتُهم حينئذٍ انما كانتْ ذبيحةَ اهلِ الاوثانِ، فهىَ فِى حرمتِها علىٰ اهلِ الاسلامِ كحرمةِ الميتةِ، فلمَّا لَم يأمُرهم رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ بطرحِ ذٰلكَ وتركِ الانتفاعِ بهِ ثبتَ اَن ذالكَ كانَ قدخرجَ مِن حكمِ الميتةِ ونجاستِها بالدباغِ اِلى حكمِ سائرِ الامتِعةِ وطهارتِها وكذلكَ كانُوا معَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ اِذا افتتحُوا بلدانَ المشركينَ لايأمرُهم بِان يتحامَوا خِفافَهم ونعالَهم وانطاعَهم وسائرَ جلودِهم فَلا يأخذُوامِن ذالكَ شيئًا بل كانَ لايمنعُهم شَيئًا مِن ذالكَ فذالكَ دليلٌ ايضًا علىٰ طهارةِ الجلودِ بالدباغِ۔

ولقدْ روِى فِى هٰذا عنْ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ماقدحدَّثنَا فهدٌ قَال ثنَا ابو غسانَ قالَ ثنَا محمدُ بنُ راشدٍ عن سليمٰنَ بنِ موسىٰ عَن عطاءِ بنِ ابى رَباحٍ عنْ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضـ قالَ كنَّا نُصيبُ معَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ فِى مغَانِمنَا مِن المشركينَ الاسقيةَ فنقتسمُها وكلُّها ميتةٌ فننتفعُ بذالكَ فدلَّ ذالكَ علىٰ

مَاذكرنَا وهٰذا جابرٌ رض يقولُ هٰذا وقَد حدَّث عَن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ اَنه قالَ لاتَنتفِعُوا مِن الميتةِ بشئٍ فلم يكنْ ذالكَ عندهٗ بمضادٍّ لهٰذا . فثبتَ اَن معنٰى حديثِه عَن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لاتنتفعُوا مِن الميتةِ بشئٍ غيرُ معنٰى حديثِه الاخرِ واَن الشئَ المحرمَ مِن الميتةِ فى ذٰلكَ الحديثِ هُو غيرُ المباحِ فِى هٰذا الحديثِ فكذالكَ ايضا ماروٰى عبدُ اللهِ بنُ عُكيمٍ عَن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم ممَّا نهٰى عن الانتفاعِ بهٖ منَ الميتةِ وهوَ غيرُما اباحَ فِى هٰذه الاثارِ مِن اُهُبِها المدبوغةِ حتّٰى تتفِقَ هٰذه الاٰثارُ ولايُضادُّ بعضُها بعضًا وهٰذا الذىْ ذهبْنَا اِليهِ فى هٰذا البابِ مِن طهارةِ جلودِ الميتةِ بالدباغِ قولُ ابىْ حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمَهم اللهُ تعالٰى .

**আর একটি যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

সাহাবায়ে কিরাম যখন শিরক ও কুফর বর্জন করে মুসলমান হন, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে তাঁদের সেসব জুতা, মোজা ও বিছানা ছুড়ে ফেলার নির্দেশ দেন নি, যেগুলো তাঁরা বর্বরতার যুগে মৃত অথবা স্বীয় যবাইকৃত পশুর চামড়া দ্বারা তৈরি করেছিলেন। মৃতের চামড়া যেরূপ নাপাক এরূপভাবে তাদের জবাইকৃত জন্তুগুলোও মুসলমানদের নিকট মৃতের মত নাপাক। তা সত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁদেরকে সেসব জিনিস ছুঁড়ে ফেলার এবং উপকৃত না হওয়ার নির্দেশ প্রদান না করা, এটা সংস্কারের পর চামড়া পবিত্র হয়ে যাওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ।

তাছাড়া, মুশরিকদের অঞ্চলগুলো বিজয়ের সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেসব জিনিস থেকে পরহেজ করার নির্দেশ দেননি, যেগুলো মুশরিকরা চামড়া দ্বারা তৈরি করেছিল, বরং চামড়া দ্বারা তৈরি তাদের জুতা, মোজা ও বিছানা ইত্যাদিও গণিমতরূপে অর্জন করা হয়েছে। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সংস্কারের পর মৃতের চামড়া নাপাক থাকে না বরং পবিত্র হয়ে যায়।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নুখাবুল আফকার ঃ ৪/১৩১, ১৩২, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ ১/৭৮, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/৬১৯-৬২৭।

## باب الفخذ هل هو من العورة ام لا ؟

## অনুচ্ছেদ ঃ উরু ছতর কিনা?

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান, ইসমাঈল ইবনে উলাইয়্যা, ইবনে জারীর তাবারী এবং দাঊদ জাহিরী, আবু জাফর আসতাখরী র. প্রমুখের মতে এমনিভাবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও মালিক র. এর এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী উরু ছতর নয়। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, ইমাম যুফার র. বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে এবং ইমাম মালিক ও আহমদ র. এর বিশুদ্ধতম উক্তি অনুযায়ী উরু ছতর। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَامَّا وجهُ ذالكَ مِن طريقِ النظرِ فانَّا رأينَا الرجلَ ينظرُ مِن المرأةِ التىْ لامحرمَ بينَه وبينَها الٰى وجهِها وكفَّيهَا ولاينظرُ الٰى مافوقَ ذالكَ مِن رأسِها ولَا اِلى اسفلَ منهُ مِن بطنِها وظهرِهَا وفخذَيهَا وساقَيها ورأينَاه فِى ذاتِ المحرمِ منهُ لابأسَ ان ينظرَ منهَا الٰى صدرِها وشعرِها ووجهِها ورأسِها وساقِها ولاينظرُ الٰى مَا بينَ ذالكَ مِن بدنِها، وكذالكَ رأيناهُ ينظرُ من الامَةِ التى لاملكَ لهٗ عليهَا ولا محرمَ بينهٗ وبينَها فكانَ ممنوعًا مِن النظرِ مِن ذاتِ المحرمِ مِنه ومِن الامةِ التىْ ليستْ بمحرمٍ لهٗ ولاملكَ لهٗ عَليهَا الى فَخذِها كمَا كانَ ممنوعًا مِن النظرِ الى فرجِها، فصارَحكمُ الفخِذِ مِن النساءِ كحكمِ الفرجِ لَاكحكمِ الساقِ

فالنظرُ على ذالكَ اَن يكونَ مِن الرجالِ ايضًا كذالكَ واَن يكونَ حكَمُ فخذِ الرجلِ فِى النظرِ اليهِ كحكمِ فَرجِه فِى النظرِ اليهِ لَا

كَحكمِ ساقِه فلمَّا كانَ النظرُ الى فرجِه محرمًا كانَ كذالكَ النظرُ الى فخذِه محرَّمًا وكذالكَ كلُّ ما كانَ حرامًا على الرجلِ ان ينظرَ اليهِ منهُ الى ذاتِ المحرمِ مِنه فحرامٌ على الرجالِ اَن ينظرَ اِليه بعضُهم مِن بعضٍ وكلُّ مَا كانَ حلالاً ان ينظرَ ذُو المحرمِ مِن المرأةِ ذاتِ المحرمِ مِنهُ فلاباسَ اَن ينظرَهُ الرجالُ بعضُهم مِن بعضٍ فهٰذَا هُو اصلُ النظرِ فِى هٰذا البابِ وَقدْ وافقَ ذالكَ مَاجاءتْ بهِ الرواياتُ التىْ روينَاهَا عَن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم فبذالكَ نَأخذُ وهوَ قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمَهم اللهُ تعالى

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

পুরুষের জন্য গায়রে মাহরাম মহিলার চেহারা, হাতের তালু এবং পায়ের পাতা দেখা জায়েয আছে। তাছাড়া অন্য কোন অঙ্গ যেমন– মাথা, পিঠ, পেট, উরু, পায়ের গোছা কিছুই দেখা জায়েয নেই। মাহরাম আত্মীয় মহিলা এবং পরের বাঁদীর মাথা, চুল, চেহারা, বুক ও পায়ের গোছা দেখা জায়েয আছে। কিন্তু এসব মহিলার উরু দেখা এরূপ হারাম, যেরূপ তাদের লজ্জাস্থান দেখা হারাম। এতে বুঝা গেল, মহিলাদের উরুর হুকুম তাদের লজ্জাস্থানের ন্যায়। অতএব, যুক্তির দাবি হল, পুরুষের উরুর হুকুমও তার লজ্জাস্থানের ন্যায় হবে। যেরূপভাবে পুরুষের লজ্জাস্থান দর্শন হারাম, তেমনিভাবে তার উরু দেখাও হারাম। তাছাড়া একজন পুরুষের জন্য মাহরাম আত্মীয় মহিলার যে সব অঙ্গ দেখা হারাম, পুরুষের সেসব অঙ্গ অন্য পুরুষের জন্য দেখাও হারাম। আত্মীয় মাহরাম মহিলার যেসব অঙ্গ দেখা হারাম, পুরুষের সেসব অঙ্গও অন্য পুরুষের জন্য দেখা হারাম। মাহরাম মহিলার যে সব অঙ্গ দেখা জায়েয, একজন পুরুষের সেসব অঙ্গও অন্য পুরুষের জন্য দেখা জায়েয। অতএব, আত্মীয় মাহরাম মহিলার উরু দেখা সর্বসম্মতিক্রমে না জায়েয। কাজেই পুরুষের উরু দেখাও নাজায়েয হবে। অতএব, এটা ছতরের অন্তর্ভুক্ত। যুক্তির দাবি তাই।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নুখাবুল আফকার ঃ ৪/১৫২. ১৫৩, উমদাতুল ক্বারী ৪/৮০, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ২/৬২৭-৬৩২।

# كتاب الجنائز
# জানাযা পর্ব

## باب المشى فى الجنازة كيف هو؟
## অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার পিছনে কিভাবে চলবে?

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ র.-এর মতে জানাযা কবরস্থানে নিয়ে যাওয়ার সময় কিরূপ গতিতে দ্রুত এবং অর্ধ দৌড়ের গতিতে নিয়ে যাওয়া উত্তম। তবে শর্ত হল, এত বেশি দ্রুত চলবে না যার ফলে লাশ বেশি নাড়াচাড়া করতে আরম্ভ করে এবং ভিতর থেকে নাপাক বের হওয়ার আশঙ্কা হয়। فذهب قوم الخ দ্বারা ইমাম তাহাভী র. তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম শাফিঈ, মালিক, আহমদ র. ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে মধ্যম গতিতে এবং নম্র পদ্ধতিতে নিয়ে যাওয়া উত্তম। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

فاِذاابوُ اُميةَ قدحدَّثنا قالَ ثنَا عبيدُ اللهِ بنُ موسىٰ قالَ انا الحسنُ بنُ صالح عَن يحيىٰ الجابرِ عَن ابِى ماجدٍ عنِ ابنِ مسعودٍ رض قالَ سألْنَا نبيَّنَا صلى اللهُ عليهِ وسلمَ عنِ السيرِ بالجنازةِ فقالَ مادونَ الخببِ فانْ يكُ مُؤمِنًا فَما عجَّل فخيرٌ وانْ يكُ كافرًا فبُعدًا لاهلِ النارِ، فاخبرَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ فِى هٰذا الحديثِ انَّ السيرَ بالجنازةِ هوَ مَادونَ الخَببِ ـ فذالكَ عندنَا دونَ مَا كانُوا يَفعلونَ فِىْ حديثِ ابىْ موسىٰ رض حتّٰى امرَهم رسولُ اللهِ ﷺ عليهِ وسلمَ بِمَا امرَهم بِهٖ مِن ذالكَ ومثلُ مَا امرَهم بِهٖ مِنَ السرعةِ فِى حديثِ ابىْ هريرةَ فَبِهٰذا نَاخذُ وهوَ قولُ ابى حنِيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمَهم اللهُ تعالىٰ ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

এখান থেকে ইমাম তাহাভী র. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর রেওয়ায়াতের অধীনে যৌক্তিক প্রমাণ পেশ করছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– বিনা দৌড়ে দ্রুত গতিতে তোমরা জানাযা নিয়ে যাও। কারণ, মুমিন ও নেককার ব্যক্তি হলে তাকে তোমরা কল্যাণের দিকে দ্রুত নিয়ে যাবে। আর যদি অমুত্তাকী এবং কাফির হয়, তবে তাকে জাহান্নামের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে।

অতএব সমস্ত রেওয়ায়াত মিলিয়ে চিন্তা ফিকির করলে ফল এই দাঁড়ায় যে, একদম নম্র ও আস্তে চলার নির্দেশ নেই, আবার সম্পূর্ণ দৌড়ে চলারও হুকুম নেই। বরং মধ্যম গতি থেকে কিছুটা দ্রুত চলার নির্দেশ রয়েছে। এটাই আমাদের আলিমত্রয়ের অভিমত।

## باب المشى مع الجنازة اين ينبغى ان يكون منها ؟

## অনুচ্ছে ঃ জানাযার সাথে চলাকালে কোথায় থাকা উচিত?

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. ইমাম মালিক শাফিঈ আহমদ ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে, জানাযার আগে চলা উত্তম। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ মুহাম্মদ আওযাঈ র. প্রমুখের মতে লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় জানাযার পিছনে থাকা উত্তম। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

হাদীস ও যুক্তির আলোকেও তাই প্রমাণিত হয়। লক্ষ্য করুণ–

وقَد روينَا فِى حديثِ البراءِ رض اَنَّ اَلنبىَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ امرَهُم باتباعِ الجنازةِ والاغلبُ مِن معنىٰ ذالكَ هو المشىُ خلفَهَا ايضًا فصارَ بذالكَ مِن حقِّ الجنازةِ اتباعُها والصلوٰةُ عليها فكانَ المصلِّىْ علَيها يكونُ فى صلاتِه عليهَا متأخرًا عنهَا فالنظرُ علىٰ ذالكَ ان يكونَ المتبعُ لهَا فِى اتباعِه لَها متأخرًاعنْها فهٰذا هُو النظرُ مَع ماقَدوافقَه مِن الاٰثارِ ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

নামাযের সময় জানাযা সামনে রাখা হয়। সমস্ত মুসল্লী তার পিছনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করেন। অতএব, যুক্তির দাবি হল, জানাযা নিয়ে চলার সময়েও সেটাকে সামনে রাখা, সবাই তার পিছনে পিছনে চলা, এটাই উত্তম।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ফাতহুল মুলহিম ঃ ২/৪৮৮, নায়লুল আওতার ঃ ৩/৩০৯, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/৩১-৩৩।

## باب الصلٰوة على الشهداء

## অনুচ্ছেদ ঃ শহীদদের জানাযা নামায

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. ইমাম শাফিঈ, মালিক, আহমদ এবং আসহাবে জাওয়াহিরের মতে, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ র. এর এক উক্তি অনুযায়ী শহীদদের উপর জানাযা নামায নেই। অবশ্য ইমাম মালিক র. বলেন, যদি হামলা কাফিরদের পক্ষ থেকে হয়, তবে শহীদের জানাযা নামায পড়া হবে না। আর যদি মুসলমানদের পক্ষ হতে আক্রমণ হয়, তবে শহীদের জানাযা নামায পড়া হবে। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, সুফিয়ান সাওরী, আওযাঈ, আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা, মুযানী র.এর মতে ইসহাস ইবনে রাহওয়াইহ-এর দ্বিতীয় উক্তি অনুযায়ী শহীদদের জানাযা নামায সর্বাবস্থাতেই পড়া ওয়াজিব। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وقدروىَ ايضًا عَن عقبةَ بنِ عامرٍ رضـ اَنَّ النبيَّ صلّى اللهُ عليهِ وسلمَ علىٰ قَتلىٰ احدٍ بَعد مَقتلِهم بثمانِ سنينَ حدثنا يونسُ قَال انَا ابنُ وهبٍ قالَ اخبرنيْ عمروٌ وابنُ لهيعةَ عن يزيدَ بنِ ابى حبيبٍ اَن اَبا الخيرِ اخبرهُ انه سمِعَ عقبةَ بن عامرٍ يقولُ اِن اٰخرَما خطبَ لنَا رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ اَنه صلّى على شُهداءِ اُحدٍ ثم رقِى على المنبرِ فحمدَ اللهَ واثنٰى عَليهِ ثم قالَ اِنى لكُم فَرطٌ وانَا عليكُم شهيدٌ حدثَنا علىُّ بنُ معبدٍ قالَ ثنَا يونسُ بنُ

محمدٌ قالَ ثنا الليثُ بنُ سعدٍ عن يزيدَ بنِ ابى حبيبٍ عَن ابى الخيرِ عَن عقبةَ بنِ عامرٍ رضـ اَن رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ خرجَ يومًا فصلّى علىٰ اهلِ احدٍ صلاتَه على الميتِ ـ

ففِى حديثِ عقبةَ اَن رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ صلى علىٰ قتلىٰ احدٍ بعدَ مقتلِهم بثمانِ سنينَ فلا يخلُو صلاتُه عليهم فِى ذالكَ الوقتِ مِن احدِ ثلٰثةِ معانٍ اِمَّا اَن يكونَ سنتُهم كانتْ اَن لايصلّى عليهِم ثم نُسخَ ذالكَ الحكمُ بعدُ بأَن يصلّى عليهم اَو يكونَ تلكَ الصلٰوةُ التى صَلاّها عليهِم تطوعًا وليسَ لِلصلٰوةِ عليهِم اَصلٌ فى السنةِ والايجاب ويكون من سنتِهم ان لايصلىَ عليهِم بحضرةِ الدفنِ ويصلّى عليهم بعدَ طولِ هٰذه المدةِ لايخلُو فعلُه صلى اللهُ عليهِ وسلمَ مِن هٰذه المعانِى الثلاثةِ ـ

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিনির্ভর প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। প্রমাণটি জটিল ইবারতে পেশ করা হয়েছে। কাজেই সহজ করার উদ্দেশ্যেই আমরা প্রথমত হযরত উকবা ইবনে আমির রা.-এর রেওয়ায়াতটির তিনটি সম্ভাবনা পেশ করে নজরের অর্থ তুলে ধরবে।

১. হযরত উকবা রা.-এর হাদীসের অর্থ ইমাম তাহাভী র. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ যুদ্ধের আট বছর পর শুহাদায়ে উহুদের জানাযা নামায আদায় করেছেন।

এ আট বছর পর যে নামায পড়েছেন তাতে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে–

(১) ইসলামের শুরুতে শহীদদের উপর জানাযা নামায বিধিবদ্ধ ছিল না। পরবর্তীতে অবিধিবদ্ধতার হুকুম রহিত হয়ে নামায পড়ার হুকুম অবতীর্ণ হয়। নামাযের হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের কবরে গিয়ে জানাযা নামায পড়েছেন।

(২) আট বছর পর সে নামায পড়েছেন নফলরূপে, ওয়াজিব বা সুন্নতরূপে নয়।

(৩) সুন্নত তরিকা হল, দাফনের পূর্বে শহীদদের উপর জানাযা নামায না পড়া, দাফনের সাত আট বছর পর নামায পড়া।

এবার হযরত উকবা রা.-এর হাদীসের বাস্তব অর্থ এ তিনটির কোন একটি হবে।

فاعتبرْنَا ذالكَ فوجدنَا امرَ الصلوة على سائرِ المَوتى هُو اَن يصلّى عليهِم قبلَ دفنِهم ثم تكلّمَ الناسُ فِى التطوعِ عليهِم قبلَ ان يدفنوا او بعد مايد فنون فجوز ذالك قوم وكرهه اخرون، فامرُ السنةِ فيهِ اوكدُ مِن التطوعِ لاجتماعِهم على السنةِ واختلافِهم فِى التطوّعِ

ইমাম তাহাভী র. فا عتبرنا ذالك الخ ইবারত দ্বারা এ তিনটি সম্ভাবনা থেকে একটি নির্ধারণ করেছেন যুক্তির আলোকে। তাঁর যুক্তির সারনির্যাস হল, আমরা চিন্তাফিকির করে দেখলাম সমস্ত মৃতের নামাযের হুকুম দাফনের পূর্বে প্রমাণিত। এতে কোন মতবিরোধ নেই। অবশ্য মৃতের উপর নফলরূপে জানাযা নামায সম্পর্কে কেউ কেউ দাফনের পূর্বে এবং পরে উভয় অবস্থাতেই জায়েয বলেন। আর কেউ কেউ নফল জানাযা নামায মাকরূহ বলেন। দাফনের পূর্বে সমস্ত মৃতের নামাযে জানাযা মাসনুন। এ ব্যাপারে সমস্ত উলামায়ে কেরাম একমত। তবে দাফনের পূর্বে ও পরে নফল জানাযা নামায সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে।

فَاِن كانَ قتلىٰ احدٍ مِمنْ تطوعَ بالصلوٰةِ عليهِم كانَ فِى ثبوتِ ذالكَ ثبوتُ السنةِ فِى الصلوٰةِ عليهِم قَبل اَوانِ وقتِ التطوّعِ بِها عليهِم وكلّ تطوعٍ فلهُ اصلٌ فِى الفرضِ فَان ثبتَ ان تلكَ الصلوٰةَ كانتْ مِن النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلّم تطوعًا تطوعَ بِه فلاَ يكونُ ذالكَ اِلا والصلوٰةُ عليهِم سنةٌ مِن سنتِهم كالصلوٰةِ على غيرِهم -

অতএব, যদি উহুদের শহীদগণ এরূপ লোকের অন্তর্ভুক্ত হন যাদের উপর নফল জানাযা নামায পড়া যায়, তবে এই নফল প্রমাণিত হওয়ার কারণে তাদের উপর নফল নামায পড়ার সময়ের আগে তাদের উপর জানাযা নামায পড়া মাসনুন প্রমাণিত হবে। কারণ, প্রতিটি নফলের জন্য ফরযে তার কোন না কোন আসল বা মূল থাকতে হয়। অতএব, যদি হযরত উকবা রা.-এর রেওয়ায়াতের

নামায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে নফলরূপে প্রমাণিত হয়, তবে সমস্ত মৃতের ন্যায় শহীদদের নামাযে জানাযাও মাসনুন প্রমাণিত হবে।

যদি শুরুতেই নামাযে জানাযা ছাড়া শহীদদেরকে দাফন করা মাসনুন হয়ে থাকে তবে আট বছর পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁদের কবরে গিয়ে নামায পড়া হবে নিশ্চয়ই এজন্য যে প্রথম হুকুম রহিত হয়ে নামায পড়ার নির্দেশ এসেছে।

وانْ كانتْ صلاتُه عليهِم انما كانتْ لِان هٰكذا سنتُهم اَن لا يصلّٰى عليهِم الاّ بعدَ هذه المدةِ وانّهم خصّوا بذالكَ فقد يحتملُ اَنَ يكونَ كذالكَ حكمُ سائرِ الشهداءِ اَن لايصلّٰى عَليهِم الاّ بعدَ مضىّ مثلِ هٰذه المدةِ ۔ ويَجوزُ ان يكونَ سائرُ الشهداءِ يعجلُ الصلوةَ عليهم غيرُ شهداءِ اُحدٍ ۔

আর যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক জানাযা নামায পড়ার কারণ এটা হয় যে, শহীদদের জন্য নামায পড়ার মাসনুন পদ্ধতিই হল এতদিন পর কবরে গিয়ে নামায পড়া এবং এটা অন্যান্য শহীদ ছাড়া শুধু উহুদের শহীদদের বৈশিষ্ট্য, তবে এমতাবস্থায় প্রতিটি শহীদের হুকুমও উহুদের শহীদদের ন্যায় এটা হওয়া আবশ্যক হবে যে, সাত আট বছর পর কবরে গিয়ে জানাযা নামায আদায় করতে হবে। এটাও সম্ভব যে উহুদের শহীদদের ছাড়া অন্যান্য শহীদের নামাযে এরূপ বিলম্বের হুকুম নেই। বরং দাফনের পূর্বে দ্রুত নামাযের হুকুম রয়েছে। তাহলে সর্বাবস্থায় শহীদের জানাযা নামায প্রমাণিত হবে।

ফল এই দাঁড়াল যে, উপরোক্ত তিনটি অর্থের প্রত্যেকটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শহীদদের ব্যাপারে মাসনুন পদ্ধতিতে জানাযা নামাযের হুকুম প্রমাণিত। চাই একটি মেয়াদের পরে হোক অথবা দাফনের পূর্বে। মোটকথা, শহীদদের উপর জানাযা নামাযের হুকুম সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

وانْ كانتْ صلاتُه عليهم لعلةِ نسخِ فعلهِ الاولِ وتركِه الصلوةَ عليهم فانَّ صلاتَه هٰذه عَليهِم توجبُ اَن مِن سنتِهم الصلوةُ عليهِم وانّ تركَه الصلوةَ عليهم عندَ دفنِهم منسوخٌ ۔

فانَّ سنتَهم كانتْ تاخيرَ الصلوٰةِ عليهِم ـ الَّا انه قدثبتْ بِكلِّ هٰذه المعانِى اَنَّ مِن سنتِهم ثبوتَ الصلوةِ عَليهِمْ امّا بعدَ حينٍ وامَّا قبلَ الدفنِ ـ

ثمَّ كانَ الكلامُ بينَ المختلفينَ فى وقتِها هٰذا انمَا هوَ فِى اثباتِ الصلوٰةِ عليهِم قبلَ الدفنِ او فِى تركِها البتَّةَ، فلمَّا ثبتَ فِى هذاالحديثِ الصلوٰةُ عليَهم بعدَ الدفنِ كانتِ الصلوٰةُ عليهم قبلَ الدفنِ احرٰى واولٰى ـ

এখান থেকে মূল বিষয়ের উপর ফল বের করা হচ্ছে, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আমাদের এ যুগে দুটি দলের আলোচ্য বিষয় হল, শহীদদের উপর দাফনের পূর্বে নামাযের হুকুম আছে কি না? যেহেতু হযরত উকবা রা.-এর উপরোক্ত রেওয়ায়াত দ্বারা দাফনের পর নামাযের হুকুম প্রমাণিত হয়েছে সেহেতু দাফনের পূর্বে তা উত্তমরূপে প্রমাণিত হবে। কারণ নামাযে জানাযার বিধিবদ্ধতা ও বাস্তবতা দাফনের পূর্বেই। যেহেতু দাফনের পর প্রমাণিত সেহেতু দাফনের পূর্বে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রমাণিত হবে। কাজেই শহীদের উপরও সাধারণ মৃতের ন্যায় জানাযা নামায আবশ্যক হবে।

যুক্তির সারমর্ম হল, হযরত উকবা রা.-এর রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। উহুদ যুদ্ধের আট বছর পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের শহীদদের কবরের পাশে গিয়ে জানাযা নামায আদায় করেছেন। এবার যদি শুহাদায়ে উহুদদের বিনা নামাযে দাফন করা হয়ে থাকে তাহলে এই নামায নামাযহীন দাফনের হুকুমকে রহিত করে দিয়ে নামায পড়ার হুকুম প্রমাণ করবে। আর যদি এ নামাযকে নফল মেনে নেয়া হয়, তবে প্রতিটি নফলের জন্য ফরযে কোন মূল থাকে। কাজেই উহুদের যুদ্ধের সময় জানাযা নামায ফরযরূপে আদায় করা হয়েছিল। এর আট বছর পর তাদের বৈশিষ্ট্যের কারণে নফলরূপে পুনরায় আদায় করা হয়েছে। এমতাবস্থায়ও শহীদের নামাযে জানাযার হুকুম প্রমাণিত হয়ে যায়।

যদি মেনে নেয়া হয় সাত আট বছর পরেই শহীদদের নামাযের হুকুম, তবুও ইজমালীভাবে শহীদের নামাযে জানাযার প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পক্ষের দাবী সাব্যস্ত হয়। যুক্তির দাবী তাই।

وَامَّا النظرُ فی ذالكَ فانّا رأينا الميتَ حتفَ انفهِ يُغسلُ ويُصلّى عليهِ ورأيناه اذا صلّى عليهِ ولم يُغسلْ كانَ فی حكمِ مَن لَم يُصلَّ عليهِ فكانتِ الصلوةُ عليه مُضمّنةً بالغسلِ الذیْ يتقدّمُها فانِ كانَ الغسلُ قد كانَ جازتِ الصلوةُ عليهِ وانِ لم يكنْ غسلَ لم يجُزِ الصلٰوةُ عليهِ ثم رأينا الشهيدَ قد سقطَ ان يُغسلَ فالنظرُ على ذالكَ ان يسقطَ ماهو مضمّن بحكم الغسلِ ففی هذا ما يوجبُ تركَ الصلوةِ عليهِ الاَّ انَّ فی ذالكَ معنًی وهو انّا رأينا غيرَ الشهيدِ يُغسلُ ليطهرَ وهو قبلَ ان يُغسلَ فی حكمِ غيرِ الطاهرِ لاينبغیْ الصلٰوةُ عليهِ ولادفنهُ على حالِه تلكَ حتى ينقلَ عنها بالغسلِ ثم رأينا الشهيدَ لابأسَ بدفنِه على حالِه تلكَ قبلَ ان يُغسلَ وهو فی حكمِ سائرِ الموتٰی الذينَ قد غسلُوا، فالنظرُ على ذالكَ ان يكونَ فی الصلوةِ عليهمْ فی حكمِ سائرِ الموتٰی الذينَ قد غُسلُوا، هذا هو النظرُ فی هذا البابِ معَ ماقدْ شهدَ له مِن الاٰثارِ وهو قولُ ابی حنيفةَ وابی يوسفَ ومحمّدٍ رحمهم اللهُ تعالٰی -

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

যে শহীদ হবে না, বরং স্বাভাবিক মৃত্যুতেই মরবে, তাকে গোসল দেয়া হয়, তার জানাযা নামায পড়া হয়। এবার যদি তাকে গোসল না দিয়ে নামায পড়া হয়, তবে এই মৃত সে মুর্দারের ন্যায়, যার উপর বিলকুল নামাযই পড়া হয় নি। বুঝা গেল মৃতের উপর নামায পড়ার হুকুম গোসলের অধীনস্থ। যদি গোসলের পর নামায পড়া হয়, তবে সে নামায ধর্তব্য। আর যদি গোসল ছাড়া নামায পড়া হয়, তবে সে নামায ধর্তব্য হয় না। এবার শহীদের অবস্থা দেখুন। তার ব্যাপারে গোসলের হুকুম নেই। অতএব, শহীদের উপর জানাযা নামাযও না হওয়া উচিত। কিন্তু এখানে আর একটি বিষয় হল, শহীদ ছাড়া অন্যদেরকেও গোসল দেয়া হয়, পাক করার জন্য। গোসল দেয়ার পূর্বে সে থাকে অপবিত্রের পর্যায়ে। যার উপর না নামায পড়া যায়, না তাকে দাফন করা যায়, যতক্ষণ না তাকে গোসল দিয়ে পবিত্র করা হয়। অথচ শহীদকে গোসল ছাড়া দাফন করা জায়েয আছে। যেহেতু দাফনের ব্যাপারে শহীদকে গোসলপ্রদত্ত মৃতের পর্যায়ভুক্ত মনে করা হয়, অতএব,

নামাযের ক্ষেত্রে তাকে গোসলপ্রদত্ত মৃতের পর্যায়ভুক্ত মনে করা উচিত। অতএব, গোসল না দেয়া সত্ত্বেও শহীদকে যেমন দাফন করা যায়, এরূপভাবে তার জানাযা নামায পড়া উচিত। যদি গোসল বর্জন দাফনের জন্য প্রতিবন্ধক না হয়, তবে নামাযের জন্য প্রতিবন্ধক হবে কেন? যুক্তির আলোকে তাই প্রমাণিত হয়।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নায়লুল আওতার ঃ ৩/২৭৬, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ ১/২৪০, নুখাবুল আফকার ঃ ৪/২৫৭, বযলুল মাজহুদ ঃ ৪/১৯০, তিরমিযী ১/২০১, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/৬৭-৭৭।

## باب الطفل يموت ايصلى عليه ام لا ؟

## অনুচ্ছেদ ঃ শিশু মারা গেলে তার জানাযা নামায হবে কিনা?

### মাযহাবের বিবরণ ঃ

১. কাতাদা, সাঈদ ইবনে জুবাইর, সুয়াইব ইবনে গাফালা, আমর ইবনে মুররা র. বলেন, নাবালেগ শিশুর জানাযা নামায বিধিবদ্ধ নয়।

২. ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, আওযাঈ, ইবরাহীম নাখঈ, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ বরং ইমাম চতুষ্ঠয় ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে শিশুর জানাযা নামায শুধু জায়েযই নয় বরং বালিগদের ন্যায় ওয়াজিব। ইমাম আহমদ র এর মতে শিশুর জন্মের পর জীবনের কোন নিদর্শন পাওয়া না গেলেও তার জানাযার নামায পড়া হবে। কিন্তু অন্যরা তাতে জন্মের পর জীবনের নিদর্শন পাওয়া যাওয়ার শর্ত আরোপ করেন।

وامَّا وجهُه من طريقِ النَّظرِ فَانا رأينَا الاطفالَ يغسلونَ باتفاقِ المسلمينَ على ذالكَ وقد رأينَا البالغينَ كلَّ من غُسِّل منهمْ صُلِّى عليه ومَن لم يغسلْ مِن الشهداءِ ففيه اختلافٌ،فمِن الناسِ مَن يُصلىْ عليهِ ومنهمْ مَن لايصلِّى عليهِ فكانَ الغسلُ لايكونُ الا وبعدَه صلٰوةٌ وقد يكونُ الصلٰوةُ ولا غسلَ قبلَها، فلمَّا كانَ الاطفالُ يُغسَّلونَ كما يغسلُ البالغونَ ثبتَ ان يصلّٰى عليهمْ كما يصلّٰى علىٰ البالغينَ، فهٰذا هو النظرُ فى هٰذا البابِ وقد وافقَ ماجرتْ عليه عادةُ المسلمينَ من الصلٰوةِ على الاطفالِ وهو قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمَّدٍ رحمهم اللهُ تعالىٰ -

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

সমস্ত উম্মত শিশুকে গোসল দেয়ার ব্যাপারে একমত। এদিকে আমরা দেখছি, যেসব বালিগকে গোসল দেয়া হয় তাদের জানাযা নামায পড়া হয় সর্বসম্মতিক্রমে। কিন্তু শহীদ যাদেরকে গোসল দেয়া হয় না, তাদের ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। এতে বুঝা গেল, নামাযের পূর্বে যাদের গোসল দেয়া হয় না, তারও কখনও কখনও জানাযার নামায হতে পারে। কিন্তু গোসল দানের পর জানাযা নামায হয় না এমন বলা যায় না। কাজেই শিশুকে যেহেতু বালিগদের ন্যায় গোসল দেয়া হয়, সেহেতু বালিগদের ন্যায় তার উপর জানাযা নামাযও হওয়া উচিত। যুক্তির আলোকে তাই বুঝা যায়।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নুখাবুল আফকার ঃ ৪/২৮৩-২৮৬, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/৭৭-৮২।

## باب المشى بين القبور بالنعال

## অনুচ্ছেদ ঃ কবরের মাঝে জুতা পায়ে হাঁটা

১. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইয়াযীদ ইবনে যুরাঈ', আসহাবে জাওয়াহিরের মতে কবরের মাঝে জুতা পায়ে হাঁটা মাকরূহ।

২. ইমাম আবু হানীফা, মালিক, শাফিঈ, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখঈ, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন, হাসান বসরী বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামী আইনবিদের মতে কবরের মাঝে জুতা পায়ে হাটা মাকরূহ নয় বরং বৈধ ও জায়েয।

ইমাম তাহাভী র. বলেন, জুতা পরে মসজিদে প্রবেশ করা ও নামায পড়া মাকরূহ নয়, অতএব কবরের মাঝে জুতা পায়ে চলাও উত্তমরূপে মাকরূহ হবে না।

## জুতা পরে মসজিদে প্রবেশ ও নামায আদায়

জুতা পায়ে মসজিদে প্রবেশ করা ও নামায পড়া সত্ত্বাগতভাবে জায়েয। তবে শর্ত হল, জুতা পবিত্র হতে হবে, মসজিদ ময়লা হওয়ার সম্ভাবনা না থাকতে হবে। পায়ের আঙ্গুলগুলো যমিনের উপর লাগার জন্য প্রতিবন্ধক না হতে হবে। যেহেতু আজকালকার জুতাগুলোতে এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না, পাক-পবিত্রতার প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করা হয় না, সেহেতু আদবের কাজ হল, জুতা খুলে নামায পড়া। এজন্য আমাদের ইসলামী আইনবিদগণ সুস্পষ্ট ভাষায় এর বিবরণ দিয়েছেন। فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى আয়াত দ্বারাও এর সমর্থন হয়। পবিত্রস্থানগুলোতে জুতা খোলাই আদবের দাবি।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নুখাবুল আফকার ঃ ৪/৩০৬, মুগনী ২/২২৩, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/৮২-৮৬।

# كتاب الزكوة
# যাকাত পর্ব

## باب الصدقة على بنى هاشم
## অনুচ্ছেদ ঃ বনু হাশিমকে যাকাত দান

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

সমস্ত আইম্মায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, বনু হাশিম তথা আলী, আব্বাস, জাফর, আকীল, হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিব এর পরিবার ও তাদের আযাদকৃত দাসের জন্য সদকায়ে ওয়াজিব হালাল নয়। নফল সদকা সম্পর্কে মতবিরোধ আছে।

১. ইমাম আবু হানীফা র.-এর এক উক্তি রেওয়ায়াত অনুযায়ী হাশিমী ও সৈয়দের জন্য বায়তুল মালের এক-পঞ্চমাংশের ধারা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর যাকাত ও সদকায়ে ওয়াজিবা হালাল।

অধিকাংশ হানাফীর মতে শাফিঈ ও হাম্বলীদের সহীহ উক্তি অনুযায়ী বনু হাশিমের জন্য নফল সদকা হালাল। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ মালিক শাফিঈ, আহমদ ইবনে হাম্বল, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখঈ র. বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামী আইনবিদ ও মুহাদ্দিসের মতে ও ইমাম আবু হানীফা র.এর প্রসিদ্ধ রেওয়ায়াত অনুযায়ী বনু হাশিমের জন্য সদকায়ে ওয়াজিবা ও নফল সবই হারাম। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইমাম তাহাভী র. এ কথাই উল্লেখ করেছেন। যুক্তির আলোকে এটাই প্রমাণ করেছেন।

وَالنظرُ ايضًا يدلُّ على استواءِ حكمِ الفرائضِ والتطوعِ فِى ذالكَ وذالكَ انارأينا غيرَ بنِى هاشمٍ منَ الاغنياءِ والفقراءِ فِى الصدقاتِ المفروضاتِ والتطوعِ سواءً، من حرّم عليهِ اخذُ صدقةٍ

مفروضةٍ حرِّم عَليه اخذُ صدقةٍ غير مفروضةٍ، فلمَّا حرِّم علٰى بنى هاشم اخذُ الصدقاتِ المفروضاتِ حرِّم عليهمْ اخذُ الصدقاتِ غيرِ المفروضاتِ، فهٰذا هو النظرُ فىْ هذا البابِ وهو قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمهمُ اللهُ، وقد اختلفَ عن ابى حنيفةَ فى ذٰلكَ فروىَ عنهُ انهُ قالَ لابأسَ بالصدقاتِ كلِّها علٰى بنىْ هاشمٍ وَذهب فِى ذالكَ عندنَا الى اَن الصدقاتِ انمَا كانتْ حرِّمتْ عليهِم مِن اجْلِ مَاجُعِل لهمْ فى الخمسِ من سَهمِ ذَوى القربٰى، فلمَّا انقطعَ ذالكَ عنهمْ ورجَع الى غيرِهم بموتِ رسولِ اللّٰهِ صلى اللهُ وسلَّم حلَّ لهمْ بذالكَ ماقدْ كانَ محرَّمًا عليهمْ مِن اَجلِ مَا قَدكانَ اُحلَّ لهُمْ-

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

বনু হাশিম ছাড়া অন্য সমস্ত লোক ধনী হোক বা গরীব তাদের জন্য নফল ও ওয়াজিব সদকার হুকুম সমান। ফকিরদের জন্য ওয়াজিব সদকা যেমন হালাল, তেমনই নফল সদকাও হালাল। ধনীদের জন্য উভয়টি হারাম। এতে বুঝা গেল, যার জন্য সদকা হালাল, তার জন্য ওয়াজিব ও নফল উভয় সদকাই হালাল, আর যার জন্য হারাম, তার জন্য উভয়টিই হারাম। অতএব, বনু হাশিমের জন্য যেহেতু ওয়াজিব সদকা হারাম, সেহেতু নফলও হারাম হওয়া উচিত।

## সদকা উসূলকারী হাশিমীর পারিশ্রমিক সদকা দ্বারা দেয়া যায় কি না?

১. হানাফীদের মতে হাশিমী কোন ব্যক্তি যদি সদকা উসুলের জন্য কর্মকর্তা বা কর্মচারী হয়, তবে তার পারিশ্রমিক যাকাত-সদকা থেকে দেয়া হারাম না হলেও মাকরূহে তাহরীমী। এর উপরই হানাফীদের ফতওয়া।

وقد كان ابى يوسف يكره لنبى هاشم الخ - দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

২. ইমাম মুহাম্মদ মালিক, শাফিঈ র.-এর মতে এবং আহমদ ইবনে হাম্বল র.-এর উক্তি অনুযায়ী হাশিমী ব্যক্তির জন্য সদকার কর্মকর্তা-কর্মচারী হয়ে সদকায়ে ওয়াজিবা অর্জন করা জায়েয আছে। وخالف ابا يوسف فى ذالك اخرون الخ দ্বারা তাঁদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইমাম তাহাভী র.এর মতে তার পারিশ্রমিক যাকাত-সদকা থেকে দেয়া যেতে পারে। যুক্তির আলোকে তিনি এটাই প্রমাণ করেছেন।

لِانه اِنما يجتعلُ على عمله وذالكَ قد يحلُّ للاغنياءِ فلمّا كانَ هٰذا لايحرّم على الاغنياءِ الذينَ يحرّم عليهم غِنَاهمُ الصدقةَ كانَ كذالكَ ايضا فى النظرِ لايحرّمُ ذالكَ على بنىْ هاشمٍ الذينَ يحرّمُ عليهم نسبُهم اخذَ الصدقةِ وقد رُوِى عن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلّم فِيما تصدّق به على بريرةَ رض انه اكلَ منه وقالَ هو عليهَا صدقةٌ ولنَا هديّةٌ، حدثَنا بذالكَ فهدٌ قالَ ثنَا محمدُ بنُ سعيدٍ الاصبهانىُّ قالَ انا شريكٌ عن منصورٍ عن ابراهيمَ عن الاسودِ عن عائشةَ رض قالتْ دخلَ على النبىُّ صلى اللهُ عليه وسلّم وَفِى البيتِ رِجلُ شاةٍ معلقةٍ فقالَ ما هٰذه؟ فقلتُ تصدّق بِه على بريرةَ رض فَاهدتْه لَنا فقالَ هو عَليها صدقةٌ وهو لَناهَديةٌ۔

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

সদকা উসূলকারী ধনী হলে তার জন্য নিজ পারিশ্রমিক সদকা থেকে নেয়া জায়েয আছে। অথচ তার উপর সদকা হারাম ছিল। অতএব, বিত্তশালী হওয়ার কারণে যার জন্য সদকা হারাম ছিল, তার জন্য সদকা গ্রহণ করা জায়েয হলে, যার জন্য বংশীয় কারণে সদকা হারাম অর্থাৎ, বনু হাশিমের জন্য, তার জন্য পারিশ্রমিকরূপে সদকা গ্রহণ করা হালাল হবে। কাজেই যুক্তির আলোকে হাশিমী সদকা উসুলকারীর জন্য স্বীয় পারিশ্রমিক গ্রহণ করার বৈধতা যুক্তির আলোকে প্রমাণিত হয়। কাজেই হাশিমী সদকা উসুলকারীর জন্য স্বীয় পারিশ্রমিক গ্রহণ করা যুক্তির আলোকে জায়েযই বুঝা যায়।

হযরত বারীরা রা. যে জিনিস সদকারূপে পেয়েছিলেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হাদিয়ারূপে দিয়েছিলেন এর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

هو عليها صدقة ولنا هدية ۔

অর্থাৎ, এটা বারীরার জন্য সদকা, আমার জন্য তার পক্ষ থেকে হাদিয়া। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা ভক্ষণও করেছেন। যেহেতু

বারীরার জন্য যেটি সদকা ছিল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মালিক হয়েছিলেন হাদিয়ারূপে এবং তিনি তা ভক্ষণও করেছিলেন, সেহেতু হাশিমী সদকা উসুলকারীর জন্য সদকা থেকে স্বীয় পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয হবে। কারণ, হাশিমী তার শ্রমের কারণে এর মালিক হয়েছেন. সদকারূপে নয়।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নুখাবুল আফকার ঃ ৫/৩-৫, শামী ২/৩৫০, যায়লাঈ ১/৩০৩, তাহতাভী ৩৯৩, তাতারখানিয়া ২/২৭৫, আলমগীরী ১/১৮৯, আলবাহরুর রায়িক ২/২৪৬, ২৪৭, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/৯৫-১১৬।

## باب المرأة هل يجوز لها ان تعطى زوجها من زكٰوة مالها ام لا ؟

## অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীর যাকাতের মাল থেকে স্বামীকে দেয়া জায়েয কিনা?

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. ইমাম শাফিঈ, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, সুফিয়ান সাওরী, আবু সাওর, আবু উবাইদ র. এর মতে, ইমাম আহমদ র.-এর এক উক্তি অনুযায়ী স্ত্রী কর্তৃক স্বীয় গরিব স্বামীকে যাকাত দেয়া জায়েয আছে। এতে তার যাকাত আদায় হয়ে যাবে। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা, মালিক, আবু বকর আবহারী র.-এর মতে এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র.-এর এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী স্ত্রী কর্তৃক স্বীয় স্বামীকে যাকাতের সম্পদ দেয়া জায়েয নেই। ইমাম তাহাভী র. এর উক্তির আলোকে এটাই প্রমাণিত হয়েছে। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

فَلَمَّا ثبتَ بِما ذكرنَا اَن سببَ المرأةِ الذىْ مُنِعَ زوجُها اَن يعطيَها مِن زكٰوةِ مالِه وان كانتْ فقيرةً هو كالسببِ الذى بينَه وبينَ والديهِ الذىْ يمنعُه من اِعطائِهما من زكٰوتِه واِن كانَا فَقِيرينِ ورأينَا الوالدينَ لايعطيانِه ايضا من زكٰوتِهما اِذا كانَ فقيرًا فكانَ الذى بينَه وبينَ والديهِ مِن النسبِ يمنعُه مِن اعطائِهمامِن الزكٰوةِ ويمنعُهما من اعطائِه من الزكٰوةِ فكذالكَ السببُ الذى بينَ الزوجِ والمرأةِ لمَّا كانَ يمنعُه من اعطائِها مِن

الزكوة كان ايضا يمنعها من اعطائه من الزكوة وقد رأينا هذا السبب بين الزوج والمرأة يمنع من قبول شهادة كل واحد منهما لصاحبه فجعلا فى ذالك كذوى الرحم المحرم الذى لايجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه ورأينا ايضا كل واحد منهما لايرجع فيما وهب لصاحبه فى قول من يجيز الرجوع فى الهبة فيما بين القريبين، فلما كان الزوجان فما ذكرنا قد جعلا كذوى الرحم المحرم فيما منع فيه من قبول الشهادة ومن الرجوع فى الهبة كانا فى النظر ايضا فى اعطاء كل واحد منهما صاحبه من الزكوة كذالك،فهذا هو النظر فى هذا الباب وهو قول ابى حنيفة رحمهم الله تعالى -

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, স্বামী যাকাতের মাল স্বীয় গরিব স্ত্রীকে দিতে পারে না। অথচ ভাই স্বীয় গরিব বোনকে যাকাত দিতে পারে। যদিও তার উপর সে বোনের ভরণ-পোষণের জিম্মাদারীও থাকুক না কেন। এতে বুঝা গেল, স্বামীর জন্য স্ত্রীকে যাকাত দিতে না পারার কারণ, ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নয়। অন্যথায় যে বোনের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ভাইয়ের উপর আছে সেই ভাই সে বোনকে যাকাত দিতে পারত না। বরং স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে যাকাত দিতে না পারার মূল কারণ, দাম্পত্য সম্পর্ক। যেরূপভাবে সন্তান ও মাতাপিতার মধ্যে যাকাতের প্রতিবন্ধক হল জন্মের সম্পর্ক। জন্মের সম্পর্কের কারণে সন্তান স্বীয় গরিব মাতাপিতাকে যাকাত দিতে পারে না। এরূপভাবে মাতাপিতাও স্বীয় মালের যাকাত গরিব সন্তানকে দিতে পারবে না। অর্থাৎ, জন্মের সম্পর্ক উভয়দিকে যাকাত প্রদানের জন্য প্রতিবন্ধক। প্রথমে প্রমাণিত হয়েছে যে, স্বামী স্ত্রীকে যাকাত দিতে না পারার কারণ বৈবাহিক সম্পর্ক। ভরণ-পোষণের দায়দায়িত্ব নয়।

অতএব, জন্মের সম্পর্ক যেরূপ উভয় দিকে যাকাত প্রদানে প্রতিবন্ধক, অনুরূপভাবে বৈবাহিক সম্পর্কও উভয়দিকে এর জন্য প্রতিবন্ধক। অতএব, এটা বলা ঠিক নয় যে, স্বামীর জন্য স্বীয় গরিব স্ত্রীকে যাকাত দেয়া জায়েয নেই, কিন্তু স্ত্রীর জন্য স্বীয় যাকাত আপন গরিব স্বামীকে দেয়া জায়েয আছে।

এই বৈবাহিক সম্পর্ক তাদের পরস্পরের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রতিবন্ধক। না স্বামীর সাক্ষ্য স্ত্রীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য, না স্ত্রীর সাক্ষ্য স্বীয় স্বামীর পক্ষে ধর্তব্য। এরূপভাবে যাদের মতে হেবা প্রত্যাহার জায়েয আছে, তাদের (হানাফীদের) মতে স্বামী-স্ত্রী কর্তৃক পরস্পর থেকে হেবা প্রত্যাহার করতে পারে না। স্বামী কোন কিছু স্ত্রীকে হেবা করলে, তা তার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিতে পারে না। এরূপভাবে স্ত্রী স্বামীকে কোন জিনিস হেবা করলে তা তার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিতে পারে না। যেহেতু স্বামী স্ত্রীকে আত্মীয় মাহরামের মত সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেহেতু যুক্তির দাবি হল, যাকাত দান নিষিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রেও তাদেরকে আত্মীয় মাহরামের ন্যায় সাব্যস্ত করা হবে, যেরূপভাবে আত্মীয় মাহরামের মধ্যে উভয় পক্ষ থেকে যাকাত দান নিষেধ, এরূপভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও উভয় পক্ষ থেকে যাকাত দান নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। কাজেই কোন এক পক্ষ থেকে নিষেধকে খাস করে অন্য পক্ষে অনুমতি প্রদানের অবকাশ কোথায়?

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নুখাবুল আফকার ঃ ৫/৮২, নায়লুল আওতার ঃ ৪/৬২, হিদায়া ঃ ১/১৮৬, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/১২৯-১৩৪।

## باب الخيل السائمة هل فيها صدقة ام لا ؟

## অনুচ্ছেদ ঃ সায়েমা ঘোড়ার যাকাত আছে কিনা?

**(যে পশু বছরের বেশির ভাগ সময় চারণভুমিতে চড়ে খায় তাকে সায়েমা বলে।)**

### মাযহাবের বিবরণ ঃ

ঘোড়া যদি নিজের বাহন অথবা বোঝা বহনে কিংবা জিহাদের জন্য হয় তবে সর্বসম্মতিক্রমে তাতে যাকাত নেই, ব্যবসার জন্য হলে তাতে সর্বসম্মতিক্রমে যাকাত ওয়াজিব। অবশ্য প্রজন্মের জন্য যে ঘোড়া থাকবে, অথবা যেসব ঘোড়া চরে খায় সেগুলো সম্পর্কে মতবিরোধ আছে।

১. ইমাম আবু হানীফা, হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান, ইবরাহীম নাখঈ ও যুফার র. প্রমুখের মতে প্রজন্মের জন্য চরে খাওয়া ঘোড়ায় যাকাত ওয়াজিব। যদি নর-মাদী উভয় প্রকার ঘোড়া থাকে, তবে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। শুধু নর হলে কিংবা শুধু মাদী হলে ইমাম আবু হানীফা র. থেকে এ সম্পর্কে দুটি রেওয়ায়াত আছে। প্রসিদ্ধ রেওয়ায়াত হল, যাকাত ওয়াজিব হবে না। কারণ, শুধু এক প্রকার হলে, প্রজন্ম বা বংশ বিস্তার উদ্দেশ্য করা সম্ভব নয়। فذهب قوم الى وجوب الصدقة فى الخيل اذا كانت ذكورا الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম শাফিঈ, মালিক, আহমদ ইবনে হাম্বল, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, হাসান বসরী, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন, আতা ইবনে আবু রাবাহ, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ র. ও আসহাবে জাওয়াহিরের মতে সায়েমা ও বংশবিস্তারের ঘোড়াতে যাকাত নেই। আমাদের মতে ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ র. এর উক্তির উপর ফতওয়া। অর্থাৎ, এ ধরনের ঘোড়ায় যাকাত নেই। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইমাম তাহাভী র. যুক্তির আলোকে এটা প্রমাণ করেছেন।

وَاما وجهُه مِن طريقِ النظرِ فانَّا رأينَا الذينَ يوجبونَ فِيها الزكٰوةَ لايُوجبونَها حتى تكونَ ذكورًا واناثًا يلتمسُ منها صاحبُها نسلَها ولايجبُ الزكوةُ فى ذكورِها خاصةً ولاَ فى اناثِها خاصةً وكانتِ الزكواةُ المتفقُ عليهَا فى المواشِى السائمةِ تجبُ فى الابلِ والبقرِ والغنمِ ذكورًا كانتْ كلُها او اِناثاً، فلمَّا استوىٰ حكمُ الذكورِ خاصةً فى ذالك وحكمُ الاناثِ خاصةً وحكمُ الذكورِ والاناثِ وَكانتِ الذكورُ من الخيلِ خاصةً والاناثُ منها خاصةً لاتجبُ فيها زكٰوةٌ كانَ كذالكَ فى النظرِ الاناثُ مِنها والذكورُ اِذا اجتمَعتْ لَاتجِبُ فِيها زكٰوةٌ۔

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

যাদের মতে সায়েমা ও বংশবিস্তারের ঘোড়ায় যাকাত ওয়াজিব, তাদের মতে নর, মাদী উভয় প্রকার ঘোড়া এক সাথে থাকা জরুরি। যাতে প্রজন্ম বিস্তারের উদ্দেশ্য লাভ সম্ভব হয়। যদি শুধু নর কিংবা শুধু মাদী থাকে, তবে তাদের মতেও যাকাত নেই। অথচ সায়েমা জন্তু যেমন উট, গাভী, বকরীতে যাকাত আছে। এগুলোর যাকাত সর্বাবস্থাতেই ওয়াজিব। চাই শুধু নর হোক, বা মাদী অথবা নর, মাদী উভয়টিই হোক। এতে বুঝা গেল, শুধু নর বা শুধু মাদীর হুকুম এবং নর-মাদী উভয়টি এক সাথে থাকার হুকুম সবই বরাবর। সায়েমা ঘোড়ার শুধু নর কিংবা শুধু মাদীতে তাদের মতে কোন যাকাত নেই। অতএব, নর-মাদী উভয়টি একত্রিত হলেও যাকাত না হওয়া উচিত। যাতে আলাদা ও সমষ্টি উভয় অবস্থাতে হুকুম সমান থাকে।

وحجةٌ اخرٰى انّا قد رأينَا البِغالَ والحَميرَ لازكٰوةَ فِيها وان كانتْ سائمةً والابلَ والبقرَ والغنمَ فِيها الزكٰوةُ اذا كانتْ سائمةً وانما الاختلافُ فى الخيلِ،فاردنَا ان ننظرَ اى الصِّنفينِ هِى به اشبهُ فنَعطفُ حكمَه على حكمِه،فرأينَا الخيلَ ذواتِ حوافرَ وكذالكَ الحميرُ والبغالُ هى ذواتُ حوافرَايضًا وكانتِ المواشىْ من البقرِ والغنمِ والابلِ ذواتِ اخفافٍ، فذُو الحافرِ بذى الحافرِ اشبهُ منه بذى الخفِ، فثبتَ بذالكَ ان لازكٰوةَ فى الخيلِ كما لَازكوةَ فِى الحميرِ والبِغَالِ وهٰذا قولُ ابى يوسفَ ومحمدٍ وهو احبُ القولينِ الينَا وقد روِى ذالكَ عن سعيدِ بن المسيبِ ـ

**দ্বিতীয় যুক্তি ঃ**

খচ্চর এবং গাধাতে সর্বসম্মতিক্রমে যাকাত নেই, যদিও সায়েমা হোক না কেন। উট, গাভী, বকরীতে সায়েমা হলে সর্বসম্মতিক্রমে যাকাত রয়েছে। ইখতিলাফ শুধু ঘোড়ার ব্যাপারে। অতএব, আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে, ঘোড়ার সাদৃশ্য খচ্চর ও গাধার সাথে নাকি উট, গাভী ও বকরীর সাথে? যে প্রকারের সাথে তার সাদৃশ্য হবে, সে প্রকারের হুকুম তার উপর লাগিয়ে দেয়া হবে। আমরা দেখি, উট, গাভী ও বকরী এ তিনটি বস্তুই টাপবিশিষ্ট। খচ্চর, গাধা উভয়টি খুর বিশিষ্ট, ঘোড়াও খুরবিশিষ্ট, টাপবিশিষ্ট নয়।

স্মর্তব্য ঃ উট, গাভী ও বকরীর পা এক ধরনের হয়। এগুলোকে আরবীতে বলে- خف আর গাধা, খচ্চর ও ঘোড়ার পা হয় আর এক ধরনের, এগুলোকে আরবী ভাষায় বলে- حافر

মোটকথা, ক্ষুর বিশিষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে ঘোড়ার সাদৃশ্য হল, গাধা ও খচ্চরের সাথে, গাভী, বকরী ও উটের সাথে নয়। কারণ, এ তিনটি টাপ বিশিষ্ট। কাজেই গাধা ও খচ্চরে যেমন যাকাত নেই, এরূপভাবে ঘোড়ায়ও যাকাত না হওয়া উচিত। যাতে সমস্ত খুর বিশিষ্ট জন্তুর হুকুম এক সমান হয়। যুক্তির দাবি এটাই।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য হিদায়া ঃ ১/১৭১, বাদায়ি' ২/৩৪, নুখাবুল আফকার ঃ ৫/৯১-৯২, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/১৩৪-১৪২।

## باب الزكوة هل ياخذها الامام ام لا ؟

## অনুচ্ছেদ ঃ রাষ্ট্রপ্রধান যাকাত নিবেন কিনা?

মুসলিম হুকুমতে মুসলিম শাসকের জন্য স্বীয় নিযুক্ত সদকা উসুলকারীদের মাধ্যমে বল প্রয়োগে সদকায়ে ওয়াজিবা ও উসর ইত্যাদি উসুল করার কি হুকুম? এ প্রসঙ্গে ইমাম তাহাভী র. এ অনুচ্ছেদটি কায়েম করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে।

১. হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে জুবাইর, মায়মূন ইবনে মিহ্রান, ইবরাহীম নাখঈ, ইমাম মাকহুল র. প্রমুখের মতে বর্তমান শাসকের জন্য মুসলমানদের থেকে জোরপূর্বক স্বীয় সদকা উসুলকারীদের মাধ্যমে সদকা উসুল করা জায়েয নেই বরং মুসলমানদের এখতিয়ার আছে, চাই নিজ মর্জি অনুযায়ী মুসলিম শাসকের নিকট পৌঁছে দিক অথবা নিজের মালের যাকাত, সদকা, উশর ইত্যাদি নিজেই গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দিক। এর এখতিয়ার তাদের আছে। কোন প্রকার বল প্রয়োগ করা তাদের উপর জায়েয নেই। অবশ্য অমুসলিম থেকে বলপূর্বক নেয়া জায়েয আছে। গ্রন্থকার فذهب قوم الخ দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ, মালিক, আহমদ, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ র. বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে ইমামুল মুসলিমীন তথা মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য মানুষের কাছ থেকে যাকাত উসুলের জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করার এখতিয়ার আছে। তারা জনগণ থেকে রীতিমত যাকাত উসুল করবে। অতঃপর ইসলামী সরকারের পক্ষ থেকে স্বীয় ব্যয় খাতে পৌঁছে দিবে। এমনিভাবে মুসলমানদেরকে এখতিয়ার দিয়ে দেয়াও জায়েয আছে যে মসুলমানরা নিজ নিজ সম্পদের যাকাত হিসাব করে গরিবদের মধ্যে বন্টন করবে। এতে মূলতঃ মুসলমান মালিকদের কোন এখতিয়ার নেই; বরং আসল এখতিয়ার বর্তমান শাসকের। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তাছাড়া হানাফীদের মতে, জাহিরী সম্পদ ও বাতিনী সম্পদ সবগুলোর হুকুম একরকম। সদকা উসুলকারী জাহিরী মাল থেকে যেরূপ সদকা উসুল করবে এরূপভাবে বাতিনী মাল থেকেও সদকা উসুল করতে পারবে।

واما وجهُه مِن طريقِ النظرِ فاِنَّا قد رأينَاهم اَنهم لايَختلفونَ اَنَّ لِلامامِ ان يبعثَ الى اربابِ المواشىْ السائمةِ حتى ياخذَ منهم صدقةَ مواشيْهم اِذا وجبتْ فيها الصدقةُ وكذالكَ يفعلُ فى ثِمارِهم ثم يضعُ ذالكَ فى مواضعِ الزكٰوة على ما امَره به عز وجلَّ لايابٰى ذالكَ احدٌ من المسلمينَ،فالنظرُ على ذالكَ ان يكونَ بقيةُ الاموالِ من الذهبِ والفضةِ واموالِ التجاراتِ كذالكَ فاما معنٰى قولِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ ليسَ على المسلمينَ عشورٌ، اِنما العشورُ على اليهودِ والنصارٰى فعلى ماقد فسرتُه فيما تقدمَ من هذا البابِ وقد سمعتُ ابا بكرة يحكِىْ ذالك عن ابى عمرَ الضريرِ رضـ وهٰذا كله قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحـ-

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

সায়েমা জন্তু ও ফলের যাকাত উসুল করার জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা যেহেতু তাদের মতেও বৈধ, সেহেতু বাকি অন্যান্য সম্পদ অর্থাৎ, স্বর্ণ-রূপা ও বাণিজ্যিক মালের যাকাত উসুল করার জন্যও ইমামের পক্ষ থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিযুক্ত করা জায়েয হওয়া উচিত। যাতে সমস্ত যাকাতের মালের হুকুম এক রকম হয়। যুক্তির দাবি এটাই।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নুখাবুল আফকার ঃ ৫/১০৯, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/১৪৫-১৫০।

## باب زكٰوة مايخرج من الارض

## অনুচ্ছেদ ঃ জমিনের উৎপন্ন জিনিসের যাকাত

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. ইমাম শাফিঈ, মালিক, আহমদ, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, সুফিয়ান সাওরী, হাসান বসরী, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ র.-এর মতে জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ যদি পাঁচ ওয়াসাক পর্যন্ত পৌঁছে তবে তাতে সদকা অর্থাৎ, উশর ওয়াজিব, অন্যথায় নয়। স্পষ্ট বিষয়, এক ওয়াসাক হয় ষাট সা' সমান। অতএব, পাঁচ ওয়াসাকে তিন শ' সা' হবে।

বর্তমান ওজনে পাঁচ ওয়াসাক হয় ৯ কুইন্টাল ৪৪ কিলো ৭৮৪ গ্রাম। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা, যুফার, হাম্মাদ, যুহরী, ইবরাহীম নাখঈ, মুজাহিদ র. এর মতে জমির উৎপন্ন ফসলের কোন নেসাব নির্ধারিত নেই, চাই কম হোক বা বেশি। এতে উশর ওয়াজিব। ইমাম তাহাভী র. যুক্তির মাধ্যমে এটাই প্রমাণ করেছেন। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে

والنظرُ الصحيحُ ايضا يدلُّ على ذالكَ وذالكَ انا رأينَا الزكواتِ تجبُ فى الاموالِ والمواشىْ فى مقدارٍ منها معلومٌ بعدَ وقتٍ معلومٍ وهو الحولُ فكانتْ تلكَ الاشياءُ تجبُ بمقدارٍ معلومٍ ووقتٍ معلومٍ،ثم رأينَا ماتخرجُ الارض يؤخذُ منه الزكٰوةُ فى وقتِ ما تخرجُ ولا ينتظرُبه وقتٌ، فلمَّا سقطَ ان يكونَ له وقتٌ يجبُ فيه الزكٰوةُ بحلوله سقطَ ان يكونَ لهُ مِقدارٌ يجب الزكٰوة فيهِ ببُلوغه فيكونُ حكمُ المقدارِ والميقاتِ فى هٰذا سواء اذا سقَط احدُهما سقَطَ الاخرُكما كانَ فى الاموالِ التى ذكرنَا سواءٌ لمَّا ثبتَ احدُهما ثَبَتَ الاخرُ فهٰذا هو النظرُ وهو قولُ ابى حنيفةَ رحمة الله عليه ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

সম্পদ ও চতুষ্পদ জন্তুতে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য দুটি শর্ত আছে–

১. বিশেষ পরিমাণ। এ কারণে যাকাতের সম্পদ ও যাকাতের জন্তুগুলোতে একটি নেসাব নির্ধারিত আছে। যদি সে নেসাব পর্যন্ত না পৌঁছে তবে তাতে যাকাত নেই।

২. একটি বিশেষ সময় অতিক্রমণ। এ কারণে বৎসর ঘুরে আসলে পরে যাকাত দিতে হয়, অন্যথায় নয়। কাজেই জমির উৎপন্ন জিনিসের জন্য সর্মসম্মতিক্রমে কোন মেয়াদ নেই। যা অতিক্রান্ত হওয়ার পর উশর ওয়াজিব হয়। বরং জমি থেকে উৎপন্ন হওয়া মাত্রই এগুলোর সদকা আদায় করতে হয়। জমি থেকে উৎপন্ন জিনিসে যেহেতু সুনির্দিষ্ট মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার শর্ত বাদ

পড়ে গেছে, সেহেতু বিশেষ পরিমাণের শর্তও বাদ পড়া উচিত। কারণ, অন্যান্য মালে উভয় শর্ত একসাথে প্রমাণিত হওয়া জরুরি। অতএব, জমির উৎপন্ন ফসলের বাদ পড়ার জন্য এক সাথে হওয়া উচিত। যুক্তির আলোকে তাই প্রমাণিত হয়।

## পাঁচ ওয়াসাকের পরিমাণ

বর্তমান যুগের কিলোগ্রাম হিসেবে এক ওয়াসাকের ওজন হল– এক কুইন্টাল আটাশি কিলো নয়শত ছাপ্পান্ন গ্রাম ও আটশত মিলিগ্রাম।

✪ পাঁচ ওয়াসাকের ওজন ৯ কুইন্টাল ৪৪ কিলো ৭৮৪ গ্রাম।

**হিসাবের চিত্র**

✪ এক ওয়াসাক হয় ৬০ সা। –তিরমিযী ঃ ১/১৩৬

✪ এক সা ওজন হয় ১২ মাশার তোলায় ২৭০ তোলা। –জাওয়াহিরুল ফিকহ ঃ ১/৪২৮

✪ ১২ মাশার এক তোলা বর্তমান কালের গ্রাম হিসেবে ১১ গ্রাম ৬৬৪ মিলিগ্রাম সমান।

✪ অতএব, ১ সা ওজন সর্বমোট হবে ৩ কিলো ১৪৯ গ্রাম ২৮০ মিলিগ্রাম।

✪ অতএব, ৬০ সা এর এক ওয়াসাকের ওজন হবে ১ কুইন্টাল ৮৮ কিলো ৯৫৬ গ্রাম ৮০০ মিলিগ্রাম সমান।

✪ ৫ ওয়াসাকের ওজন সর্বমোট ৯ কুইন্টাল ৪৪ কিলো ৭৮৪ গ্রাম।

হিসাবের এই চিত্র ঈযাহুন নাওয়াদির ঃ ২/১৮ নামক গ্রন্থে আছে।

## পাঁচ উকিয়ার পরিমাণ

এক উকিয়া হয় ৪০ দিরহাম সমান। ৫ উকিয়া হয় ২০০ দিরহাম সমান। –তিরমিযী ঃ ১/১৩৬

১২ মাসার ১ তোলা হিসেবে ১ উকিয়ার ওজন ১০.৫ তোলা হয়। বর্তমান গ্রাম হিসেবে ১২ মাসার ১ তোলা ১১ গ্রাম ৬৬৪ মিলিগ্রাম সমান হয়। দশ গ্রাম তোলা হিসেবে ১২ তোলা ২ গ্রাম ৪৭২ মিলিগ্রাম হয়। –ঈযাহুন নাওয়াদির ঃ ২/১৯

অনেকে পুরনো ওজনের সাথে বর্তমান কালের সঠিক ওজনের বিবরণ দিতে পারে না। আধুনিক ওজনের বিবরণ দিতে না পারার কারণে অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। তাই নিম্নে পুরনো ও বর্তমান ওজনের একটি নকশা প্রদান করা হল ঃ

## বর্তমান ওজনের চিত্র

| পুরনো ওজন | | | | বর্তমান ওজন |
|---|---|---|---|---|
| ১ গ্রাম | | | | ১০০০ মিলিগ্রাম |
| ১ কিলো | | | | ১০০০ গ্রাম |
| ১ মাশা | ৮ রতি | | | ৯৭২ মিলিগ্রাম |
| ১ তোলা | ১২ মাশা | ৯৬ রতি | | ১১ গ্রাম ৬৬৪ মিলিগ্রাম |
| ৫২.৫ তোলা | রূপার নেসাব | | | ৬১২ গ্রাম ৩৬০ মিলিগ্রাম |
| ৭.৫ তোলা | স্বর্ণের নেসাব | | | ৮৭ গ্রাম ৪৮০ মিলিগ্রাম |
| মোহরে ফাতিমী | ১৩১ তোলা ৩ মাসা | | | ১.৫ কিলো ৩০ গ্রাম ৯০০ মিলিগ্রাম |
| সর্বনিম্ন মোহর | ১০ দিরহাম | ২ তোলা ৭.৫ মাশা | | ৩০ গ্রাম ৬১৮ মিলিগ্রাম |
| ১ উকিয়া | ৪০ দিরহাম | ১০.৫ তোলা | | ১১২ গ্রাম ৪৭২ মিলিগ্রাম |
| ৫ উকিয়া | ২০০ দিরহাম | ৫২.৫ তোলা | | ৬১২ গ্রাম ৩৬০ মিলিগ্রাম |
| ১ ইস্তার | ৬.৫ দিরহাম | ১ তোলা ৮ মাশা ২ রতি | | ১৯ গ্রাম ৯০১$\frac{২৮}{৪০}$ মিলিগ্রাম |
| ৪০ ইস্তার | ২৬০ দিরহাম | ৬৮ তোলা ৩ মাশা | | ৭৯৬ গ্রাম ৬৮ মিলিগ্রাম |
| ১ ওয়াসাক | ৬০ সা | ১৬,২০০ তোলা | | ১ কুইন্টাল ৮৮ কিলো ৯৫৬ গ্রাম ৮০০ মিলিগ্রাম |
| ৫ ওয়াসাক | ৩০০ সা | ৮১,০০০ তোলা | | ৯ কুইন্টাল ৪৪ কিলো ৭৮৪ গ্রাম |
| মিসকাল | ১০০ জব | ৪৩১ মাশা | | ৪ গ্রাম ৩৭৪ মিলিগ্রাম |
| রতল | ইরাকি | ১৩০ দিরহাম | ৩৪ তোলা ১.৫ মাসা | ৩৯৮ গ্রাম ৩৪ মিলিগ্রাম |
| | হিজাযী | ১৯৫ দিরহাম | ৫১$\frac{৩}{১৬}$ তোলা | ৫৯৭ গ্রাম ৫১ মিলিগ্রাম |
| | শামী | | ২০$\frac{৩}{৪}$ তোলা | ২ কিলো ১২২ গ্রাম ৮৮৪ মিলিগ্রাম |
| মুদ | হিজাযী | ২৬০ দিরহাম | ৬৮ তোলা ৩ মাশা | ৭৯৬ গ্রাম ৬৮ মিলিগ্রাম |
| | শামী | ২ সা | ৫৪০ তোলা | ৬ কিলো ২৯৮ গ্রাম ৫৬০ মিলিগ্রাম |
| মন | ২৬০ | দিরহাম | ৬৮ তোলা ৩ মাশা | ৭৯৬ গ্রাম ৬৮ মিলিগ্রাম |
| সা | ইস্তার হিসেবে | ১৬০ ইস্তার | ২৭০ তোলা | ৩ কিলো ১৪৯ গ্রাম ২৮০ মিলিগ্রাম |
| | মিসকাল হিসেবে | ৭২০ মিসকাল | ২৭০ তোলা | ৩ কিলো ১৪৯ গ্রাম ২৮০ মিলিগ্রাম |
| | দিরহাম হিসেবে | ১,০৪০ দিরহাম | ২৭৩ তোলা | ৩ কিলো ১৮৪ গ্রাম ২৭২ মিলিগ্রাম |
| | রতল হিসেবে | ৮ রতল ইরাকি | ২৭৩ তোলা | ৩ কিলো ১৮৪ গ্রাম ২৭২ মিলিগ্রাম |
| | রতল হিসেবে | হিজাযী ৫$\frac{১}{৩}$ রতল | ২৭৩ তোলা | ৩ কিলো ১৮৪ গ্রাম ২৭২ মিলিগ্রাম |
| | রতল হিসেবে | ১$\frac{১}{২}$ রতল শামী | ২৭৩ তোলা | ৩ কিলো ১৮৪ গ্রাম ২৭২ মিলিগ্রাম |
| | মুদ হিসেবে | ৪ মুদ হিজাযী | ২৭৩ তোলা | ৩ কিলো ১৮৪ গ্রাম ২৭২ মিলিগ্রাম |
| | | অর্ধ মুদ শামী | ২৭৩ তোলা | ৩ কিলো ১৮৪ গ্রাম ২৭২ মিলিগ্রাম |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ফরক | উক্তি ১ | ২ সা মিসকাল হিসেবে | ২১৬০ মিসকাল ৭১০ তোলা | ৯ কিলো ৪৪৭ গ্রাম ৮৪০ মিলিগ্রাম |
| | উক্তি ২ | ১৬ রতল | ৫৪৬ তোলা | ৬ কিলো ৩৬৮ গ্রাম ৫৪৪ মিলিগ্রাম |
| | উক্তি ৩ | ১২ মুদ দিরহাম হিসেবে | ৩১২০ দিরহাম ১৯ তোলা | ৯ কিলো ৫৫২ গ্রাম ৮১৬ মিলিগ্রাম |
| | উক্তি ৪ | ২.৫ সা | ৬৭০০ তোলা | ৭ কিলো ৮৭৪ গ্রাম ২০০ মিলিগাম |
| | উক্তি ৫ | ১২০ রতল | ৪৯৫ তোলা | ৪৭ কিলো ৭৬৪ গ্রাম ৮০ মিলিগ্রাম |
| | উক্তি ৬ | ৩৬ রতল | ১২২৮০ তোলা ৬ মাসা | ১৪ কিলো ৩৩৯ গ্রাম ২২৪ মিলিগ্রাম |
| সাদকায়ে ফিতরের নেসাব | অর্ধ | মিসকাল অথবা ইস্তার হিসেবে | ১৩৫ তোলা | ১.৫ কিলো ৭৪ গ্রাম ৬৪০ মিলিগ্রাম |
| | সা | দিরহাম অথবা রতল অথবা মুদ | ১৩৬.৫ তোলা | ১.৫ কিলো ৯২ গ্রাম ১৩৬ মিলিগ্রাম |

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নুখাবুল আফকার ঃ ৫/১৩৫-১৩৯, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/১৫৯-১৭৪।

## باب الخرص

## অনুচ্ছেদ ঃ অনুমান করা

### خرص-এর অর্থ ঃ

এর আভিধানিক অর্থ হল, আন্দাজ করা। যাকাত পর্বের পরিভাষায় এর অর্থ হল, শাসক ক্ষেত ও বাগানে ফল পাকার পূর্বে কোন মানুষ পাঠাবেন, যে আন্দাজ করবে, এ বছর কি পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হচ্ছে। এই আন্দাজ সম্পর্কে মতবিরোধ হয়েছে।

### মাযহাবের বিবরণ ঃ

১. ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমদ ইবনে হাম্বল, হাসান বসরী, যুহরী, আতা ইবনে আবু রাবাহ, আমর ইবনে দিনার, কাসিম ইবনে মুহাম্মদ, আবদুল করিম ইবনে আবুল মুখারিক, আবু সাওর র. প্রমুখের মতে শাসকের পক্ষ থেকে অনুমান বিশেষজ্ঞ পাঠিয়ে ফলের যোগ্যতা প্রকাশিত হওয়ার পর উৎপন্ন ফসলের অনুমান করিয়ে উশরের পরিমাণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেওয়া জায়েয আছে। فذهب قوم الخ দ্বারা ইমাম তাহাভী র. তাঁদেরই উদ্দেশ্য করেছেন। অবশ্য তাঁদের মাঝে সামান্য মতবিরোধ আছে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. এর মতে আন্দাজের মাধ্যমে যতটুকু পরিমাণ প্রমাণিত হবে, উশর উসুল করার সময় তন্মধ্য থেকে এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ ছেড়ে দিয়ে বাকী উৎপন্ন ফসলের উশর উসুল করতে হবে। কারণ,

আন্দাজে ভুলও হতে পারে। তাছাড়া উৎপন্ন ফসল পরিপক্ক হতে হতে কিছু পরিমাণ নষ্টও হয়ে যেতে পারে।

ইমাম মালিক র.-এর মতে এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ বাদ দিয়ে বাকী অংশের উশর সরকার উসুল করবে এবং এ পরিমাণের উশর মালিক নিজ থেকে গরিবদের মাঝে বণ্টন করে দিবে।

ইমাম শাফিঈ র. -এর মতে উশর উসুল করার সময়, প্রকৃত উৎপাদন নির্ণয় করে উশর উসুল করতে হবে। এক-তৃতীয়াংশ অথবা এক-চতুর্থাংশ ব্যয়ের নামে বাদ দেয়া হবে।

২. ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, সুফিয়ান সাওরী, আমির শা'বী র. প্রমুখের মতে ফল ছেড়ার পূর্বে এবং ফসল কেটে তৈরি করার পূর্বে আন্দাজ লাগিয়ে উশরের পরিমাণের সিদ্ধান্ত করা মাকরূহ। এখানে وخالفهم فى ذالك اخرون الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরই বুঝাতে চেয়েছেন।

তবে তাদের মধ্যে সামান্য মতবিরোধ আছে।

ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ র.-এর মতে উশর উসুল করার পূর্বে এতটুকু পরিমাণ ব্যতিক্রম তথা বাদ দেয়া হবে যতটুকু মালিক ও তার পরিবার পরিজনের জীবিকা নির্বাহের জন্য যথেষ্ট হয়। যেটাকে উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ ভাষায় বর্ণনা করা হয়।

ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে, আন্দাজ করার সময় প্রকৃত পরিমাণ থেকে এক-তৃতীয়াংশ অথবা এক-চতুর্থাংশ বাদ দিয়ে আন্দাজ করতে হবে। কারণ, উৎপন্ন ফসল পরিপক্ক হয়ে তৈরি হওয়া পর্যন্ত এতটুকু পরিমাণ শুকিয়ে অথবা ঝড়ে পড়ে কিংবা অন্য কোন কারণে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ বিষয়টিই হাদীসে নিম্নোক্ত ভাষায় এসেছে–

اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع-

وَامَّا وجهُه مِن طريقِ النظرِ فَانَّا قد رأينَا الزكواتِ تجبُ فِى اشياءَ مختلفةٍ منها الذهبُ والفضةُ والثمارُ التى تُخرجُها الارضُ والنخلُ والشجرُ والمواشىْ السائمةُ فكلٌّ قدْ اجمعَ اَن رجلاً لَو وجبتْ عليهِ على مالِه وهو ذهبٌ او فضةٌ او ماشيةٌ سائمةٌ فسلَّم ذالكَ له المصدِّقُ علٰى مَالايجوزُ عليه البياعاتُ اَن ذالكَ غيرُ

جائزٍ له، الاترى ان رجلاً لو وجبتْ عليهِ فى دراهمِه الزكوةُ فباعَ ذالكَ منه المصدقُ بذهبٍ نسيئةً انّ ذالكَ لايجوزُ ـ

وَكذالك لو بَاعه مِنه بذهبٍ ثم فارقَه قبلَ ان يقبضَه لم يجُزْ ذالكَ وكذالكَ لو وجبتْ عليهِ فى ماشيةٍ الزكٰوةُ ثم سلّم ذالكَ له المصدّقُ ببدلٍ مجهولٍ او ببدلٍ معلومٍ الى اجَلٍ مجهولٍ فذالكَ كلّه حرامٌ غيرُ جائزٍ، فكانَ كلمَا حرمَ فى البياعاتِ فى بيعِ الناسِ ذالكَ بعضِهم من بعضٍ قد دخلَ فيهِ حكمُ المصدّقِ فى بيعِه اياهُ مِن ربِّ المالِ الذىْ فيه الزكوةُ التىْ يتولّي المصدقُ اخذَها مِنه، فلَمَا كانَ ماذكرنَا كذالكَ فى الاموالِ التى وَصفنَا كانَ النظرُ علىٰ ذالكَ ايضًا ان يكونَ كذالكَ حكمُ الثمارِ، فكمَا لايجوزُ بيعُ رطبٍ بتمرٍ نسيئةً فى غيرِمَا فيه الصدقاتُ فكذالكَ لايجوزُ فيمَا فيهِ الصدقاتُ فيما بينَ المصدقِ وبينَ ربِّ المالِ فَهذا هو النظرُ ايضا فِى هذا البابِ وقد عَاد ذالكَ ايضا اِلىٰ ماصَرفنَا اليه الاٰثارَ المرويةَ عنْ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ التى قدَّمنا ذكرَها فبِذالكَ نأخذُ وهو قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمهمُ اللهُ تعالى ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

আন্দাজের মাধ্যমে যে পরিমাণ উৎপাদন প্রমাণিত হবে, তার উশর তখনই প্রথমে কর্তিত ফল থেকে যদি নেয়া হয়, তবে একদিকে গাছের ফল হবে, অপরদিকে হবে কর্তিত ফল। কারণ, সদকা উসূলকারীর জন্য সুনির্দিষ্ট গাছের ফল থেকে উশর নেয়া উচিত ছিল। কিন্তু সে এটা মালিকের কাছে রেখে এর পরিবর্তে কর্তিত ফল নিচ্ছে। আর উভয়ের বিনিময় হচ্ছে অনুমানের মাধ্যমে। সম্পদের মালিক ও সদকা উসূলকারীর মাঝে আসন্ন সংঘটিতব্য এই লেনদেন হবে মুযাবানার ন্যায়। যা সাধারণ বেচাকেনায় জায়েয নেই। আর যদি এই উৎপাদন আন্দাজ করে রেখে দেয়া হয় এবং এই হিসাবের পর কর্তিত ফল সম্পদের মালিক থেকে উসূল করা হয় এবং ফল পাকার পর পুনরায় এ উৎপাদিত ফসল ওজন করে এর প্রকৃত পরিমাণ জানা না হয়, তবে এমতাবস্থায়

মালের মালিক এবং সদকা উসূলকারীর মাঝে সংঘটিত এই লেনদেন শুকনা খেজুরের বিনিময়ে বাকিতে তাজা খেজুর বিক্রির মত হয়ে যাবে। এটাও সাধারণ বেচাকেনাতে নাজায়েয।

এবার চিন্তার বিষয় হল, যে ধরনের লেন-দেন সাধারণ বেচাকেনা ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে জায়েয নেই, এরূপ লেন-দেন সদকা উসূলকারী ও মালের মালিকের মাঝে জায়েয হবে কিনা। আমরা লক্ষ্য করছি, বিভিন্ন জিনিসের সদকা ওয়াজিব হয়, যেমন– স্বর্ণ, রূপা, ফল এবং সায়েমা জন্তু। এসব জিনিস থেকে যদি স্বর্ণ, রূপা অথবা সায়েমা জন্তুর উপর যাকাত ওয়াজিব হয়, আর এই সদকা আদায়ের সময় সদকা উসূলকারী ও মালের মালিকের মাঝে এরূপ কোন লেন-দেন হয়, যা সাধারণ বেচাকেনাতে জায়েয নেই, তবে সর্বসম্মতিক্রমে এই লেন-দেন সে সদকা উসূলকারী ও মালের মালিকের জন্যও নাজায়েয হয়। যেমন– কোন ব্যক্তির রূপার টাকার উপর যাকাত ওয়াজিব হল, সদকা উসূলকারী এই যাকাতের অংশ মালের মালিকের নিকট স্বর্ণের বিনিময়ে বাকিতে বিক্রি করে দিল, তবে এটা জায়েয নেই। এরূপভাবে যদি যাকাত উসূলকারী যাকাতের অংশকে স্বর্ণের বিনিময়ে নগদ বিক্রি করে, কিন্তু হস্তগত করার পূর্বে একজন অপরজন থেকে পৃথক হয়ে যায়, অথবা কারও জন্তুর উপর যাকাত ওয়াজিব হয়, আর সদকা উসূলকারী এই যাকাতের অংশকে মালিকের নিকট অজানা বিনিময়ে বিক্রি করে দিল, তাহলে যদি জানা বিনিময়ের বিপরীতেই বিক্রি করে, কিন্তু পরিশোধের মুদ্দত নির্ধারিত না করে, তবে এসব ছুরতে সদকা উসূলকারীর এসব লেন-দেন বিলকুল জায়েয নেই।

সারকথা, যেসব জিনিস সদকা ওয়াজিব হয়, সেগুলো থেকে স্বর্ণ, রূপা ও সায়েমা জন্তু সম্পর্কে সবাই একমত যে, এগুলোতে ক্রেতা-বিক্রেতার জন্যও এরূপ লেন-দেন নাজায়েয। এবার মত পার্থক্য হল শুধু ফলের বেলায়। অতএব, যুক্তির দাবি হল, অন্য সদকার দ্রব্য যেমন স্বর্ণ, রূপা ও সায়েমা জন্তুর যে হুকুম, ফলেরও যেন সে হুকুম হয়, অর্থাৎ, এতেও সদকা পরিশোধের সময় এরূপ লেন-দেন নাজায়েয, যেগুলো সাধারণ বেচা-কেনায় নাজায়েয। বস্তুত আন্দাজের উপরোক্ত ছুরতে সদকা উসূলকারী ও সম্পদের মালিকের মধ্যে এরূপ লেন-দেন হয়, যেগুলো সাধারণ বেচা-কেনায় ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য জায়েয নেই। কাজেই অনুমান করে সদকা উসূলকারীর জন্য উশর আদায় করা জায়েয হবে না, বরং ফল পাকার পর পুনরায় ওজন করে প্রকৃত উৎপাদন নির্ণয় করে তা থেকে উশর উসূল করতে হবে।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নুখাবুল আফকার ঃ ৫/১৫১, ১৫২, বযলুল মাজহুদ ঃ ৩/৩০, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/১৬৭-১৭৪।

## باب مقدار صدقة الفطر

## অনুচ্ছেদ ঃ সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. ইমাম শাফিঈ, মালিক, আহমদ ইবনে হাম্বল, আবুল আলিয়া, মাসরূক, আবু কিলাবা, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ র. প্রমুখের মতে সদকায়ে ফিতরে চাই গম দিক অথবা যব অথবা খেজুর কিংবা কিসমিস, সবগুলোতে মাথাপিছু এক সা' ওয়াজিব হয়। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, আতা ইবনে আবু রাবাহ, সাঈদ ইবনে জুবাইর, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, সুফিয়ান সাওরী, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, মুজাহিদ, ইবরাহীম নাখঈ, উমর ইবনে আবদুল আযীয র. ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামী আইনবিদের মতে গমে অর্ধ সা' আর অন্যান্য জিনিসে এক সা' ওয়াজিব হয়। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে কিসমিসেও অর্ধ সা' ওয়াজিব।

ثُمَّ النظرُ ايضًا فقدْ دلَّ علٰى ذالكَ وذالكَ اَنَّا رأيناهم قَد اَجمعُوا علٰى اَنَّهَا مِنَ الشعيرِ والتمرِ صاعٌ فنظَرنَا فِى حكمِ الحنطةِ فِى الاشياءِ التىْ تؤدّى عَنها التمرُ والشعيرُ كيفَ هُوَ؟ فوجَدْنا كفاراتِ الاَيمانِ قَد اجمعَ اَن الاِطعامَ فِيها مِن هٰذه الاصنافِ ايضًا ثمَّ اختلِفَ فِى مقدارِهَا مِنها، فقَالَ قومٌ مقدارُ ذالكَ مِن التمرِ والشعيرِ نصفُ صاعٍ ومِنَ الحنطةِ مدٌّ مثلَ نصفِ ذالكَ، وقالَ اٰخرونَ بَل هُوَ مِنَ الحنطةِ نصفُ صاعٍ ومِمَّا سِوٰى ذٰلكَ صاعٌ وكلُّهم قَد عدلَ الحنطةَ بمثلَيهَا مِن التمرِوالشعيرِ، فكانَ النظرُ علٰى ذٰلكَ اِذكانتْ صدقةُ الفطرِ صاعًا مِنَ التمرِ والشعيرِ اَن يكونَ مِنَ الحنطةِ مثلَ نصفِ ذالكَ وهوَ نصفُ صاعٍ، فهٰذا هُو النظرُ فِى

هٰذا البابِ ايضًا وقَد وافقَ ذالكَ مَاجاءتْ بهِ الاثارُ التى ذكرْنا فبِذالكَ نأخذُ وهوَ قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رح ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

যেরূপভাবে সদকায়ে ফিতরে গম, যব, কিসমিস, খেজুর ইত্যাদি থেকে যদি বিশেষ পরিমাণ আদায় করা হয়, তবে এরূপভাবে কসমের কাফফারায়ও এগুলো থেকে একটি বিশেষ পরিমাণ আদায় করতে হয়, যাতে সবাই একমত। কিন্তু এর পরিমাণ নির্ধারণে মতবিরোধ হয়ে গেছে।

১. কারও কারও মতে কসমের কাফফারা গম ছাড়া অন্য জিনিসে অর্ধ সা' আর গমে এই অর্ধ সা'র অর্ধেক তথা ১ মুদ।

২. কারও কারও মতে গম ছাড়া অন্য জিনিসে এক সা' গমে এর অর্ধেক, অর্থাৎ, অর্ধ সা'। অতএব, কসমের কাফফারার পরিমাণ নির্ধারণে যদিও তাদের মতবিরোধ হয়ে গেছে, কিন্তু সবার নিকট এ কথা স্বীকৃত যে, গম ছাড়া অন্য জিনিসে যে পরিমাণ ওয়াজিব হবে, গমে সে পরিমাণের অর্ধেক ওয়াজিব হবে, এর বেশি নয়। অতএব, যুক্তির দাবি হল, কসমের কাফফারার ন্যায় সদকায়ে ফিতরের পরিমাণও সে পদ্ধতিতেই হবে। অর্থাৎ, গম ছাড়া অন্য জিনিসে সদকায়ে ফিতরের যে পরিমাণ হবে, গমে তার অর্ধেক হবে, এর চেয়ে বেশি নয়। গম ছাড়া যেমন– যব, খেজুর, কিসমিস ইত্যাদি সম্পর্কে সর্বসম্মতিক্রমে সদকায়ে ফিতরে এক সা'। অতএব গম অর্ধ সা' হওয়া উচিত। আমরাও তাই বলি।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নববী ঃ ১/৩১৭, উমদাতুল ক্বারী ৯/১০৮, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/১৭৪-১৮২।

# كتاب الصيام
# রোযা পর্ব

## باب الصيام فى السفر
## অনুচ্ছেদ ঃ সফরে রোযা রাখা

১. হাসান বসরী র. ও কোন কোন আহলে জাহিরের মতে সফরে রোযা রাখা জায়েয নেই। সফরের রোযা ফরয রোযার জন্য যথেষ্ট নয়, বরং কেউ যদি রমযানের সফরে রোযা রাখে, তবে মুকিম অবস্থায় তার উপর এ রোযা কাযা করা ওয়াজিব। حتى قال بعضهم ان صام فى السفر لم يجزه الصوم و عليه قضاؤه فى اهله الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাদের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

২. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, আওযাঈ, আমির শাবী, কাতাদা, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবাইর, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, উমর ইবনে আবদুল আযীয র. প্রমুখের মতে মুসাফিরের জন্য রোযা রাখলে তা পুনরায় দোহরানো ওয়াজিব নয়। কিন্তু রোযা না রাখা উত্তম। فذهب قوم الى الافطار الخ দ্বারা তাদেরই বুঝানো হয়েছে।

৩. ইবনে মুবারক, সুফিয়ান সাওরী, সুলায়মান আ'মাশ, লাইস ইবনে সা'দ র. প্রমুখের মতে মুসাফিরের এখতিয়ার আছে, রোযা রাখলেও পারে, নাও রাখতে পারে। দুটির কোনটিরই অপরটির উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই। وخالفهم فى ذالك اخرون الخ দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝানো হয়েছে।

৪. ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ ও মালিক র.-এর মতে মুসাফিরের রোযা রাখাতে কষ্ট না হলে রোযা রাখাই উত্তম। ইমাম তাহাভী র. وخالفهم فى ذالك اخرون فقالوا الصوم فى السفر الخ ইবারতে তাদেরকেই বুঝিয়েছেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মতের মতে সফরে রোযা রাখা ও না রাখা উভয়টিই জায়েয। রোযা রাখলে এটাই যথেষ্ট। পুনরায় কাযার প্রয়োজন নেই। ইমাম তাহাভী র. এ মতের পক্ষে।

فَكَانَ مِنَ الحجةِ للآخِرِينَ عليهِم فِى ذالكَ انه قد يَجوزُ ان يكونَ ذالكَ الصيامُ الذى وضعه عنهُ هو الصِّيَامُ الذى لَايكونُ له منهُ بدٌّ فِى تلكَ الايامِ كَمَالَا بُدَّ لِلمقيمِ مِن ذالكَ وفى هٰذا الحديثِ مَا قد دلَّ علٰى هٰذا المعنٰى ـ الاترَاه يقولُ وعنِ الحاملِ والمُرضِعِ افَلَاترٰى اَنَ الحاملَ والمرضعَ اِذا صامتَا رمضانَ اَن ذالكَ يُجزِيهمَا وانهُما لَا تكونانِ كمنْ صامَ قبلَ وجوبِ الصومِ عَليهِ بَل جُعِلَتا يجبُ الصومُ عليهِمَا بدخولِ الشهرِ فجعلَ لهمَا تأخيرُه للضرورةِ والمسافرُ فِى ذالكَ مثلُهمَا وهذا اولٰى مَا حُملَ عليهِ هٰذا الاثرُ حَتّٰى لَايُضادَّ غيرُه مِن الْاٰثارِ التىْ قَد ذكرنَا هَا فِى هٰذا البابِ ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

অন্তসত্ত্বা নারী এবং দুগ্ধদানকারিণী মহিলা যদি রমযানে গর্ভ ও দুগ্ধদানের অবস্থায় রোযা রাখে, তবে তাদের জন্য এটাই যথেষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তীতে এর কাযার প্রয়োজন হয় না। অথচ তাদের জন্যও রোযা না রাখার অবকাশ ছিল এবং এই গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলা রমযানে রোযা রাখার ক্ষেত্রে সে ব্যক্তির মত নয়, যে রমযান আসার পূর্বেই রোযা রেখেছে, বরং বলতে হবে, রমযান মাস আসার কারণে তার উপর রোযা ফরয হয়েছিল, তবে প্রয়োজনের খাতিরে তাদের জন্য পিছানোর অনুমতি ছিল। কাজেই যুক্তির দাবি হল, মুসাফিরের হুকুমও যেন গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণীর মত হয়। তথা রমযান আসার কারণে মুসাফিরের উপরও রোযা ফরয হয়ে যায়। অবশ্য সফর একটি ওজর হওয়ার কারণে মুসাফির পিছিয়ে দেয়ার অনুমতি পেয়ে যায়। এ কারণে যদি কেউ রমযানের সফরে রোযা রেখে ফেলে, তবে পরবর্তীতে এর কাযার প্রয়োজন নেই।

**রোযা রাখা উত্তম, না না রাখা?**

সফর অবস্থায় রোযা রাখা বৈধ। এ ব্যাপারে সবাই একমত। এরপর উত্তমতা সম্পর্কে সংখ্যাগরিষ্ঠের মাঝে মতবিরোধ হয়ে গেছে।

১. ইমাম আহমদ ও ইসহাক র. এর মতে অবকাশের উপর আমল করতঃ সফরে সাধারণত রোযা না রাখা উত্তম।

২. ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ ও মালিক র. এর মতে রোযা রাখা উত্তম। কিন্তু ভীষণ কষ্টের আশংকা হলে রোযা না রাখা উত্তম। যুক্তির আলোকে ইমাম তাহাভী র. ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ ও মালিক র. এর মত প্রমাণ করেছেন।

وَقَدْ رَأَيْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ يَجِبُ بِدُخُولِهِ الصَّوْمُ عَلَى الْمُسَافِرِينَ وَالْمُقِيمِينَ جَمِيعًا إِذَا كَانُوا مُكَلَّفِينَ فَلَمَّا كَانَ دَخْلَ رَمَضَانُ هُوَ الْمُوجِبُ لِلصِّيَامِ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا كَانَ مَنْ عَجَّلَ مِنْهُمْ أَدَاءَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّنْ أَخَّرَهُ فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ مِنَ الْفِطْرِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

রমযান মাস আসার ফলে সমস্ত মুকাল্লাফ ব্যক্তির উপর রোযা রাখা ফরয হয়ে যায়, চাই সে মুকীম হোক, অথবা মুসাফির। এই ফরয সম্পাদনে যে তাড়াতাড়ি করবে, সে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম হবে যে, তা দেরি করে আদায় করে। অতএব, ভীষণ কষ্টের আশংকা না হলে রোযা রাখাই উত্তম হবে।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আওজাযুল মাসালিক ঃ ৩/২৬, নববী ঃ ১/৩৫৫, নুখাবুল আফকার ঃ ৫/২৫১-২৫৩, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/২১৯-২৩০।

## باب القبلة للصائم

## অনুচ্ছেদ ঃ রোযাদারের জন্য চুম্বন

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

যদি চুম্বন ইত্যাদির ফলে, আলিঙ্গন বীর্যপাত না হয় এবং মযীও বের না হয় তবে এমতাবস্থায় স্ত্রীর সাথে চুম্বন গলাগলি ও জড়াজড়ি করা কিরূপ? এ সম্পর্কে এ অনুচ্ছেদটি কায়েম করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত ইখতিলাফ নিম্নরূপ–

১. ইবরাহীম নাখঈ, আমির শাবী, আবদুল্লাহ ইবনে শুবরুমা, কাজী শুরাইহ, আবু কিলাবা, মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া, মাসরূক র. প্রমুখের মতে চুম্বন ইত্যাদির ফলে স্বামী স্ত্রীর রোযা ফাসিদ হয়ে যায়। গ্রন্থকার فذهب قوم الخ দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম মালিক র. এর প্রসিদ্ধ উক্তি হল, রোযাদারের জন্য চুম্বন সাধারণত মাকরূহ। চাই কোন প্রকারের আশংকা হোক বা না হোক।

৩. ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, সুফিয়ান সাওরী, হাসান বসরী, আওযাঈ র. প্রমুখের মতে রোযাদারের জন্য চুম্বন বিনা মাকরূহে জায়েয। চুম্বনের ফলে রোযা ফাসিদ হয় না। তবে শর্ত হল, নিজের উপর এতটুকু আস্থা থাকতে হবে যে, তার এই কর্ম সহবাস পর্যন্ত পৌঁছে দিবে না। এই আশংকা হলে মাকরূহ। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৪. ইমাম আহমদ, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, দাঊদ জাহিরী র. প্রমুখের মতে চুম্বন ইত্যাদি সাধারণত জায়েয। চাই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারুক বা না পারুক।

উল্লেখ্য, প্রথম ও দ্বিতীয় দলকে গ্রন্থকার প্রথম গ্রুপ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ দলকে দ্বিতীয় গ্রুপ সাব্যস্ত করে দলীল প্রমাণ পেশ করবেন।

ইমাম তাহাভী র. বিভিন্ন রেওয়ায়াতের আলোকে প্রমাণ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল ছিল তিনি রোযা অবস্থায় চুম্বন করতেন। এতে বুঝা যায়, চুম্বন করা মাকরূহ অথবা হারাম নয়। তবে যদি সহবাসের দিকে পৌঁছে দেয়, তাহলে নিষিদ্ধ বলে অন্যান্য রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়। এবার বিরোধী পক্ষ থেকে সন্দেহ হতে পারে যে, হতে পারে রোযা অবস্থায় চুম্বন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বৈশিষ্ট্য। অতএব, তদ্বারা সাধারণ উম্মতের হুকুম প্রমাণিত করা সহীহ হবে না। ইমাম তাহাভী র. রেওয়ায়াত ও যুক্তি উভয়ের আলোকে তা খণ্ডন করেছেন।

وهُو ايضًا فِى النظرِ كذالكَ لانّا قَد رأينَا الجماعَ والطعامَ والشرابَ قدكانَ ذالكَ حراماً علٰى رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلّم فِى صيامِه كمَا هُو حَرامٌ علٰى سائِر امتِهِ فِى صيامِهم ثمَّ هٰذه القُبلةُ قدكانتْ لِرسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ حلالاً فِى صيامِه،فالنظرُ على ماذكرنَا اَن يكونَ ايضًا حلالاً لسائرِ اُمتِه فِى صيامِهم ايضًا ويستوىْ حكمُه وحكمُهم فِيهَا كمَا يستوىْ فِى سائرِ مَاذكرْنَا ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

রোযার নিষিদ্ধ জিনিসগুলো তথা খানাপিনা ও সহবাস রোযা অবস্থায় সমস্ত উম্মতের জন্য যেরূপভাবে হারাম, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

জন্যও অনুরূপ হারাম। এতে বুঝা যায়, রোযার নিষিদ্ধ বস্তুগুলোতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাধারণ উম্মত সমান। এরূপ নয় যে, কোন কাজ রোযা অবস্থায় উম্মতের জন্য হারাম, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য হালাল, বরং হারাম হলে সবার জন্য হারাম, আর হালাল হলে সবার জন্য হালাল। যেহেতু রোযা অবস্থায় চুম্বন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য জায়েয, সেহেতু সাধারণ উম্মতের জন্য জায়েয হওয়ার কথা। অতএব, রোযা অবস্থায় চুম্বনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করা সহীহ নয়।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য উমদাতুল ক্বারী ১১/৯, আওজাযুল মাসালিক ঃ ৩/২২, মাআরিফুস সুনান ঃ ৫/৪০২, নায়লুল আওতার ঃ ৪/৯৫, নুখাবুল আফকার ঃ ৫/৩৩৬-৩৩৯, নববী ঃ ১/৩৫২, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/২৫৬-২৬৭।

## باب الصائم يقئ

## অনুচ্ছেদ ঃ যে রোযাদার বমি করে

### মাযহাবের বিবরণ ঃ

১. ইমাম আওযাঈ, আতা ইবনে আবু রাবাহ ও আবু সাওর র. থেকে বর্ণিত আছে যে, বমি সাধারণত রোযা ভঙ্গের কারণ। চাই অনিচ্ছাকৃত বমি আসুক কিংবা ইচ্ছাকৃত বমি করুক। বমি কম হোক বা বেশি হোক। সর্বাবস্থাতেই রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। গ্রন্থকার فذهب قوم الخ দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম চতুষ্টয়, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখঈ, আলকামা, আমির শাবী র. প্রমুখের মতে নিজে নিজে বমি হলে, রোযা ভঙ্গ হবে না। ইচ্ছাকৃত বমি হলে রোযা ভঙ্গ হবে। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অবশ্য হানাফীদের মতে এখানে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

আল্লামা শামী র. ফাতাওয়া শামীতে (২/৪১৪) বমি সংক্রান্ত চব্বিশটি ছুরত বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে দুই ছুরতে সর্বসম্মতিক্রমে রোযা নষ্ট হয়ে যায়–

১. ইচ্ছাকৃত মুখ ভরে বমি করলে।

২. ইচ্ছাকৃত নয় কিন্তু অনিচ্ছাকৃত মুখ ভরে বমি হওয়ার পর তা আবার গলার দিকে ফিরিয়ে নিলে।

যদি ইচ্ছাকৃত বমি করে কিন্তু মুখ ভরে নয়; এমতাবস্থায় ইমাম আবু ইউসুফ র.-এর মতে রোযা ফাসিদ হবে না। মুহাম্মদ র.-এর মতে ফাসিদ হবে। (বাদায়ি' ঃ ২/৯২)

এগুলো ছাড়া অন্য যত ছুরত হতে পারে সেগুলোতে আলিমগণের ইখতিলাফ রয়েছে যে, রোযা ফাসিদ হবে কিনা।

এ মাসআলাটির বিষদ বিবরণ দানের জন্য গ্রন্থকার এ অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন।

وامَّا حكمُه مِن طريقِ النظرِ فإنَّا رأينَا القَيْئَ حدثًا فِى قولِ بعضِ الناسِ وغيرَ حدثٍ فِى قولِ الاُخرينَ ورأينَا خُروجَ الدمِ كذلكَ وكلٌّ قَد اجمعَ اَن الصائمَ اِذا فصدَ عرقًا انه لَايكونُ بذالكَ مفطِرًا وكذالكَ لَوكانتْ بِهٖ علةٌ فَانفجَرَتْ عَليهِ دمًا مِن موضعٍ مِن بدنِهٖ فَكانَ خروجُ الدمِ مِن حيثُ ذكرنَا مِن بدنِه وَاستخراجُه اياهُ سواءٌ فِيمَا ذكرنَا وكذالكَ هُمَا فِى الطهارةِ وكانَ خروجُ القيِئ مِن غيرِ استخراجٍ مِن صاحبِه اياهُ لاينقضُ الصومَ۔

فالنظرُ علٰى ماذكرنَا اَن يكونَ خروجُه بِاستخراجِ صاحبِهٖ اياهُ كذالكَ لاينقضُ الصومَ فَلمَّا كانَ القيئُ لايفطرُه فِى النظرِ كانَ مَاذرعَه مِن القيِئ احرٰى اَن يكونَ كذالكَ، فهٰذَا حكمُ هٰذا البابِ ايضًا مِن طريقِ النظرِ ولكنْ اتباعُ ماروىَ عن رسولِ اللهِ صلى اللّٰهُ عليهِ وسلَّم اولٰى وهٰذا قولُ ابى حنيفةَ وابىْ يوسفَ ومحمدٍ رحمَهمُ اللهُ تعالٰى وعامَّةِ العلماءِ۔

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

আমরা দেখি, কারও কারও মতে বমি ওযু ভঙ্গের কারণ। আর কারও কারও মতে এটি অপবিত্রতার কারণ নয়। এরূপভাবে রক্ত বের হওয়াও কারও কারও মতে ওযু ভঙ্গের কারণ। আবার কারও কারও মতে ওযু ভঙ্গের কারণ নয়। এবার যদি কোন ব্যক্তি নিজের শরীরের কোন রগ থেকে ইচ্ছাকৃত রক্ত বের করে অথবা কোন রোগের কারণে তার দেহ থেকে নিজে নিজে রক্ত বের হয়, তবে উভয়

ছুরতে সর্বসম্মতিক্রমে রোযা নষ্ট হবে না। অতএব, যেহেতু নিজে নিজে রক্ত বের হওয়া ও ইচ্ছাকৃতভাবে রক্ত বের করা কোনটিই রোযা ভঙ্গের কারণ নয়। অতএব, যুক্তির দাবি হল, নিজে নিজে বমি হওয়া অথবা ইচ্ছাকৃত বমি করা কোনটিই রোযা ভঙ্গের কারণ না হওয়া। কিন্তু যেহেতু ইচ্ছাকৃত বমি করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, হাদীস শরীফে আছে– من ذرعه القى وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض সেহেতু এই অংশে যুক্তি ছেড়ে নববী ইরশাদের উপর আমল করতে হবে। বলতে হবে, যদি ইচ্ছাকৃত বমি করে, তবে রোযা নষ্ট হবে, অন্যথায় নয়। আমাদের দাবিও তাই।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য উমদাতুল ক্বারী ১১/৩৬, আওজাযুল মাসালিক ঃ ৩/৬৬, ৬৭, মাআরিফুস সুনান ঃ ৫/৩৮৯, নুখাবুল আফকার ঃ ৫/৩৫৭, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/২৬৮-২৭২।

## باب الصائم يحتجم

## অনুচ্ছেদ ঃ যে রোযাদার শিঙ্গা লাগায়

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. ইমাম আহমদ, ইসহাক, ইবনে সীরীন, মাসরূক, আওযাঈ, আবু সাওর র. প্রমুখের মতে শিঙ্গা লাগানো অথবা তা গ্রহণ করা উভয়টি রোযা ভঙ্গের কারণ। যাকে শিঙ্গা লাগানো হয় এবং যে লাগায় উভয়ের রোযাই এর ফলে নষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য এর ফলে শুধু কাযা ওয়াজিব, কাফফারা নয়। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ, মালিক, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, ইবরাহীম নাখঈ, আতা ইকরামা, কাসিম ইবনে মুহাম্মদ, আবুল আলিয়া র. প্রমুখ বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে শিঙ্গা লাগানো রোযা ভঙ্গের কারণ নয়। বরং রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগানো মাকরূহও নয়। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. ইমাম শাফিঈ, মালিক, সুফিয়ান সাওরী র.-এর মতে শিঙ্গা লাগানো রোযা ভঙ্গের কারণ নয়, তবে মাকরূহ। দ্বিতীয় وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এখানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রুপকে ফরীকে সানী তথা দ্বিতীয় দল সাব্যস্ত করে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।

وَاَمَّا وجهُه مِن طريقِ النظرِ فاِنَّا رأينَا خروجَ الدمِ اغلظَ احوالِه اَن يكونَ حدثًا يَنتقضُ بهِ الطهارةُ وقدْ رأينَا الغائطَ والبولَ خروجُهما حدثٌ ينتقضُ بهِ الطهارةُ ولَا ينقضُ الصيامَ، فالنظرُ علٰى ذالكَ اَن يكونَ الدمُ كذالكَ وقَد رأينَا الصائمَ لايفطرهُ فصدُ العرقِ فالحجامةُ فِى النظرِ ايضًا كذالكَ وهٰذا قولُ ابىْ حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمَهم اللهُ تعالٰى ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

শিঙ্গা লাগালে রক্ত বের হয়। রক্ত বের হওয়া সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। কারও কারও মতে এটি অপবিত্রতার কারণ, এর ফলে ওযু ভেঙ্গে যায়। কারও কারও মতে এটি অপবিত্রতার কারণ নয়। কাজেই যদি রক্ত বের হওয়ার নিকৃষ্ট অবস্থা অর্থাৎ, অপবিত্র হওয়ার কথা লক্ষ্য করা হয়, তবে এটি রোযা ভঙ্গের কারণ হয় না। কারণ, প্রস্রাব পায়খানা করলে রোযা ভঙ্গ হয় না, অথচ এটা অপবিত্রতার কারণ, এর ফলে ওযু ভেঙ্গে যায়। যেহেতু প্রস্রাব-পায়খানা করা রোযা ভঙ্গের কারণ নয়, সেহেতু রক্ত বের হওয়াও রোযা ভঙ্গের কারণ হবে না। কাজেই শিঙ্গা লাগানো রোযা ভঙ্গের কারণ হতে পারে না।

তাছাড়া, যদি কোন রগ থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে আরম্ভ করে তবে এরফলে রোযা নষ্ট হয় না। অতএব, শিঙ্গা লাগানের কারণে যদি দেহ থেকে রক্ত বের হয় তবুও রোযা নষ্ট না হওয়া উচিত।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বিদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ ১/২৯১, উমদাতুল ক্বারী ১১/৩৯, নায়লুল আওতার ঃ ৪/৮৫, মাআরিফুস সুনান ঃ ৫/৪৮৪, আওজাযুল মাসালিক ঃ ৩/৪৫, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/২৭৩-২৭৭।

باب الرجل يصبح فى يوم من شهر رمضان جنبا هل يصوم ام لا ؟

## অনুচ্ছেদ ঃ রমযান মাসে কোন দিনে কেউ গোসল ফরয অবস্থায় সকালে উঠলে রোযা রাখবে কিনা?

কোন ব্যক্তির গোসল ফরয অবস্থায় যদি সুবহে সাদিক উদয় হয়, তবে তার রোযা সহীহ হবে কিনা?

১. হযরত উসামা, ফযল ইবনে আব্বাস, আবু হোরায়রা রা.-এর মতে ফজর উদয় পর্যন্ত, গোসল বিলম্বিত করলে, সর্বাবস্থায় রোযা সহীহ হবে না। তার উপর

কাযা আবশ্যক হবে। কিন্তু হযরত আবু হোরায়রা রা. এ মত প্রত্যাহার করেছেন। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. হযরত আলী, ইবনে মাসউদ, যায়েদ ইবনে সাবিত, আবুদদারদা, আবু যর, ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস রা., ইমাম চতুষ্টয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামী আইনবিদ ও মুহাদ্দিসের মতে সর্বাবস্থায় রোযা সহীহ হয়ে যাবে। চাই জেনে শুনে গোসল বিলম্বিত করুক অথবা নিদ্রা, অলসতা, অথবা, ভুল বিস্মৃতির কারণে গোসল দেরী হোক, সর্বাবস্থায় রোযা সহীহ হয়ে যাবে। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَاَمَّا وجهُه مِن طريقِ النظرِ فِى ذالكَ فاِنَّا قَدرأينَاهُم اَجمعُوا اَن صائمًا لَونَامَ نهارًا فاجنبَ اَن ذالكَ لَايُخرِجُه عَن صومِه فاردنَا اَن ننظرَانَه هلْ يكونُ داخلاً فِى الصومِ وَهو كذالكَ اَويكونُ حكمُ الجنابةِ اِذا طرأتْ علىٰ الصومِ خلافَ حكمِ الصومِ اِذا طرأَ عليهَا ـ فرأينَا الاشياءَ التىْ تَمنعُ مِنَ الدخولِ فِى الصومِ مِن الحيضِ والنفاسِ اِذا طرأَ ذالكَ علىٰ الصومِ اَو طَرأ عليهِ الصومُ فهوَ سواءٌ ـ اَلَاترىٰ اَنه ليسَ لِحائضٍ اَن تدخُلَ فِى الصومِ وهى حائضٌ واَنهَا لَو دخلتْ فِى الصومِ طاهرًا ثُم طَرأَعَليهَا الحيضُ فِى ذٰلكَ اليومِ اَنها بذٰلكَ خارجةٌ مِن الصومِ،فكانتِ الاشياءُ التىْ تَمنعُ مِن الدخولِ فِى الصومِ هِى الاشياءُ التىْ اِذاَ طرأتْ عَلى الصومِ ابطلتْه وكانتِ الجنابةُ اِذا طرأتْ علىٰ الصومِ بِاتفاقِهمْ جميعًالم تُبطِلْه، فالنظرُ علىٰ مَاذكرنَا اَن يكونَ كذالكَ اِذا طرأَعليهَا الصومُ لم تَمنعْ مِن الدخولِ فِيه فثبتَ بذٰلكَ مَا قد وافقَ مَاروتْه امُّ سَلَمةَ رض وعَائشةُ رض وهٰذاَ قولُ ابى حنيفَةَ وابِى يوسفَ ومحمدٍ رحمَهم اللهُ تعالىٰ ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

যদি দিনে কোন রোযাদার ব্যক্তির স্বপ্নদোষ হয়ে যায়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার রোযা নষ্ট হয় না। অতএব, যদি কোন ব্যক্তি গোসল ফরয অবস্থায় রোযায়

প্রবেশ করে, তবে তার রোযাও ফাসিদ না হওয়া উচিত। কারণ, রোযার নিষিদ্ধ যেসব বিষয় আছে– যেমন, হায়েয, নেফাস (মাসিক ও সন্তান জন্মগ্রহণপরবর্তী রক্ত) এগুলো থেকে কোন একটি যদি রোযার সময় দেখা দেয়, অথবা এগুলোতে রোযা এসে যায়, তবে উভয় ছুরতে রোযা ফাসিদ হয়ে যায়। যেমন– কোন মহিলা যদি মাসিকগ্রস্ত হয়, তবে মাসিক অবস্থায় তার জন্য যেরূপ রোযা শুরু করা নিষিদ্ধ, এরূপভাবে যদি সে পবিত্র অবস্থায় রোযা শুরু করে অর্থাৎ, সুবহে সাদিকের সময় সে মহিলা পবিত্র ছিল, কিন্তু দিনের কোন অংশে তার মাসিক হয়ে যায়, তবে এটা তার রোযা ভেঙ্গে দিবে। অতএব, যেরূপভাবে এ মাসিক রোযা শুরু করার জন্য প্রতিবন্ধক, রোযা অবস্থায় এটা হলেও রোযা ভঙ্গের কারণ হবে। এতে প্রমাণিত হয়, যে জিনিসটি রোযার মাঝে এলে রোযা ভঙ্গের কারণ হয়, সে জিনিসটি যদি রোযা শুরু করার সময় বিদ্যমান থাকে, তবে এটা রোযার জন্য প্রতিবন্ধক হয়। রোযা অবস্থায় এ জিনিসটি দেখা দেয়া এবং এ বিষয়ের বর্তমানে রোযা শুরু হওয়া উভয়টি সমান। যেমন– হায়েযের মাসআলা দ্বারা সম্পূর্ণ স্পষ্ট। অতএব, রোযা অবস্থায় গোসল ফরয অবস্থার সম্মুখীন হওয়া যেহেতু সর্বসম্মতিক্রমে রোযা ভঙ্গের কারণ হয় না, সেহেতু গোসল ফরয অবস্থার বর্তমানেও রোযা শুরু করা নিষিদ্ধ হবে না। যদি গোসল ফরয অবস্থায় রোযা শুরু করা নিষিদ্ধ বলা হয়, তবে রোযা অবস্থায় গোসল ফরযের অবস্থা যুক্ত হলে, অর্থাৎ, স্বপ্নদোষকে রোযা ভঙ্গের কারণ বলা উচিত। অথচ কেউ এটাকে রোযা ভঙ্গের কারণ বলেন না। অতএব, যদি কোন ব্যক্তি গোসল ফরয অবস্থায় থাকে, এ অবস্থায় সুবহে সাদিক হয়ে যায়, তবে তার রোযা নষ্ট হবে না। এটাই আমাদের কথা।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য উমদাতুল ক্বারী ১১/৬, আওজাযুল মাসালিক ঃ ৩/১৬, মাআরিফুস সুনান ঃ ৫/৫০১, মুগনী ৩/৩৬, তোহফাতুল আহওয়াযী ঃ ২/৫৯, নববী ঃ ১/৩৫৪, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/২৭৭-২৮৩।

## باب الرجل يدخل فى الصيام تطوعا ثم يفطر

## অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নফল রোযা শুরু করে পরে ভেঙ্গে ফেলে

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. ইমাম শাফিঈ, আহমদ ইবনে হাম্বল, মুজাহিদ, তাউস, আতা, সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ র. প্রমুখের মতে নফল রোযা বিনা ওজরে ভেঙ্গে দেয়া যায়। ভঙ্গ করলে কাযাও ওয়াজিব হয় না। গ্রন্থকার فذهب قوم الخ। দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. হযরত আবু বকর সিদ্দীক, উমর, আলী ইবনে আব্বাস, জাবির, আয়েশা, উম্মে সালামা রা., ইমাম আবু হানীফা, মালিক, ইবরাহীম নাখঈ, হাসান বসরী, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ র. প্রমুখের মতে নফল রোযা বিনা ওজরে ভঙ্গ করা নাজায়েয। কারণ, তাঁদের মতে নফল রোযা শুরু করলে ওয়াজিব হয়ে যায়। অতএব, যদি ওজরের কারণে ভেঙ্গে ফেলে তবুও কাযা ওয়াজিব। নামাযের ক্ষেত্রেও তাই হুকুম। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَاَما النظرُ فى ذالكَ فانّا قدْ رأينَا اشياءَ تجبُ على العبادِ بايجابِهم اياهَا علىٰ انفسِهم، مِنها الصلوةُ والصدقةُ والصيامُ والحجُّ والعمرةُ فكانَ من اوجبَ شيئًا مِن ذالكَ على نفسهِ فقالَ لِله علىَّ كذَا وكذَا وجبَ عليهِ الوفاءُ بذالكَ ـ ورأينَا اشياءَ يَدخلُ فِيها العبادُ فَيوجبُونَها على انفسِهم بِدخولِهم فِيها، مِنها الصلوةُ والصيامُ والحجُّ وماذكرنَا فكانَ مَن دخلَ فِى حجةٍ او عمرةٍ ثمَّ ارادَ اِبطالَها والخروجَ منهَا لم يكنْ له ذالكَ وكانَ بدخولِه فِيهَا فِى حكمِ مَنْ قالَ لِلّٰهِ علىّ حجةٌ فعليهِ الوفاءُ بهَا ـ

### যৌক্তিক প্রমাণ ঃ

অনেক জিনিস আছে যেগুলো করা বান্দার জন্য আবশ্যক নয়। কিন্তু বান্দা সেগুলোকে নিজের উপর নিজে আবশ্যক করে নেয়। এটি আবশ্যক করার দুটি ছুরত রয়েছে–

১. উক্তিতে আবশ্যক করা, যেমন– এ কথা বলা– لله على كذا وكذا এর ফলে তার উপরে এ কাজটি করা এবং স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করা আবশ্যক হয়ে যায়।

২. কার্যত আবশ্যক করা। মুখে কিছু বলেনি, কিন্তু কাজটি শুরু করে দেয়, যেমন– কারও উপর নামায, রোযা, হজ্জ অথবা উমরা এগুলো কিছুই ওয়াজিব ছিল না। তা সত্ত্বেও তা করতে আরম্ভ করেছে। মৌখিক এর পূর্বে لله على كذا وكذا ইত্যাদি কিছু বলেনি।

এবার যদি কেউ নিজের উপর কোন জিনিসকে উক্তি দ্বারা আবশ্যক করে, তবে তা পূর্ণ করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। তা পরিহার করা জায়েয হয় না। আর যদি কেউ এ কাজটি নিজের উপর কার্যতঃআবশ্যক করে, তবে হজ্জ ও উমরা সম্পর্কে সবাই একমত যে, তা পূর্ণ করা আবশ্যক। বিনা ওজরে তা বর্জন করা জায়েয নেই। যদি কেউ মৌখিক কিছু বলা ছাড়া শুধু কার্যতঃ হজ্জ অথবা উমরা শুরু করে, অতঃপর তা ছেড়ে দেয়, তবে ওজরের কারণে হোক অথবা বিনা ওজরে হোক সর্বাবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে এর কাযা করা তার উপর ওয়াজিব। হজ্জ ও উমরায় যেহেতু কার্যতঃআবশ্যক করা, মৌখিক আবশ্যক করার মত, সেহেতু নামায রোযাতেও কার্যত আবশ্যক করা, মৌখিক আবশ্যক করার পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ, নফল নামায ও রোযা শুরু করে বিনা ওজরে ছেড়ে দেয়া জায়েয হবে না। ছাড়লে চাই ওজরের কারণে ছাড়ুক বা বিনা ওজরে, তার উপর কাযা ওয়াজিব।

فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ انما مَنعنَاه مِن الخُروج مِنهما لانهٗ لايمكنُه الخروجُ منهمَا الاّبتمامِهمَاوليستِ الصلوةُ والصيامُ كذالكَ لانهمَا قَدْ يبطُلانَ ويخرجُ منهما بالكلامِ والطعامِ والشرابِ والجماعِ ـ

قِيلَ لهٗ اِن الحجةَ والعمرةَ وان كانَا كما ذكرتَ، فاِنا قدْ رأيناكَ تزعمُ ان مَن جامعَ فيهمَا فعليهِ قضاؤُهما والقضاءُ يدخلُ فِيه بعدَ خروجهٖ منهمَا، فقدْ جَعلتَ عليهِ الدخولَ فى قضائِهما اِن شاءَ واِن ابىٰ مِن اجْلِ افسادِه لهمَا فهذَا الذىْ يقضِيه بدلٌ منه مِمّا كانَ وجبَ عليهِ بدخولهٖ فيهِ لابِايجابٍ كانَ منهُ قبلَ ذالكَ ـ

فَلوكانتِ العلةُ فىْ لزومِ الحجةِ والعمرةِ اياهُ حينَ احرَم بهمَا وبطلانِ الخروجِ منهمَا هِى ماذكرتَ من عدمِ رفضِهما ولولاَ ذالكَ كانَ له الخروجُ منهمَا كمَا كانَ له الخروجُ من الصلوةِ والصيامِ بِما ذكرنَا من الاشياءِ التىْ تخرجُ منهما اذا لَمّاوَجبَ عليهِ قضاؤُهما،لِانه غيرُ قادرٍ على ان يدخُلَ فيه، فَلمَّا كانَ ذالك غهرَ

مُبطِلٍ عنه وجوبَ القضاءِ وكانَ في ذالكَ كمَن عليهِ قضاءُ حجةٍ قَد اوجبَها لِلّٰه عَزَّوجلَّ على نفسه بِلِسانِه كانَ كذالك ايضًا في النظرِ مَن دخلَ في صلوةٍ او صيامٍ فاوجبَ ذالكَ للّٰهِ عزَّوجلَ علٰى نفسِه بدخولِه فيهِ ثم خرجَ منهُ فعليهِ قضاؤُه ـ

**একটি প্রশ্ন ঃ** এখানে যুক্তির উপর একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, হজ্জ অথবা উমরা শুরু করার পর তা থেকে বের হওয়া এজন্য নিষিদ্ধ যে, এগুলো পুরা করা ছাড়া এগুলো থেকে বের হওয়াই সম্ভব নয়। কিন্তু নামায অথবা রোযা এর পরিপন্থী। কথা বলা, খানাপিনা অথবা সহবাসের ফলে তা থেকে বের হওয়া সম্ভব। অতএব, নামায রোযাকে হজ্জ বা উমরার উপর কিয়াস করা সহীহ নয়।

**উত্তর ॥** প্রশ্নটি ঠিক নয়। কারণ, কেউ উমরা অথবা হজ্জের অবস্থায় সহবাস করলে তার উপর কাযা করা প্রতিপক্ষের মতেও ওয়াজিব। এবার কাযা করার জন্য প্রথমত সে শুরুকৃত হজ্জ অথবা উমরা থেকে বের হতে হবে। অন্যথায় যদি সে ব্যক্তি তা থেকে বের না হয়, তবে এর কাযা কিভাবে করবে? অতএব, এটা বলা সহীহ নয় যে, নামায রোযা থেকে পূর্ণাঙ্গ করার পূর্বে বের হওয়া সম্ভব, হজ্জ অথবা উমরা থেকে বের হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.কে উমরা ছেড়ে হজ্জ শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস শরীফে আছে– دعى عنك العمرة اهلى بالحج-এর ফলে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, উমরা সম্পূর্ণ করার পূর্বে তা থেকে বের হওয়া অসম্ভব নয়। কাজেই নামায রোযাকে হজ্জ ও উমরার উপর কিয়াস করা সম্পূর্ণ সহীহ। মৌখিকভাবে ওয়াজিব করা ছাড়া যদি কেউ নামায বা রোযা এমনিই শুরু করে দেয়, তবে হজ্জ ও উমরার ন্যায় এটাকে বিনা ওজরে পরিহার করা তার জন্য জায়েয হবে না। পরিহার করলে যদিও ওজরের কারণে হোক, বা বিনা ওজরে, তার উপর এর কাযা ওয়াজিব হবে।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য উমদাতুল ক্বারী ১১/৭৯, মুগনী ৩/৪৪, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ ১/৩১১, মাআরিফুস সুনান ঃ ৫/৪০৭, আওজাযুল মাসালিক ঃ ৩/৭২, ফাতহুল বারী ঃ ৪/২১২, নববী ঃ ১/৩৬৪, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/২৮৩–২৯৫।

# كتاب مناسك الحج
# হজ্জের আহকাম পর্ব

## باب المراة لاتجد محرماهل يجب عليها فرض الحج ام لا ؟

## অনুচ্ছেদ ঃ মহিলা যদি মাহরাম না পায়, তবে তার উপর হজ্জ ফরয হবে কিনা?

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

মাহরাম সে ব্যক্তি যার উপর স্থায়ীভাবে বিয়ে করা হারাম হয়ে যায়। মহিলার উপর হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য স্বামী অথবা মাহরাম হওয়া শর্ত কিনা এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ আছে।

১. আমির শাবী, তাউস ও আহলে জাহিরের মতে মহিলার জন্য শরঈ মাহরাম অথবা স্বামী ছাড়া সফর করা ব্যাপক আকারে জায়েয নেই। চাই সফর লম্বা হোক অথবা ছোট হোক। চাই হজ্জের সফর হোক অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে। সর্বাবস্থাতেই জায়েয নেই। তাঁরাই উদ্দেশ্য নিম্নোক্ত উক্তি দ্বারা–

فذهب قوم الى ان المرأة لاتسافر سفرا قريبا او بعيدا الا مع ذى محرم الخ -

২. আতা ইবনে আবু রাবাহ এবং কোন কোন জাহিরীর মতে, এক বারেদ অপেক্ষা কম সফর হলে মাহরাম অথবা স্বামী ছাড়া তা করা জায়েয আছে। خالفهم فى ذالك اخرون الخ - দ্বারা তাঁরাই উদ্দেশ্য।

উল্লেখ্য, এক বারেদ প্রায় ১২ মাইল হয়। ১২ মাইল হল ২১ কিলোমিটার ৯৪৫ মিটার ৬০ সেন্টিমিটার। অর্থাৎ, প্রায় ২২ কিলোমিটার অথবা তার চেয়ে বেশি দূরত্ব। এতটুকু সফর তাঁদের মধ্যে মাহরাম অথবা স্বামী ছাড়া জায়েয নেই, এর কম হলে জায়েয।

৩. ইমাম মালিক, শাফিঈ, আওযাঈ, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন র. প্রমুখের মতে একদিন এক রাতের কম দূরত্বের জন্য সফর করতে হলে শরঈ মাহরাম অথবা স্বামীর প্রয়োজন নেই। সে নিজেই করতে পারে। এর চেয়ে বেশি পরিমাণ হলে একা স্ত্রীর সফর জায়েয নেই। خالفهم فى ذالك اخرون الخ - দ্বারা তাঁরাই উদ্দেশ্য।

হানাফীদের মতে যুগ খারাপ হওয়ার কারণে একদিন এক রাতের উক্তির উপর ফতওয়া দেয়া সমীচীন। –শামী ঃ ২/৪৬৫।

৪. হাসান, কাতাদা র. প্রমুখের মতে দুদিন, দু'রাতের কম পরিমাণ সফরের জন্য সে মাহরাম অথবা স্বামী সাথে থাকা শর্ত নয়। এর বেশি হলে তাদের ছাড়া সফর করা জায়েয নেই। তাহাভীতে তৃতীয় স্থানে خالفهم فى ذالك اخرون الخ - দ্বারা তাঁরাই উদ্দেশ্য।

৫. ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ও সুলাইমান আ'মাশের মতে, তিন দিন তিন রাতের কম পরিমাণ হলে শরঈ মাহরাম অথবা স্বামী ছাড়া সফর করতে পারে। এর বেশি হলে তাদের ছাড়া জায়েয নেই। মাহরাম অথবা স্বামী ছাড়া এমতাবস্থায় মহিলার উপর হজ্ব ফরজ হবে না। ইমাম তাহাভী র. خالفهم فى ذالك اخرون الخ - দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে ইমাম আবু হানীফার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে আওজাযুল মাসালিকে (৩/৭৩৭)

আল্লামা কাসানী র., বাদায়িয়ে (৩/১২৪) বর্ণনা করেছেন যে, মক্কা মুকাররমার দূরত্ব তিন দিন তিন রাতের চেয়ে কম হলে মাহরাম অথবা স্বামী ছাড়া হজের সফর করা মহিলার জন্য জায়েয আছে। এর চেয়ে বেশি হলে মহিলার উপর হজ ওয়াজিব নয়। কিন্তু যুগ খারাপ হওয়ার কারণে ফাতাওয়া শামীতে একদিন এক রাত বিশিষ্ট উক্তিটির উপর ফতওয়া দান সমীচীন বলে লেখা হয়েছে।

৬. ইমাম যুহরী, হাকাম র.-এর মতে, মাহরাম অথবা স্বামী ছাড়া মহিলার জন্য সফর করাতে সাধারণত কোন অসুবিধা নেই। ইমাম শাফিঈ, মালিক, আওযাঈ, ইবনে সীরীন, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ র. প্রমুখের দ্বিতীয় উক্তি এটাই। ইমাম আহমদ র.-এর একটি উক্তি হল– ওয়াজিব হজ্জে মাহরাম সাথে থাকা শর্ত নয়। নফল হজ্জে শর্ত। (আওজায ঃ ৩/৭২৭)

তার আর একটি উক্তি হল– নেককার লোকদের সাথে হজ্জে যেতে কোন অসুবিধা নেই। যদিও তাদের মধ্যে সে মহিলার মাহরাম নাই থাকুক না কেন। (আওজায ঃ ৩/৭৩৮)

فَقَدِ اتفقتْ هذهِ الاٰثارُ كلُّها عَنِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ فِى تحريمِ السفَرِ ثلثةَ ايامٍ على المراةِ بغيرِ ذىْ محرمٍ واختلفتْ فيمَا دونَ الثلثِ ،فنظرنَا فى ذالكَ فوجدنَا النهىَ عنِ السفرِ

بلامَحرمٍ مسيرةَ ثلٰثةِ ايامٍ فصاعِداً ثابتًا بهذه الأثاركلّها وكانَ توقيتُه ثلثةَ ايامٍ فى ذالكَ اباحةَ السفرِ دون الثلٰثِ لَهَا بغير محرمٍ ـ ولولَا ذلكَ لَما كانَ لذكره الثلٰثُ معنىً ولنهٰى نهيًا مُطلقاً ولم يتكلمْ بكلامٍ يكونُ فضلاً ولكنهُ ذكر الثلٰثَ ليعلمَ إن مادونَها بخلافِها وهكذا الحكمُ يتكلمُ بما يدلُّ على غيرِه ليُغنيَه عن ذكرِمايدلُّ كلامُه ذالكَ عليهِ ولَا يتكلمُ بالكلامِ الذىْ لَايدلُّ على غيرِه وهو يقدِرُ ان يتكلمَ بكلامٍ يدلُّ على غيرِهٖ وهذا تفضُّلٌ مِن اللهِ عز وجلَّ لنبيّهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بذالكَ اذا اتاه جوامعُ الكلمِ الذى ليسَ فِى طبعِ غيرِه القوةُ عليه ـ

ثم رَجعنَا الى ماكنَّا فيهِ فلمَّا ذكرُ الثلٰثُ ثبتَ بذكرهٖ اياهَا اباحةُ ما هو دونَها ثم ماروىَ عنه فى منعِها من السفرِ دون الثلٰثِ مِن اليومِ واليومينِ والبريدِ فكلٌّ واحدٍ من تلكَ الأثارِ ومن الاثرِ المرويِّ فى الثلثِ متى كانَ بعد الذى خَالفه نسخَهُ، اِن كان النهىُ عن سَفرِ اليومِ بلامحرمٍ بعدَ النهىِ عن سفرِ الثلٰثِ بلا محرمٍ فَهوناسخٌ له وان كان خبرُ الثلٰثِ هو المتاخرَ عنه فهوَ ناسخٌ له ـ

فقد ثبتَ ان احدَ المعانِى اللتىْ دونَ الثلٰثِ ناسخةٌ للثلٰثِ اَو الثلٰثُ ناسخةٌ لهَا فلم يخلُ خبرُ الثلٰثِ من احدِ وجهينِ، اِمَّا اَن يكونَ هو المتقدمَ او يكونَ هو المتاخرَ، فاِن كانَ هو المتقدمَ فقدْ اباحَ السفرَ اقلَّ مِنْ ثلٰثِ بلامحرمٍ ثم جاءَ بعدَه النهىُ عن سفرِ ماهو دونَ الثلٰثِ بغيرِ محرمٍ فحرَّم ماحرمَ الحديثُ الاولُ وزادعليهِ حرمةً اخرىٰ وهو ما بيْنه وبينَ الثلٰثِ فوجبَ استعمالُ الثلٰثِ علٰى مَا اوجبه الاثرُ المذكورُ فيه واِن كان هو المتأخرَ وغيرُه المتقدمَ فهوناسخٌ لِما تقدَّمَه والذى تقدَّمَه غيرُ واجبٍ العملُ به ـ

فحديثُ الثلٰثِ واجبٌ استعمالُه على الاحوالِ كلِّها ومَا خالفَه فقَد يجبُ استعمالُه اِن كانَ هو المتأخرَ ولا يجبُ ان كانَ هو المتقدمَ، فالذىْ قَد وجبَ علينَا استعمالُه والاخذُ به فى كِلا الوجهينِ اولٰى مِمَّا قد يجبُ استعمالُه فى حالٍ وتركُه فى حالٍ، وفىْ ثبوتِ ماذكرنَا دليلٌ على ان المرأةَ ليسَ لهَا ان تحجَّ اذا كانَ بينَها وبينَ الحجِّ مسيرةَ ثلٰثةِ ايامٍ اِلَّامعَ محرمٍ فَاذا عدمتِ المحرمَ وكانَ بينَها وبينَ مكةَ المسافةُ التى ذكرنَا فهى غيرُ واجدةٍ للسبيلِ الذىْ يجبُ عليهَا الحجُّ بوجودِهٖ -

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

মাহরাম অথবা স্বামী ছাড়া মহিলাকে সফর করতে যে নিষেধ করা হয়েছে, তার পরিমাণ নির্ধারণে রেওয়ায়াত বিভিন্নমুখী। কোন কোন রেওয়ায়াতে তিন দিন, কোন কোন রেওয়ায়াতে দুই দিন, কোনটিতে এক দিনের কথা রয়েছে। তিন দিন বিশিষ্ট রেওয়ায়াতগুলোর দাবি হল, এর কম সফর হলে মহিলার জন্য মাহরাম বা স্বামী ছাড়া করা জায়েয আছে। কিন্তু এর কম পরিমাণের ব্যাপারে অন্যান্য রেওয়ায়াত এর সাথে সাংঘর্ষিক। এবার দুটি ছুরত রয়েছে– হয়ত তিন দিনের রেওয়ায়াত পরের, এর কমের রেওয়ায়াতকে আগের বলা হবে, অথবা এর উল্টো। অর্থাৎ, তিন দিনের রেওয়ায়াত পরে এবং এরচেয়ে কমের রেওয়ায়াত আগে হবে। এটাকে রহিত, আর পরেরটিকে রহিতকারী সাব্যস্ত করা হবে। কিন্তু এরূপ কোন প্রমাণ নেই, যেটি দ্বারা কোন একটি আগে পরে প্রমাণ করা যায়। অতএব, আমরা অন্য পন্থায় চিন্তা ফিকির করে কোন একটি রেওয়ায়াতের উপর আমলকে প্রাধান্য দিব।

তিন দিনের রেওয়ায়াতগুলো দুই অবস্থা থেকে শূন্য নয়। হয়ত তিন দিন বিশিষ্ট রেওয়ায়াতগুলোর আগে হবে অথবা পরে। যদি আগে হয়, অর্থাৎ, প্রথম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিনের সফর করতে মহিলাদেরকে নিষেধ করেছেন। পরবর্তীতে এই নিষেধাজ্ঞায় আরও কঠোরতা আরোপ করেছেন। প্রথমত তিন দিনের সফর নিষিদ্ধ ছিল, এবার দুই দিন। অথবা একদিন অথবা এক বারেদ (প্রায় ১২ মাইল) সফরও নিষিদ্ধ। অতএব, তিন দিন বিশিষ্ট রেওয়ায়াত যে নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করেছিল এই নিষেধকে, কম মেয়াদ বিশিষ্ট রেওয়ায়াত স্বীয় জায়গায় অবশিষ্ট রেখে আরও কিছু কঠোরতা

আরোপ করেছে। অর্থাৎ, তিন দিন তো নিষিদ্ধ ছিল, এবার দুই দিন অথবা এক দিন অথবা এক বারেদও নিষিদ্ধ। এতে বুঝা গেল, তিন দিন বিশিষ্ট রেওয়ায়াত আগে হলেও এর উপর আমল অবশিষ্ট আছে। কারণ, অন্য রেওয়ায়াতগুলো এই তিন দিনের নিষেধকে স্বস্থানে বাকি রেখে সময়ে কিছু কঠোরতা আরোপ করেছে। অতএব, তিন দিনের রেওয়ায়াতকে আগে মেনে রহিত সাব্যস্ত করলেও এর উপর আমল অবশিষ্ট থাকে।

যদি তিন দিন বিশিষ্ট রেওয়ায়াত পরবর্তীকালের হয়, তবে এটি রহিতকারী হবে। এমতাবস্থায় তিন দিনের সফর নিষিদ্ধ। এর উপরই আমল হবে। বাকি রইল প্রথম রেওয়ায়াতগুলোর সময়ের পরিমাণ। যেমন– দুই দিন, এক দিন অথবা এক বারেদের নিষেধাজ্ঞা সেটা এখন বাকি নেই, বরং রহিত হয়ে গেছে। তিনের কম বিশিষ্ট রেওয়ায়াতগুলোর দাবিকে তিন দিন বিশিষ্ট রেওয়ায়াতগুলো সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়েছে। এরূপ হয়নি যে, কম বিশিষ্ট রেওয়ায়াতের দাবিকে অবশিষ্ট রেখে তিন বিশিষ্ট রেওয়ায়াত মেয়াদে কিছু কমবেশি করেছে। বরং এবার প্রমাণিত হয়েছে যে, তিন দিনের সফর নিষিদ্ধ। এর চেয়ে কম নিষিদ্ধ নয়।

উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, তিন দিনের কম বিশিষ্ট রেওয়ায়াতগুলোকে যদি পরবর্তী মেনে নেওয়া হয়, তবে এগুলোর উপর আমল করতে হয়। কিন্তু এগুলোকে পূর্ববর্তী মানলে এগুলোর উপর আমল হয় না। কিন্তু তিন দিন বিশিষ্ট রেওয়ায়াত এর পরিপন্থী। কারণ, পূর্ববর্তী মানা হোক অথবা পরবর্তী উভয় ছুরতে এর উপর তো আমল হয়ে যায়। কাজেই এ রেওয়ায়াত শুধু পরবর্তী হলে আমলযোগ্য হয়। এর উপর সে রেওয়ায়াতটির প্রাধান্য হবে, যেটি পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী উভয় সুরতে আমলযোগ্য হয়। অতএব, তিন দিনের রেওয়ায়াতকে প্রধান সাব্যস্ত করে বলতে হবে, কোন মহিলার জন্য মাহরাম বা স্বামী ছাড়া তিন দিনের সফর করা জায়েয নেই, এর কম হলে জায়েয আছে।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নুখাবুল আফকার ঃ ৬/২-৩, আওজাযুল মাসালিক ঃ ৩/৭৩৭, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ ১/৩২২, বাদায়ি' ২/১২৪, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/৩০৭-৩১৮।

## باب التلبية كيف هى؟

## অনুচ্ছেদ ঃ তালবিয়া কিরূপ?

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

তালবিয়ার যেসব শব্দ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত, সেগুলো পড়া সম্পর্কে কোন মতবিরোধ নেই। কিন্তু এসব শব্দের উপর আরও বৃদ্ধি করে পড়া জায়েয আছে কিনা এ সম্পর্কে মতবিরোধ আছে।

১. ইমাম আবু হানীফা, আহমদ, মুহাম্মদ, সুফিয়ান সাওরী, আওযাঈ, আবু সাওর র. প্রমুখের মতে তালবিয়ার যেসব শব্দ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে, এগুলোর চেয়ে বাড়িয়ে আরও কিছু পড়লে কোন অসুবিধা নেই। এটি ইমাম শাফিঈ র. এর একটি উক্তি এবং ইমাম মালিক র. থেকে একটি রেওয়ায়াত। ان قوما قالوا لاباس للرجل ان يزيد فيها من الذكر لله ما احب وهو قول محمد والثورى والاوزاعى الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

২. ইমাম মালিক ও আবু ইউসুফ র. প্রমুখের মতে এসব শব্দের উপর বৃদ্ধি করা সমীচীন নয়। ইমাম শাফিঈ র. থেকে এটি একটি উক্তি। ইমাম তাহাভী র. যুক্তির আলোকে এটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

فَقَالُوا لاينبغىْ ان يزادَ فى التلبيةِ على ماقد علمَه رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ الناسَ على ماذكرنَا فى حديثِ عمروِبنِ معديكربَ ثم فعلَه هو فى الاحاديثِ الاُخرِ ولم يعلمْ ذالكَ مَن علَّمَه وهو ناقصٌ عن التلبيةِ ولاقالَ له لبِّ بماشئتَ مِما هو من جِنسِ هذا بلْ علمَه كما علَّم التكبيرَ فى الصلٰوة ومَا ينبغىْ ان يفعلَ فِيهَا ممَّا سوٰى التكبيرِ فكمَا لايَنبغىْ ان يتعدّٰى فِى ذالكَ شيئًا مِمَّا علَّمه فكذالكَ لايَنبغىْ ان يتعدّٰى فى التلبيةِ شيئًا مِمَّا علَّمَه -

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তালবিয়া সম্পর্কে ব্যাপক আকারে বলেননি যে, যা ইচ্ছা পড়, বরং তিনি কতগুলো বিশেষ কালিমা শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক শেখানো শব্দগুলো অসম্পূর্ণ হতে পারে না। অতএব, এগুলোর উপর বৃদ্ধি করা সমীচীন হবে না। যেমন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক শেখানো তাকবীরে তাহরীমার উপর অতিরিক্ত শব্দ বলা সমীচীন নয়। কাজেই নামাযের শুরুর তাকবীরে তাহরীমার মত হজ্জ ও উমরা শুরুর তালবিয়াতেও বৃদ্ধি করা সমীচীন নয়।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য মাআরিফুস সুনান ঃ ৬/৭৯, উমদাতুল ক্বারী ৯/১৭৩, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/৩৩২-৩৩৫।

## باب التطيب عند الاحرام

## অনুচ্ছেদ ঃ ইহরামের সময় সুগন্ধি ব্যবহার

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. ইমাম মালিক, যুহরী, আতা ও মুহাম্মদ র. প্রমুখের মতে ইহরামের পূর্বে এরূপ খুশবু ব্যবহার করা মাকরূহ, যার আছর ইহরামের পরেও অবশিষ্ট থাকে। কেউ এরূপ করলে এবং ইহরামের পর এই আছর দূরীভূত না করলে তার উপর ফিদিয়া দেয়া জরুরি। ইমাম তাহাভী র. এ মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এর পক্ষে যুক্তি পেশ করেছেন। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর, সাদ' ইবনে আবু ওয়াক্কাস, আবু সাঈদ খুদরী রা., আয়েশা, উম্মে হাবীবা, মুয়াবিয়া, মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া, দাঊদ জাহিরী, সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ, আহমদ, আবু ইউসুফ ও যুফার র. এর মতে ইহরামের পূর্বে এরূপ সুগন্ধি ব্যবহার করা বিনা মাকরূহ জায়েয, যার আছর ইহরামের পরেও অবশিষ্ট থাকে। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

فَامَّا بقاءُ نفسِ الطِيبِ على بدنِ المُحرمِ بعدَ ما احرمَ وان كانَ اِنما تطيَّبَ بهٖ قبلَ الاحرامِ فَلاَ ـ فتفهَم هذا الحديثَ،فاِنَّ معناه معنىً لطيفٌ فقد بيَّنَّا وجوهَ هٰذه الاٰثارِ فاحتَجْنَا بعدَ ذالكَ اَن نعلَمَ كيفَ وجهُ ما نحنُ فيهِ من الاختلافِ مِن طريقِ النظرِ، فَاعتبرنَا ذالكَ فرأينَا الاحرامَ يمنعُ من لبسِ القميصِ والسراويلاتِ والخفافِ والعمائمِ ويمنعُ من الطيبِ وقتلِ الصيدِ وامساكِه،ثم رأينَا الرجلَ اذا لبسَ قميصًا او سراويلاً قبلَ ان يحرِمَ ثم احرَم وهو عليهِ انه يؤمرُ بنزعِهٖ وان لم ينزَعه وتركَه عليهِ كانَ كمَن لبِسَه بعدَ الاحرامِ لبساً مستقبلاً، فيجبُ عليه فى ذالكَ مايجبُ عليهِ فيهِ لواستأنَفَ لبسَه بعد احرامِه ـ وكذالكَ لوصادَ صيدًا فى الحِلِّ وهو حلالٌ فامسَكه فى يده ثم احرم وهو فى يده امِرَ بتخليتِه واِن

لم يُخلِّه كانَ امساكُه اياهُ بعدَ احرامِه بصيدٍ كان منه بعد احرامِه المتقدِّم كامساكِه اياهُ بعد احرامِه بصيدٍ كانَ منه بعدَ احرامِه فلَمَّا كانَ ماذكرنَا كذٰلك وكانَ الطيبُ محرَّمًا على المُحرِم بعدَ احرامِه كحرمةِ هذه الاشياءِ كانَ ثبوتُ الطيبِ عليهِ بعدَ احرامِه وَان كانَ قد تطيَّبَ بهِ قبلَ احرامِه كتَطييبهِ بهِ بعدَ احرامِهِ قياسًا ونظرًا علٰى مابينَّا فهٰذا هو النظرُ فىْ هذاَ البابِ وبهِ نأخذُ وهوَ قولُ محمدِ بن الحسنِ رحـ ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ও হযরত আয়েশা রা.-এর হাদীসের উত্তর ঃ**

ইহরামের ফলে অনেক জিনিস নাজায়েয হয়ে যায়, যেমন– সেলাই করা পোশাক– জামা, পায়জামা, মোজা, পাগড়ি ব্যবহার করা, সুগন্ধি লাগানো, স্থলীয় জন্তু শিকার করা। আমরা দেখি, ইহরামের পর এসব জিনিসে লিপ্ত হওয়া যেরূপ হারাম সেরূপভাবে ইহরামের পূর্বে এগুলোতে লিপ্ত হয়ে ইহরামের পরও এগুলোতে থাকা হারাম। কেউ যদি ইহরামের পূর্বে সেলাই করা পোশাক পরে এবং তা না খুলে ইহরাম বেঁধে নেয়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে তাকে এই পোশাক খুলে ফেলার নির্দেশ দেয়া হবে। ইহরামের পর যদি সে তা না খুলে তবে এরূপ ব্যক্তির হুকুম হল, সে ঐ লোকের ন্যায়, যে ইহরামের পর নতুনভাবে সেলাই করা পোশাক পরল। ইহরামের পর এ পোশাক পরিধানকারীর উপর যেরূপ ফিদিয়া ওয়াজিব, এরূপভাবে ইহরামের পূর্বে পরে যে এ পোশাক পরে থাকবে তার উপরও ফিদিয়া ওয়াজিব হবে।

এরূপভাবে কেউ যদি ইহরামের পূর্বে হারামের বাইরে স্থলীয় জন্তু শিকার করে সেটাকে নিজের কাছে রেখে ইহরাম বাঁধে, তবে তাকে সে জন্তু ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হবে, না ছাড়লে তার উপর ফিদিয়া ওয়াজিব হবে, যেরূপ ফিদিয়া ওয়াজিব হয় ইহরামের পর শিকার করলে।

সারকথা, যে কাজ ইহরামের পর নাজায়েয, সে কাজ ইহরামের পূর্বে করে, ইহরামের পরেও এর উপর স্থির থাকা নাজায়েয। ইহরামের পর সুগন্ধি ব্যবহার করা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েয। কাজেই ইহরামের পূর্বে তা ব্যবহার করে ইহরামের পর পর্যন্ত এ অবস্থায় থাকাও নাজায়েয হবে। যুক্তির দাবি তাই।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য হিদায়া ঃ ১/২৪৬, আওজাযুল মাসালিক ঃ ৩/৩২৭, উমদাতুল ক্বারী ৯/১৫৬, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ ১/৩২৮, বাদায়ি' ২/১৪৪, মাআরিফুস সুনান ঃ ৬/২৯১, নায়লুল আওতার ঃ ৪/১৮৪, মুগনী ৩/১২০, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/৩৩৫-৩৪৬।

## باب مايلبس المحرم من الثياب؟

## অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম কি পোশাক পরিধান করবে?

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. মুহরিমের যদি লুঙ্গি প্রস্তুত না থাকে তবে ইমাম শাফিঈ, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী, আতা, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ র. প্রমুখের মতে সে সেলাই করা পায়জামা পরতে পারবে। এটা পরলে তার উপর ফিদিয়াও ওয়াজিব হবে না। فذهب الى هذه الاثار قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা, মালিক, ইমামুল হারামাইন, ইমাম গাযালী র. প্রমুখের মতে এমতাবস্থায় সেলাই করা পায়জামা পরিধান করা তার জন্য জায়েয নেই। বরং এটাকে ছিঁড়ে লুঙ্গি বানিয়ে পরিধান করবে। এটাও যদি সম্ভব না হয়, তবে পায়জামাই পরিধান করবে। তবে এমতাবস্থায় ফিদিয়া আদায় করা জরুরি। এরূপভাবে যদি জুতা মওজুদ না থাকে, তবে ইমাম আহমদ র. এর মতে বন্ধ মোজাও পরিধান করা জায়েয আছে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে এমতাবস্থায় মোজা কেটে জুতার মত ব্যবহার করবে। যদি না কেটে ব্যবহার করে তবে তার উপর ফিদিয়া ওয়াজিব হবে। সেলাই করা পায়জামা অথবা মোজা প্রয়োজনকালে পরিধান করলেও ফিদিয়া ওয়াজিব হবে। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এটা ইমাম তাহাভী র. এর যুক্তির আলোকে তিনি প্রমাণ করেছেন।

وَاَما النظرُ على ذٰلكَ فاِنا رأينَاهم لم يختلفُوا فيمنْ وجدَ اِزارًا اَنَّ لبسَ السروايلِ لهٗ غيرُ مباحٍ لِاَنَّ الاحرامَ قَد منعهُ من ذالكَ وكذالكَ من وَجدَ نعلينِ فحرامٌ عليهِ لبسُ الخفينِ مِن غيرِ ضرورة فَاردنَا ان ننظرَ فى لبسِ ذالكَ مِن طريقِ الضرورةِ كيفَ هوَ وهلْ يوجبُ كفارةً او لاَ يُوجبُهُا؟ فاعتبرنَا ذالكَ فرأينَا الاحرامَ ينهٰى عنْ اشياءَ قد كانتْ مباحةً قبلَه مِنها لبسُ القميصِ والعمائمِ والخِفافِ والسراويلاتِ والبَرانسِ وكانَ من اضطرَّ فوجدَ الحَرَّ فغطّٰى رأسَه اَو وجدَ البردَ فلبِسَ ثِيابَه انه قَد فعلَ ماهو مباحٌ لهٗ

فعلُه وعليهِ الكفارةُ مع ذالكَ وحرَّم عليه الاحرامُ ايضا حلقَ الرأسِ الَاّ من ضرورةٍ وكانَ من حلَق رأسَه من ضرورةٍ فقدْ فَعلَ ماهوَ له مباحٌ والكفارةُ عليه واجبةٌ، فكانَ حلقُ الرأسِ للمحرمِ فى غيرِ حالِ الضرورةِ اذا اُبيحَ فى حالِ الضرورةِ لم يكنْ اباحتُه تُسقطُ الكفارةَ فى ذالكَ كلِّه واجبةً فى حالِ الضرورةِ كهى فى غيرِ حالِ الضرورةِ۔

وكذٰلكَ لبسُ القميصِ الذى حُرّم عليه فى غيرِ حالِ الضرورةِ فاذَا كانتِ الضرورةُ فابيحَ ذالكَ لهُ لم يسقطْ بذالكِ الضّمانُ فكانتِ الكفارةُ عليهِ واجبةً فى ذٰلكَ كلِّه فلمْ يكنِ الضرورةُ فى شيءٍ مماذكرنَا تُسقطُ كفارةً كانتْ تجبُ فى شيءٍ فى غيرِ حالِ الضرورةِ ۔ وانّما تُسقطُ الاٰثامَ خاصةً، فكذلكَ الضروراتُ فى لبسِ الخِفافِ والسَّراويلاتِ لاتوجبُ سقوطَ الكفاراتِ التىْ كانتْ تجبُ لَو لم تكنْ تلك الضروراتُ ولٰكنها ترفعُ الاٰثام خاصةً فهٰذا هُو النظرُ فى هذا البابِ ايضا وهو قولُ ابىْ حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمهمُ اللهُ تعالى ۔

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

অনেক জিনিস ইহরামের পূর্বে বৈধ থাকে, ইহরামের কারণে হারাম হয়ে যায়। যেমন– সেলাইকৃত পোশাক– জামা, পাগড়ি, বুরনুস (আরবী এক প্রকার লম্বা টুপি অথবা এরূপ পোশাক যার কিছু অংশ টুপির জায়গায় ব্যবহৃত হয়), পায়জামা ইত্যাদি ব্যবহার করা, চুল বা নখ কাটা। এসব জিনিস অপারগতা অবস্থায় ব্যবহার করলে যেমন– প্রচণ্ড গরমের কারণে বাধ্য হয়ে মাথা ঢেকে ফেললে, ভীষণ ঠাণ্ডার কারণে সেলাইকৃত কাপড় ব্যবহার করলে, রোগ ইত্যাদির কারণে মাথা মুণ্ডালে এগুলো সব জায়েয, করলে কোন গুনাহ নেই। কিন্তু এর ফলে সর্বসম্মতিক্রমে কাফফারা ওয়াজিব হবে। যেরূপ বিনা প্রয়োজনে এগুলোতে লিপ্ত হলে কাফফারা ওয়াজিব হয়।

এতে বুঝা গেল, ইহরামের ফলে যেসব জিনিস নিষিদ্ধ হয়, বিনা প্রয়োজনে ও অপারগতা ছাড়া এগুলোতে লিপ্ত হলে যেরূপভাবে কাফফারা ওয়াজিব হয়,

এরূপভাবে বাধ্যতামূলক লিপ্ত হলেও কাফফারা ওয়াজিব হয়। প্রয়োজন ও অপারগতার কারণে শুধু গুনাহ হয় না। কাজেই প্রয়োজনের মুহূর্তে মোজা অথবা পায়জামা পরলে যদিও কোন গুনাহ হবে না, কিন্তু কাফফারা দিতে হবে। যেরূপভাবে বিনা প্রয়োজনে পরলে কাফফারা দিতে হয়।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য মাআরিফুস সুনান ঃ ৬/৯৭, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ ১/৩৭৪, আওজাযুল মাসালিক ঃ ৩/৩১২, উমদাতুল ক্বারী ৯/১৬২, নুখাবুল আফকার ঃ ৬/৫৪, ৫৫, ঈযাহুত্ তাহাভী ঃ ৩/৩৪৬-৩৫১।

## باب لبس الثوب الذى قد مسه ورس او زعفران فى الاحرام

## অনুচ্ছেদ ঃ ইহরামে হলুদ রংয়ের কিংবা জাফরান রংয়ের কোন কাপড় পরিধান করা

### মাযহাবের বিবরণ ঃ

ورس হলুদ রংয়ের এক প্রকার ঘাস। এগুলোর চাষ হয় শুধু ইয়ামানে। এই ওয়ারাস অথবা জাফরান রংয়ে রঙিন পোশাক ইহরাম অবস্থায় পরা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েয। কিন্তু যদি ধৌত করা হয়, যার ফলে এর সুঘ্রাণ অবশিষ্ট না থাকে, তবে তা ব্যবহার করা জায়েয কি না– এ বিষয়ে মতানৈক্য আছে।

১. মুজাহিদ, হিশাম ইবনে উরওয়া, উরওয়া ইবনে যুবাইর, ইবনে হাযম র. প্রমুখের মতে এবং ইমাম মালিক র. এর এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী ওয়ারাস অথবা জাফরান রংয়ে রঙিন পোশাক ইহরাম অবস্থায় ব্যবহার করা ব্যাপক আকারে নাজায়েয–হারাম। চাই ধৌত করা হোক না কেন। فذهب قوم الى هذه الاثار الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ, আহমদ, হাসান বসরী, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখঈ বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে ধৌত করার পর তা ব্যবহার করা জায়েয। এটি ইমাম মালিক র. এরও মাযহাব। ইমাম তাহাভী র. যুক্তির আলোকে এটি প্রমাণ করেছেন। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

فَقَالُوا ماغُسِلَ من ذلك حتى صارَ لاينفضُ فلا بأسَ بلبسه فى الاحرامِ، لان الثوبَ الذى صُبِغَ انما نُهِىَ عن لبسه فى الاحرامِ لِمَاكَانَ قد دَخلَهُ مما هوَ حرامٌ على المُحرمِ،فَاذَا غسلَ فخرجَ ذالكَ

منهُ ذهبَ المعنىُ الذىْ لهُ كانَ النهىُ وعادَ الثوبُ الى اصلِهِ الاولِ قبلَ ان يصيبَه ذالكَ الذىْ غسلَ منه وقالُوا هٰذا كالثوبِ الطاهرِ يُصيبُه النجاسةُ فنيجسُ بذٰلك فَلاتجوزُ الصلوةُ فيه فاذا غُسلَ حتى يخرجَ منه النجاسةُ طهرَوحلتِ الصلوةُ فِيه ـ

**যৌক্তিক প্রমাণঃ**

যেরূপভাবে নাপাক মিশ্রিত কাপড় ধৌত করার পর পবিত্র হয়ে যায় ও স্বীয় আসল অবস্থার দিকে ফিরে আসে, এর ফলে নামায সহীহ হয়ে যায়, এরূপভাবে ওয়ারাস বা জাফরান মিশ্রিত কাপড়ও ধোয়ার পর স্বীয় আসল অবস্থার দিকে ফিরে আসবে। ইহরাম অবস্থায় তা ব্যবহার করা জায়েয হবে।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নুখাবুল আফকার ঃ ৬/ ৬১, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ ১/৩২৭, আওজাযুল মাসালিক ঃ ৩/৩১৫, মাআরিফুস সুনান ঃ ৬/১০১, নায়লুল আওতার ঃ ৪/২১৮, মুগনী ৩/১৪১, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/৩৫২-৩৫৫।

## باب الرجل يحرم وعليه قميص كيف ينبغى ان يخلعه

## অনুচ্ছেদ ঃ জামা পরে ইহরাম বাধলে কিভাবে তা খোলা চাই

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

যদি কেউ জামা পরিহিত অবস্থায় ইহরাম বাধে তবে ইহরাম বাধার পর স্বীয় শরীর থেকে এ জামা কিভাবে খুলবে– এ বিষয়ে মতানৈক্য হয়েছে।

১. হযরত শা'বী, নাখঈ, সাঈদ ইবনে জুবাইর, মাসরূক, হাসান বসরী, আবু কিলাবা, আবু সালিহ ও সালিম র. প্রমুখের মতে এ ব্যক্তির জন্য জামা মাথার উপর দিয়ে খোলা জায়েয হবে না। কারণ, এর ফলে অবশ্যই মাথা ঢাকতে হবে, যা ইহরাম অবস্থায় জায়েয নেই, বরং এই জামা ছিঁড়ে খুলতে হবে। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম চতুষ্টয়, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, সুফিয়ান সাওরী বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে এটাকে মাথার দিক থেকে টেনে খুলবে, যেরূপ হালাল অবস্থায় খোলা হয়। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَامَّا وجهُ ذالكَ من طريقِ النظرِ فانَّا رأينَا الذينَ كرهُوا نزعَ القميصِ انما كَرهُوا ذالكَ لانه يُغطِّي رأسَه اذا نزَع قميصَه فَاردنَا ان ننظرَ هل يكونُ تغطيةُ الرأسِ فى الاحرامِ على كلِّ الجهاتِ مَنهيًّا عنهَا اَم لا؟ فرأينَا المُحرِمَ نُهِيَ عن لبسِ القَلانسِ وَالعمائمِ والبرانسِ فنُهِي ان يلبسَ رأسَه شيأً كمَا نهِيَ ان يلبسَ بدنه القميصَ ۔

وَرأينَا المحرِمَ لوحملَ على رأسهٖ شيأً ثياباً اوغيرَها لم يكنْ بذُلكَ بأسٌ ولم يدخلْ ذالكَ فيمَا قَد نُهِى عن تغطيةِ الرأسِ بِالقَلانسِ ومَا اشبههَا، لِانه غيرُ لابسٍ فكانَ النهىُ اِنَّما وقعَ مِن ذالكَ على تغطيةِ مايلبسهُ الرأسَ لَا على غيرِ ذالك مِمَّا يغطِّىْ بهٖ وكذالكَ الابدانُ نهِي عن الباسِها القميصَ ولَم يُنهَ عن تجليلِها بالازُرِ، فلمَّا كانَ ما وقَع عليه النهىُ من هٰذا فى الراسِ اِنمَا هو الالباسُ لاالتغطيةُ التى ليست بالباسٍ وكانَ اذا نزعَ قميصَه فلاقُى ذالكَ رأسَه فليسَ ذالكَ بالباسٍ منهُ لرأسهٖ شيئًا اِنما ذَالكَ تغطيةٌ منه لرأسهٖ ۔

وَقد ثبتَ بماذكرنَا ان النهيَ عن لبسِ القلانسِ لم يقعْ على تغطيةِ الرأسِ وانما وقعَ على الباسِ الرأسِ فى حالِ الاحرامِ مايلبسُ فى حالِ الاحلالِ. فلمَّا خرجَ بذلكَ مااصابَ الرأسَ مِن القميصِ المنزوعِ من حالِ تغطيةِ الرأسِ المنهيِّ عنهَا ثبتَ اَنه لَابأسَ بذالكَ قياسًا ونظراً على ماذكرنَا وهُذا قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمهُم اللهُ تعالٰى ۔

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

যুক্তির সারমর্ম হল, কোন পোশাক পরিধান করতে গিয়ে যদি মাথা ঢাকে, তবে তা ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ। যেমন– টুপি, পাগড়ি, বুরনুস ইত্যাদি পরে মাথা ঢাকা। কিন্তু যদি না পরে মাথা ঢেকে দেয় যেমন– কাপড় বা অন্য কিছু এমনি মাথার উপর তুলে নেয়, তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। এতে বুঝা গেল, সর্বপ্রকার মাথা ঢাকা নিষিদ্ধ নয়। বরং পোশাক পরিধান আকারে যদি হয়, তবে তা নিষিদ্ধ। যেমন– দেহে সেলাই করা কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ কিন্তু তার উপর সেলাই করা কাপড়ের গাট্টি রেখে দেয়া নিষিদ্ধ নয়। অতএব, জামা পরিহিত অবস্থায় যে ইহরাম বেধেছে তার জন্য সে জামা মাথার দিক থেকে টেনে বের করা নিষিদ্ধ হবে না। কারণ, এর ফলে যে মাথা ঢাকা হচ্ছে, তা পোশাক পরিধানরূপে নয়। এটাতো শরীর থেকে খোলা উদ্দেশ্য, মাথায় পরা উদ্দেশ্য নয়।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য উমদাতুল ক্বারী ৯/১৬২, মাআরিফুস সুনান ঃ ৬/১০৩, আওজাযুল মাসালিক ঃ ৩/৩২৬, নুখাবুল আফকার ঃ ৬/৬৩, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/৩৫৫-৩৫৯।

## باب ماكان النبى صلى الله عليه وسلم به محرما فى حجة الوداع

## অনুচ্ছেদ ঃ বিদায় হজ্জে নবী করীম স. কিসের ইহরাম বেঁধেছিলেন?

**হজ্জের প্রকারভেদ ঃ**

হজ্জ তিন প্রকার–

১. হজ্জে ইফরাদ, অর্থাৎ মীকাত থেকে শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধা।

২. তামাত্তু অর্থাৎ হজ্জের মাসগুলোতে প্রথমত উমরার ইহরাম বেঁধে অতপর উমরা থেকে অবসর হওয়ার পর সে বছরই হজ্জের ইহরাম বাঁধা।

৩. কিরান অর্থাৎ, মীকাত থেকে হজ্জ ও উমরা উভয়ের ইহরাম বাঁধা অথবা, প্রথমে উমরার ইহরাম বাঁধা, তারপর উমরা থেকে অবসর হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ, চার চক্কর তওয়াফের পূর্বে হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জকে উমরার ভেতর প্রবিষ্ট করে দেয়া।

**বিদায় হজ্জে নবীজী সা. মুফরিদ ছিলেন, না তামাত্তুকারী, না কিরানকারী?**

বিদায় হজ্জে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফরাদ আদায়কারী ছিলেন, না তামাত্তুকারী, না কিরান আদায়কারী? এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন রকম

রেওয়ায়াত আছে। কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুফরিদ, কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা তামাত্তুকারী, আবার কোনটি দ্বারা কিরান আদায়কারী ছিলেন বলে বুঝা যায়। এ মতানৈক্যের ভিত্তিতে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য হয়েছে যে, তিন প্রকার হজ্জের মধ্যে কোনটি উত্তম?

১. ইমাম মালিক আওযাঈ, ইবরাহীম নাখঈ, আমির শা'বী, মুজাহিদ র. প্রমুখের মতে সর্বোত্তম হল হজ্জে ইফরাদ, অতপর তামাত্তু, অতপর কিরান।

২. ইমাম শাফিঈ, আহমদ, হাসান বসরী, আতা, খালিদ, কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ও ইকরামা র. এর মতে সর্বোত্তম হল, হজ্জে তামাত্তু, অতঃপর ইফরাদ, অতঃপর কিরান।

৩. ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, সুফিয়ান সাওরী, মুযানী র. প্রমুখের মতে সর্বোত্তম হল কিরান, অতঃপর তামাত্তু, অতঃপর ইফরাদ।

উল্লেখ্য, কানযুদ দাকায়িকের হাশিয়ায় ইমাম মালিক র.-এর দিকে তামাত্তু উত্তম হওয়ার বিষয়টি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। এটি সহীহ নয়।

যারা ইফরাদকে উত্তম বলেন, তাদের মতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের ইফরাদ আদায়কারী ছিলেন। কাজেই তাদের মতে হজ্জে ইফরাদ উত্তম। যাঁরা তামাত্তুকে উত্তম বলেন, তাদের মতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তামাত্তু আদায়কারী ছিলেন, কাজেই তাদের মতে তামাত্তুই উত্তম। হানাফীদের মতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে কিরান আদায়কারী ছিলেন। অতএব, তাঁদের মতে, হজ্জে কিরানই উত্তম।

قَد اَثبتنَا عنهُ فِيمَا تقدمَ مِن كتابِنَا هٰذا اَنه قدْ كانَ احرمَ فِى دُبرِ الصلٰوةِ فِى المسجدِ، فيحتملُ اَن يكونَ الذينَ قَالُوا اِنه قرنَ سمعُوا تلبيتَه فِى المسجدِ بالعمرةِ ثُم سمعُوا بعدَ ذالكَ تلبيتَه الاُخراى خارجًا مِن المسجدِ بالحجِّ خاصةً فعلِموُا اَنه قَرنَ وسمعَه الذينَ قَالُوا اِنه اَفردَ وقدْ لَبّٰى بالحجِّ خاصةً ولَم يَكُونُوا سمِعُوا تلبيتَه قبلَ ذالكَ بالعمرةِ، فقَالُوا افردَ وسمعَه قومٌ ايضًا وقد لبّٰى

فِى المسجدِ بالعمرةِ ولَم يسمعُوا تَلبِيتَه بعدَ خروجِه مِنه بالحجّ ثُمَّ رأوهُ بعدَ ذالكَ يفعلُ مَايفعلُ الحاجُّ مِن الوقوفِ بعرفةَ ومَا اشبهَ ذالكَ وكانَ ذالكَ عِندهُم بعدَ خروجِه مِن العمرةِ فقالُوا تمتَّعَ، فروٰى كلُّ قومٍ مَاعلِمُوا وقدْ دَخلَ جميعُ مَاعلمَه الذينَ قالُوا اَفردَ ومَا علِمَه الذينَ قَالُوا اِنه تمتَّع فِيما عَلِم الذينَ قالُوا اِنه قرنَ لِانهُم اخبرُوا عَن تلبيتِه بالعمرةِ ثم عنْ تلبِيتِه بالحجةِ بعقبِ ذالكَ فصارَ ماذَهبُوا اليهِ مِن ذالكَ ومَاروَوا اولىٰ مِمَّا ذهبَ اِليهِ مَن خالفَهم ومَا روَوْا، ثُمَّ قد وجدْنَا بعدَ ذالكَ افعالَ رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم تدلُّ علىٰ اَنَّه كانَ قارنًا ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

বিদায় হজ্জে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তালবিয়া কিরূপ ছিল– এ প্রসঙ্গে রেওয়ায়াত বিভিন্ন ধরনের। কোন কোন রেওয়ায়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তালবিয়া لبيك بحجة আর কোন রেওয়ায়াতে لبيك بعمرة আবার কোন রেওয়ায়াতে بحجة وعمرة ছিল বলে বুঝা যায়। এ কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইহরাম শুধু হজ্জের ছিল, নাকি উমরার, নাকি উভয়ের– এ বিষয়টি নির্ধারণে মতপার্থক্য হয়ে যায়।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে উপরোক্ত তিন প্রকার তালবিয়া বর্ণিত আছে। প্রতিটি রেওয়ায়াত সহীহ। অতএব আমরা এটাও বলতে পারি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার তালবিয়া বলেছেন। لبيك بحجة তালবিয়া দ্বারা তিনি ইফরাদ আদায়কারী, لبيك بعمرة দ্বারা তামাত্তু আদায়কারী এবং لبيك بحجة দ্বারা কিরান আদায়কারী ছিলেন বলে বুঝা যায়। তবে তিনি ইফরাদ আদায়কারী ছিলেন, না তামাত্তু, না কিরান আদায়কারী– এটা নির্ধারণ করতে হবে বিভিন্ন তালবিয়া সামনে রেখে।

আমরা বলতে বাধ্য যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ ও উমরা উভয়ের ইহরাম বেঁধেছিলেন। তিনি কোন সময় তালবিয়া পড়াকালে বলেছেন– لبيك بحجة وعمرة কেউ এটা শুনেছেন, কোন কোন সময় শুধু হজ্জের উল্লেখ করে তালবিয়া পড়েছেন– لبيك بحجة এটা কেউ কেউ শুনেছেন। আবার কোন কোন সময় শুধু উমরার উল্লেখ করে বলেছেন– لبيك بعمرة। কেউ কেউ এটা শুনেছেন। সবাই নিজের শ্রবণ অনুযায়ী বিবরণ দিয়েছেন। এবার যদি শুধু হজ্জের রেওয়ায়াত ধরে তাঁকে ইফরাদ আদায়কারী সাব্যস্ত করা হয়, তবে তাকে উমরার রেওয়ায়াত বর্জন করতে হবে, এরূপভাবে যদি শুধু উমরার রেওয়ায়াত মেনে তাঁকে তামাত্তুকারী সাব্যস্ত করা হয়, তবে হজ্জের রেওয়ায়াত বর্জন করতে হবে। অতএব, হজ্জ ও উমরার রেওয়ায়াত অর্থাৎ لبيك بحجة وعمرة কে আসল সাব্যস্ত করতে হবে। এর ফলে অবশিষ্ট দুই রেওয়ায়াতের উপরও আমল হয়ে যাবে। কোন রেওয়ায়াত বাদ দিতে হবে না। অতএব, সমস্ত রেওয়ায়াতের উপর আমল এবং পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানকে অসম্পূর্ণ জ্ঞানের উপর প্রাধান্য দিতে গিয়ে বলা উচিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তালবিয়া ছিল– لبيك بحجة وعمرة তিনি বিদায় হজ্জে কিরান আদায়কারী ছিলেন, ইফরাদ বা তামাত্তু আদায়কারী নন। অতএব, হজ্জে কিরানই উত্তম সাব্যস্ত হল।

ثُمَّ الْكَلَامُ بَعْدَ ذَالِكَ بَيْنَ الَّذِيْنَ جَوَّزُوا التَّمَتُّعَ وَالْقِرَانَ فِي تَفْضِيْلِ بَعْضِهِمِ الْقِرَانَ عَلَى التَّمَتُّعِ وَفِي تَفْضِيْلِ الْاُخْرِيْنَ التَّمَتُّعَ عَلَى الْقِرَانِ فَنَظَرْنَا فِي ذَالِكَ فَكَانَ فِي الْقِرَانِ تَعْجِيْلَ الْاِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَفِي التَّمَتُّعِ تَاخِيْرُه، فَكَانَ مَاعَجَّلَ مِنَ الْاِحْرَامِ بِالْحَجِّ فَهُوَ اَفْضَلُ وَاَتَمُّ لِذَلِكَ الْاِحْرَامِ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَلِيٍّ رض فِي قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ قَالَ اِتْمَامُهَا اَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ اَهْلِكَ حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِوبْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ رض۔

فَلَمَّا كَانَ فِى الْقِرَانِ تَقْدِيمُ الاحرامِ بالحجِّ على الوقتِ الذى يحرمُ بهِ فِى التمتعِ كَانَ القرانُ افضلَ مِنَ التمتعِ وكُلَّما ثَبَّتْنَا وصَحَّحْنَا فِى هذا البابِ قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمهمُ اللهُ تعالىٰ ـ

**হজ্জে কিরানের উত্তমতার উপর একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ ঃ**

হজ্জে ইফরাদে শুধু একটি আমল পাওয়া যায়। কিন্তু তামাত্তু ও কিরানে হজ্জ ও উমরার দু'টি আমল পাওয়া যায়। অতএব, ইফরাদ থেকে তামাত্তু ও কিরান উত্তম হবে। তামাত্তুতে যেহেতু প্রথমত উমরার ইহরাম হয়, অতঃপর উমরা থেকে অবসর হয়ে হজ্জের ইহরাম বাঁধা হয়, যার ফলে হজ্জের ইহরামে দেরী হয়। কিন্তু কিরানে প্রথম থেকেই হজ্জ ও উমরা উভয়টি অথবা প্রথমে উমরার ইহরাম এবং উমরার কাজ থেকে অবসর হওয়ার আগেই হজ্জের ইহরাম বাঁধা হয়, যাতে হজ্জের ইহরাম আগে বাঁধা হয়। কাজেই হজ্জে ইহরাম আগে বাঁধার ছুরত তথা কিরান পরে বাঁধার সুরত তথা তামাত্তু থেকে উত্তম হবে। যুক্তির দাবি তাই।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য কিতাবুল ফিকহি আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ ঃ ১/৬৯০, মাআরিফুস সুনান ঃ ৬/৩৯, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ ১/৩৩৫, নুখাবুল আফকার ঃ ৬/৭১, নববী ঃ ১/৩৮৫, আলবাহরুর রায়িক ২/৩৫৭, মুগনী ৩/১২২, বযলুল মাজহুদ ঃ ৩/৯৭, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/৩৬৭-৪০১।

## باب الهدى يساق لمتعة او قران هل يركب ام لا ؟

## অনুচ্ছেদ ঃ তামাত্তু অথবা কিরানের জন্য যে পশু নিয়ে যাওয়া হয়, তার উপর আরোহণ করা যাবে কিনা?

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. আহলে জাহির ও উরওয়া ইবনে যুবাইর, ইসহাক র. ও আসহাবে জাওয়াহিরের মতে এবং ইমাম আহমদ র. এর একটি রেওয়ায়াত অনুযায়ী কুরবানীর জানোয়ারের উপর আরোহণ করা সাধারণত জায়েয। চাই প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ, মালিক, হাসান বসরী, আতা র. এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামী আইনবিদের মতে এবং ইমাম আহমদ র. এর দ্বিতীয়

রেওয়ায়াত অনুযায়ী প্রয়োজনের মুহূর্তে কুরবানীর পশুর উপর আরোহণ করা জায়েয আছে। অবশ্য ইমাম আবু হানীফা র. এর মতে শুধু প্রয়োজন যথেষ্ট নয়, বরং ভীষণ প্রয়োজন হলে তথা বাধ্যতার অবস্থা হলে জায়েয আছে। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ثُم اعتَبرْنَا حكمَ ذَالكَ مِن طريقِ النظرِ كيفَ هُو؟ فَرأينَا الاشياءَ علٰى ضربينِ فَمِنهَا مَا الملكُ فيهِ متكاملٌ لَم يدخلهُ شئٌ يُزيلُ عنهُ شيئًا مِن احكامِ الملكِ كالعبدِ الذىْ لَم يدبِّره مولَاهُ وكالامةِ التى لم تَلدْ مِن مولاهَا وكالبَدَنةِ التىْ لَم يُوجِبهَا صاحبُهَا فكلُّ ذالكَ جائزٌ بيعُه وجائزٌ الانتفاعِ بهِ وجائزٌ تمليكُ منافِعهِ بابدالٍ وبِلا ابدالٍ ـ

ومنهَا ماقَد دخَله شئٌ منِعَ مِن بيعِه ولَم يُزلْ عنه حكمَ الانتفاعِ به مِن ذالكَ امُّ الولدِ التىْ لايجوزُ لِمولَاها بيعُها والمدبرُ فِى قولِ مَن لايرىُ بيعَه، فذالكَ لابأسَ بالانتفاعِ بهِ وبتمليكِ منافِعِه للذىْ يُريدُ انَ ينتفعَ بِهَا ببدلٍ اَوبِلا بدلٍ فكانَ مالُهُ ان ينتفعَ بِه فلَه ان يملكَ منافعَه مَن شَاء بابدالٍ وبلا ابدالٍ ثم رأينَا البدنةَ اِذا اوجبَها ربُّها فكلُّ قَداجمعَ انَه لَايجوزُ لهُ اَن يواجرَها ولَايَتعوضَ بمنافِعِها بدلاً، فلمَّا كانَ ليسَ لهُ تمليكُ منافِعِها ببدلٍ كانَ كذٰلكَ ليسَ لهُ الانتفاعُ بهَا ولاَ يكونُ لهُ الانتفاعُ بشئٍ اِلَّا شئٌ لهُ التعوضُ بمنافِعِه اِبدالاً منهَا ـ فهٰذا هُو النظرُ ايضًا وهوَ قولُ ابىْ حنِيفَةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمَهم اللهُ تعالىُ ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

সমস্ত জিনিস মালিকানা হিসাবে দু' প্রকার–

১. যেসব জিনিসে মালিকানা পূর্ণাঙ্গ। মালিকানার বিধানের মধ্য হতে কোন বিধানকেও দূর করার কোন জিনিস সেখানে বিদ্যমান থাকবে না। যেমন–

খালেস গোলাম এবং সে বাঁদী যেটি মালিকের পক্ষ থেকে উম্মে ওয়ালাদ হয়নি, এরূপভাবে যে উটের উপর মালিক কোন জিনিস ওয়াজিব করেনি, এগুলোতে পূর্ণাঙ্গ মালিকানা বিদ্যমান। অতএব, এগুলোকে বিক্রি করা, এগুলো থেকে উপকৃত হওয়া এবং অন্য কাউকে এগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার মালিক বানানো, চাই কোন জিনিসের বিনিময়ে হোক বা বিনিময় ছাড়া– এ সবকিছু জায়েয আছে।

২. যেসব জিনিসে মালিকানা পূর্ণাঙ্গরূপে নেই। বরং মালিকানার কোন কোন বিধান দূরীভূতকারী কোন জিনিস সেখানে প্রবেশ করেছে, যেমন– উম্মে ওয়ালাদ- তাকে বিক্রি করা জায়েয নেই। অবশ্যই তা থেকে নিজে উপকৃত হওয়া, অন্যকে এর দ্বারা বিনিময় বা বিনিময় ছাড়া উপকৃত হওয়ার মালিক বানানো, এসব জায়েয আছে। এরূপভাবে আরেকটি উদাহরণ হল মুদাব্বার, তাঁদের মাযহাব অনুযায়ী যাঁদের মতে তাকে বিক্রি করা জায়েয নেই।

এ দু'প্রকারে চিন্তা করার পর স্পষ্ট হল, কোন জিনিসের মধ্যে তার মালিকের মালিকানা পূর্ণাঙ্গ হোক বা অসম্পূর্ণ, যদি এ জিনিস দ্বারা স্বয়ং মালিকের জন্য উপকৃত হওয়া জায়েয হয়, তবে অন্যদেরকেও এর দ্বারা উপকারিতা লাভের মালিক বানানো জায়েয হয়, চাই বিনিময় সহকারে হোক অথবা বিনিময় ছাড়া। এরূপ কোন জিনিস পাওয়া যায় না, যদ্বারা নিজে উপকৃত হওয়া জায়েয আছে, কিন্তু অন্যকে এর মালিক বানানো জায়েয নেই বা এর পরিপন্থী। বরং যদি জায়েয হয়, তবে উভয়টি জায়েয, নাজায়েয হলে উভয়টি নাজায়েয।

কুরবানীর জন্তু সম্পর্কে সবাই একমত যে, অন্য কাউকে তার উপকারিতা লাভের মালিক বানিয়ে তা থেকে বিনিময় ও পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয নেই। যেহেতু বিনিময় নিয়ে অন্যকে উপকারিতার মালিক বানানো জায়েয নেই, সেহেতু এ থেকে নিজেও উপকৃত হওয়া জায়েয হবে না। এটা হল উপরোক্ত মূলনীতির দাবি। অবশ্য অপারগতার অবস্থায় তা জায়েয হওয়া আলাদা ব্যাপার। কারণ, অনেক নাজায়েয জিনিস যেমন– মৃতবস্তু খাওয়াও অপারগতার অবস্থায় জায়েয হয়ে যায়। অতএব, ইমাম আবু হানীফা র. এর মাযহাব প্রমাণিত হল।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নুখাবুল আফকার ঃ ৬/১১৫, উমদাতুল ক্বারী ১/২৯, আওজাযুল মাসালিক ঃ ৩/৫৩৩, মাআরিফুস সুনান ঃ ৬/২৭৫, নায়লুল আওতার ঃ ৪/৩৩৩, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ ১/৩৭৮, নববী ঃ ১/৪২৬, উমদাতুল ক্বারী ১০/২৯, মুগনী ৩/২৮৭, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/৪০২-৪০৬।

## باب الصيد يذبحه الحلال فى الحل هل للمحرم ان ياكل منه ام لا ؟

## অনুচ্ছেদ ঃ হালাল ব্যক্তির হিল্লে কোন শিকার জবাই করার পর মুহরিমের জন্য তা খাওয়া জায়েয কিনা?

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

মুহরিমের জন্য স্থলীয় শিকার কুরআনের নস অনুযায়ী হারাম। এরূপভাবে যদি মুহরিম কোন অমুহরিমের শিকারে সাহায্য করে অথবা ইঙ্গিত দেয় কিংবা পথ প্রদর্শন করে তবুও সে শিকার মুহরিমের জন্য খাওয়া সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। অবশ্য যদি মুহরিমের সাহায্য, পথ প্রদর্শন অথবা ইঙ্গিত ছাড়া কোন অমুহরিম শিকার করে, তবে মুহরিমের জন্য এরূপ শিকার খাওয়া জায়েয কিনা- এ ব্যাপারে ইসলামী আইনবিদগণের মতবিরোধ আছে।

১. সুফিয়ান সাওরী, মুজাহিদ, জাবির ইবনে যায়েদ র. প্রমুখের মতে মুহরিমের জন্য এরূপ শিকার খাওয়া সাধারণত নিষিদ্ধ যা হালাল ব্যক্তি শিকার করেছে। চাই হালাল ব্যক্তি তার নিজের জন্য শিকার করুক অথবা অন্যের জন্য। হযরত ইবনে উমর, জাবির রা. ও তাউস র. থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম শাফিঈ, মালিক, আতা, ইসহাক, আবু সাওর ও আহমদ র. এর মতে যদি অমুহরিম মুহরিমের জন্য অর্থাৎ, তাকে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে শিকার করে, তবে মুহরিমের জন্য তা খাওয়া নাজায়েয। যদি মুহরিমের নিয়তে শিকার না করে, তবে জায়েয। দ্বিতীয় فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

৩. আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, সাঈদ ইবনে জুবাইর র. প্রমুখের মতে মুহরিমের জন্য এরূপ শিকার খাওয়া সাধারণত জায়েয। চাই হালাল ব্যক্তি মুহরিমের জন্য শিকার করুক অথবা তার নিজের জন্য। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَقَدْ رَأيْنَا النظَرَ ايضًا يدلُّ علٰى هٰذا وذٰلكَ انَهُم اَجمعُوا اَن الصيدَ يحرمُهُ الاحرامُ على المحرِمِ ويحرِّمه الحرمُ علٰى الحلالِ وكانَ مَن صادَ صيدًا فِى الحلِّ فذبَحَهُ فِى الحلِّ ثُم ادخلَه الحرمَ

فَلابأسَ بِاكلِهِ اياهُ فِى الحرمِ ولَم يكُنْ اِدخالُه لحمَ الصيدِ الحرمَ كادخالِه الصيدَ نفسَه وهوحىٌّ الحرمَ، لِانه لَوكانَ كذلكَ لنهُى عن ادخالِه ولَمنَعَ مِن اكلِه اياهُ فيهِ كمَا يمنعُ مِن الصيدِ فِى ذالكَ كله ولكَانَ اِذا اكلَه فِى الحرمِ وجبَ عليهِ مَاوجبَ فِى قتلِ الصيدِ، فلمَّا كانَ الحرمُ لايمنعُ مِن لحمِ الصيدِ الذى صيدَ فِى الحلِّ كمَا يمنعُ من الصيدِ الحيِّ كانَ النظرُ على ذلكَ ان يكونَ كذٰلكَ الاحرامُ ايضًا يحرِّمُ على المحرِمِ الصيدَ الحىَّ ولايحرّمُ عليهِ لحمَه اِذا تولّى الحلالُ ذبحَه قياسًا ونظرًا علٰى ماذكرنَا مِن حكمِ الحرمِ، فهٰذا هوَ النظرُ فِى هٰذا البابِ وهوَ قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمَهم اللهُ تعالٰى .

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

শিকারের প্রতিবন্ধক দু'টি জিনিস–

১. ইহরাম। এজন্য ইহরাম অবস্থায় শিকার করা হারাম।

২. হেরেম। হেরেম শরীফের মধ্যে অমুহরিমের জন্যও শিকার করা নিষিদ্ধ।

এবার যদি কোন অমুহরিম ব্যক্তি হেরেমের বাইরে তথা হিল্লে শিকার করে সেখানেই জবাই করে, অতঃপর তাকে হেরেমের ভিতরে প্রবিষ্ট করে, তবে তার জন্য হেরেমে তা খাওয়া সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয।

জবাই করার জন্য শিকারের গোশত হেরেমের ভিতরে প্রবিষ্ট করা জীবন্ত শিকার প্রবিষ্ট করানোর মত নয়। অন্যথায় তার মত এটাও নিষিদ্ধ হত। হেরেমের ভিতর শিকার করার ফলে তার উপর যে জিনিস ওয়াজিব হত, তার গোশত খাওয়ার কারণে সে জিনিসই তার উপর ওয়াজিব হত। এতে বুঝা গেল হেরেম শুধু জীবন্ত শিকারের প্রতিবন্ধক, শিকারের গোশতের জন্য প্রতিবন্ধক নয়। অতএব এরূপভাবে ইহরামও মুহরিমের ক্ষেত্রে শুধু জীবন্ত শিকারের জন্য প্রতিবন্ধক হবে, এর গোশতের জন্য নয়। যখন এর জবাইকারী হবে অমুহরিম। এ কারণে মুহরিমের জন্য তা শিকার করা জায়েয না হলেও অমুহরিমের জবাইকৃত শিকারের গোশত খাওয়া অবশ্যই জায়েয।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য উমদাতুল ক্বারী ১০/১৬৯, নুখাবুল আফকার ঃ ৬/১৩১-১৩৭, নববী ঃ ১/৩৭৯, মুগনী ৩/১৪৫, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/৪১৭-৪৩৪।

## باب رفع اليدين عند روية البيت

## অনুচ্ছেদ ঃ বাইতুল্লাহ শরীফ দর্শনকালে হস্তদ্বয় উত্তোলন

### মাযহাবের বিবরণ ঃ

বাইতুল্লাহ শরীফ দর্শন করে দোয়া করা সর্বসম্মতিক্রমে মুস্তাহাব। অবশ্য এই দোয়া হস্ত উত্তোলন করে হবে না হস্তদ্বয় উত্তোলন ছাড়া, এ সম্পর্কে মতানৈক্য আছে।

১. ইমাম শাফিঈ র. বলেন, বাইতুল্লাহ শরীফ দর্শনকালে হস্তদ্বয় উত্তোলনকে আমি মাকরূহ মনে করি না, আবার মুস্তাহাবও মনে করি না। তবে আমার মতে এটি ভাল।

ইবরাহীম নাখঈ, আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ, আলকামা, সাঈদ ইবনে জুবাইর র. প্রমুখের মতে বায়তুল্লাহ শরীফ দর্শনকালে হাত তুলে দোয়া করা বিধিবদ্ধ ও মাসনুন। فان قوما ذهبوا الى ذالك الخ . দ্বারা তাঁদেরকে বুঝানো হয়েছে।

২. ইমাম আবু হানীফা, মালিক, আহমদ, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, সুফিয়ান সাওরী, আওযাঈ র. প্রমুখের মতে এই হস্তদ্বয় উত্তোলন (করে দোয়া করা) মাকরূহ। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আল্লামা ইবনে হুমাম, মোল্লা আলী ক্বারী র.সহ অনেক হানাফী তত্ত্বজ্ঞানীর মতে বাইতুল্লাহ শরীফ দর্শনকালে হস্তদ্বয় উত্তোলন মুস্তাহাব।

উল্লেখ্য, ইমাম আবু হানিফা ও শাফিঈ র. এটাকে মাকরুহ বলেন বলে যারা উক্তি করেছেন তাদের উক্তি সঠিক নয়।

### এ মাসআলায় ইমাম তাহাভী র. এর মত

ইমাম তাহাভী র. হস্তদ্বয় উত্তোলন না করার প্রাধান্য দিয়েছেন। এটাকেই ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ র. এর উক্তি বলেছেন। তিনি বিভিন্ন যৌক্তিক প্রমাণের আলোকে তা সাব্যস্ত করেছেন।

فَارَدْنَا اَنْ نَنْظُرَ فِى رفعِ اليدينِ عِنْد رؤيةِ البيتِ هَل هوَ كذالكَ اَم لَا؟ فرأينَا الذينَ ذهبُوا اِلى ذالكَ ذهبُوا اَنه لَا لعلةِ الاحرامِ ولكن

لِتعظيمِ البيتِ وقدْ رأينَا الرفعَ بعرفةَ والمزدلفةِ وعندَ الجمرتينِ وعلى الصفَا والمروةِ اِنمَا امرَ بذالكَ مِن طريقِ الدعاءِ فِي الموطنِ الذىْ جعِلَ ذالكَ الوقوفُ فيهِ لعلةِ الاحرامِ وقدْ رأينَا مَن صارَ الى عرفةَ او مزدلفةَ او موضعِ رمىِ الجمارِ اوالصفَا والمروةِ وهو غيرُ محرمٍ اَنه لايرفعُ يديهِ لِتغظيمِ شئٍ مِن ذالكَ، فلمَّا ثبتَ اَن رفعَ اليدينِ لَايؤمرُبهِ فِي هذهِ المواطِنِ اِلَّالعلةِ الاحرامِ ولاَ يؤمرُبه مِن غيرِ الاحرامِ كانَ كذالكَ لَايؤمرُبرفعِ اليدينِ لِرؤيةِ البيتِ فِي غيرِ الاحرامِ فاِذَا ثبتَ اَن لايؤمَرَ بذالكَ فِى غيرِ الاحرامِ ثبتَ اَن لَايؤمَرَبهِ اَيضًا فِى الاحرامِ -

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

নিম্নোক্ত স্থানগুলোতে সর্বসম্মতিক্রমে হস্তদ্বয় উত্তোলন রয়েছে–

১. নামায শুরুর সময়, ২. সাফা পাহাড়ে, ৩. মারওয়া পাহাড়ে, ৪. আরাফায়, ৫. মুযদালিফায়, ৬. উভয় পাথর নিক্ষেপকালে (দুই জামরায়)।

চিন্তা করলে বুঝা যায়, এসব স্থানের কোনটিতে হস্তদ্বয় উত্তোলনের হুকুম নামাযের তাকবীরের কারণে। যেমন– নামায শুরুর প্রাক্কালে। আর কোন কোন স্থানে দোয়ার কারণে। যেমন– বাকি স্থানগুলোতে। নামায শুরু ছাড়া অন্যত্র হস্তদ্বয় উত্তোলন মূলতঃ ইহরামের কারণে। এ কারণেই এসব স্থানে ইহরামের ফলে অবস্থান করতে হয় এবং এগুলোতে দোয়া করা হয়, স্থানের সম্মানার্থে নয়। এ কারণেই যে ব্যক্তি ইহরাম ছাড়া এসব স্থান অতিক্রম করে, তাদের জন্য হস্তদ্বয় উত্তোলনের হুকুম নেই। অতএব, যেহেতু এসব স্থানে শুধু ইহরাম অবস্থায় হস্ত উত্তোলনের হুকুম, ইহরাম না থাকলে হস্ত উত্তোলন নেই, সেহেতু বাইতুল্লাহ শরীফ দর্শনকালে যদি ইহরাম না থাকে, তবে সেসব স্থানের ন্যায় এতেও হস্ত উত্তোলনের হুকুম না হওয়া উচিত।

যেহেতু ইহরাম না থাকার সময় হস্ত উত্তোলন নেই, সেহেতু ইহরামের সময়ও হস্ত উত্তোলন না হওয়া উচিত। কারণ, বাইতুল্লাহ শরীফ দর্শনকালে হস্তদ্বয় উত্তোলনের প্রবক্তাদের মতেও তা শুধু বাইতুল্লাহ শরীফের সম্মানার্থে করা হয়। এর কারণ ইহরাম নয়। অতএব, ইহরামের কারণে এতে নতুন কোন হুকুম সৃষ্টি

হবে না। বরং ইহরাম না থাকা অবস্থায় যেরূপ হস্তদ্বয় উত্তোলন ছিল না, অনুরূপ ইহরাম অবস্থায়ও হবে না। যার ফলে বাইতুল্লাহ দর্শনকালে সাধারণভাবে হস্তদ্বয় উত্তোলন না হওয়াই প্রমাণিত হয়।

وحجةٌ اخرٰى اَنَّا قَد رأينَا مَايؤمَرُ برفعِ اليديـنِ عنـدَه فِى الاحرام ماكانَ مأمورًا بِالوقوفِ عندَه مِن المواطنِ التِىْ ذكرنَا وَقدْ رَأينَا جمرةَ العقبةِ جمرةً كغيرِهَا مِن الجمارِ غيرَ انَّه لاَ يوقفُ عندها فلم يكنْ هُنَاكَ رفعٌ فالنظرُ علٰى ذالكَ اَن يكونَ البيتُ لِمالَم يكنْ عندَه وقوفٌ اَن لاَيكونَ عندَه رفعٌ قياسًا ونظرًا علٰى مَاذكرنَا مِن ذالكَ وهٰذَا الذِىْ ثبّتنَاه بالنظرِ هُو قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمَهم اللهُ تعالٰى ـ

**আরেকটি যুক্তি ঃ**

দ্বিতীয় যুক্তি হল, ইহরাম অবস্থায় হস্তদ্বয় উত্তোলনের হুকুম শুধু এরূপ স্থানগুলোতে, যেগুলোতে অবস্থানের নির্দেশ রয়েছে। এ কারণে জামরায়ে আকাবাতে অবস্থান নেই বলে এতে হস্ত উত্তোলনের হুকুমও নেই। অতএব, যুক্তির দাবি হল, বাইতুল্লাহ শরীফের নিকট যেহেতু অবস্থানের হুকুম নেই, সেহেতু সেখানে হস্ত উত্তোলনের হুকুমও না হওয়া।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নুখাবুল আফকার ঃ ৬/১৪৮, নায়লুল আওতার ঃ ৪/২৫৮, হাশিয়ায়ে তিরমিযী ১/১৭৪, বযলুল মাজহুদ ঃ ৩/১৩৮, শামী ২/৪৯২, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/৪৩৫-৪৪২।

## باب ما يستلم من الاركان فى الطواف

## অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াফে কোন রোকনে স্পর্শ করবে?

**চার রোকনের ব্যাখ্যা ঃ**

اركان শব্দটি ركن এর বহুবচন। এর অর্থ হল কোণ– স্তম্ভ। এখানে উদ্দেশ্য দু'টি দেয়ালের সাথে মেলার ফলে সৃষ্ট বহির্কোণ। কাবা গৃহের চারটি রোকন রয়েছে–

১. রোকনে আসওয়াদ,

২. রোকনে ইয়ামানী। এ দু'টিকে প্রবলতার ভিত্তিতে ইয়ামানিয়াইন বলা হয়।

৩. রোকনে শামী।

৪. রোকনে ইরাকী।

এ দু'টিকে শামিয়াইন বলা হয়। কুরাইশ যখন কাবা ঘর নির্মাণের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করে তখন চাঁদা কম হওয়ার কারণে তাঁরা হযরত ইবরাহীম আ. এর মূল ভিত্তির উপর তা নির্মাণ করতে পারেননি। বরং শামী দু'রোকনের দিকে কিছু অংশ আলাদা ছেড়ে নির্মাণ করেছেন। এই পরিত্যাক্ত স্থানটিকে বলে হাতীম। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. স্বীয় খিলাফত আমলে এই পরিত্যক্ত স্থানটিকে অন্তর্ভুক্ত করে হযরত ইবরাহীম আ. এর মূল ভিত্তির উপর তা নির্মাণ করেন। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর এই নবনির্মাণের কারণে সব দেয়াল হযরত ইবরাহীম আ. এর মূল স্তম্ভের উপরে এসে যায়। এ কারণে তিনি রোকন চতুষ্টয় স্পর্শ করতেন। অতঃপর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কুরাইশের মূলভিত্তির উপর পুনঃনির্মাণ করেন। এতে হাতীম পরিহার করেন। বর্তমানে এ অবস্থাতেই আছে।

১. যদিও কোন কোন সাহাবা ও তাবেঈন এগুলোর স্পর্শেরও প্রবক্তা ছিলেন। হযরত মুআবিয়া, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর, উরওয়া ইবনে যুবাইর, সুয়াইদ ইবনে গাফালা, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, হাসান, হুসাইন, আনাস রা. রোকন চতুষ্টয় স্পর্শের প্রবক্তা ছিলেন। ইমাম তাহাভী র. সংখ্যাগরিষ্ঠের মত যুক্তির আলোকে প্রমাণ করেছেন। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. যেহেতু শামী রোকনদ্বয় মূলতঃ কাবা গৃহের কিনারা নয়, সেহেতু হযরত উমর, ইবনে আব্বাস রা. ইমাম চতুষ্টয়, মুজাহিদ, সুফিয়ান সাওরী বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে শুধু ইয়ামানী রোকনদ্বয় স্পর্শ হবে। শামী রোকনদ্বয় স্পর্শ হবে না। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وكَانَ مِنَ الحجةِ عندَنا واللهُ اعلمُ لِمَنْ ذهبَ اِلى هٰذه الاٰثارِ ايضًا علٰى مَن ذهبَ اِلى مَاخالفَها اَنَّ الركنينِ اليَمانيينِ هُما مَبنيانِ علٰى مُنتهى البيتِ مِمَّا يليْهِمَا والاخرانِ ليسَاكذالكَ لِانَ الحجرَ وراءَهما وهُو مِن البيتِ وقَد اَجمعُوا اَنَّ مَابينَ الركنينِ اليَمانيينِ لَايستلمُ لِانه ليسَ بركنٍ للبيتِ فكانَ يجئُ فِى النظرِ

اَن يكونَ كذلكَ الركنانِ الاُخرانِ لاَيستلمانِ، لِاَنهمَا ليسَابِرُكنينِ للبيتِ وقدرُوِىَ عَن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ فِى الحجرِ اَنهُ مِنَ البيتِ ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ**

বিভিন্ন রেওয়ায়াত ও ইতিহাসের আলোকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, শামী রোকনদ্বয় মূলতঃ কাবা ঘরের রোকন ও কোণ নয়। আর ইয়ামানী রোকনদ্বয় স্পর্শ করা হয় শুধু রোকন হওয়ার কারণে। এ কারণে এ দু'টি রোকনের মধ্যবর্তী অংশে স্পর্শ করা হয় না। অতএব, কোণ না হওয়ার দিক দিয়ে শামী রোকনদ্বয় ইয়ামানী রোকনদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানের ন্যায় হয়ে গেল। অতএব, যেরূপভাবে ইয়ামানী দু'রোকনের মধ্যবর্তী স্থানে কোণ না হওয়ার কারণে স্পর্শ নেই। অনুরূপভাবে, শামী রোকনদ্বয়ের মধ্যেও স্পর্শ হবে না।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য উমদাতুল ক্বারী ৯/২৫৫, নুখাবুল আফকার ঃ ৬/১৬১, মুগনী ৩/১৮৮, নায়লুল আওতার ঃ ৪/২৬৫, মাআরিফুস সুনান ঃ ৬/১৪৯, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/৪৫২-৪৫৬।

## باب الصلوٰة للطواف بعد الصبح وبعد العصر

## অনুচ্ছেদ ঃ আসর ও ফজরের পর তাওয়াফের নামায

**প্রথম দল ঃ**

এরূপ পাঁচটি ওয়াক্ত রয়েছে, এগুলোতে নামায পড়া সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এসেছে–

১. সূর্যোদয় কালে, ২. সূর্যাস্তকালে, ৩. দ্বিপ্রহরে, ৪. ফজর নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত, ৫. আসর নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

প্রতিটি তাওয়াফের পর যে দু'রাক'আত নামায পড়া হয়, সে দু'রাক'আত এসব মাকরূহ সময়েও আদায় করা যায় কিনা–এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।

১. ইমাম তাহাভী র. এক সম্প্রদায় থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাদের মতে সাধারণভাবে যে কোন সময়ে এই নামায আদায় করা যায়। উপরোক্ত পাঁচ মাকরূহ ওয়াক্ত হলেও।

ইমাম শাফিঈ, আহমদ, ইসহাক, উরওয়া, তাউস, কাসিম ইবনে মুহাম্মদ র. প্রমুখের মতে ফজর উদয়ের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত

তাওয়াফের নামায বিনা মাকরূহ জায়েয। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

তাদের প্রমাণ হযরত আবুদ দারদা রা. এর উক্তি। তিনি সূর্যাস্তের পূর্বে তাওয়াফের নামায পড়েছেন। ফলে তাঁর সামনে 'আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন নামায নেই' এই রেওয়ায়াত পেশ করে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন–

ان هذا البلد ليس كسائر البلدان ـ

'এই শহর তথা মক্কা অন্যান্য শহরের মত নয়।'

২. ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, সাঈদ ইবনে জুবাইর, হাসান বসরী র. প্রমুখের মতে এবং এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী ইমাম মালিক র. এর মতে উপরোক্ত সময়ে তওয়াফের নামায পড়া মাকরূহ তাহরীমী। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইমাম তাহাভী র. যুক্তির আলোকে প্রথোমক্ত দলের মত খণ্ডন করেছেন।

৩. ইমাম সুফিয়ান সাওরী, আতা, মুজাহিদ, ইবরাহীম নাখঈ ও তাহাবী র. এর মতে ফজর উদয়ের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং আসরের পর সূর্য হলুদ হবার পূর্বে তাওয়াফের নামায জায়েয আছে। وقالت فرقة يصلى للطواف بعد العصر قبل اصفرار الشمس وبعد الصبح قبل طلوع الشمس الخ ـ দ্বারা তাদের দিকে ইঙ্গিত করেছে।

والنظرُ يدلُّ علٰى ذالكَ ايضًا لِانَّا قَد رأينَا رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم نهٰى عَن صيامِ يومِ الفطرِ ويومِ النحرِ فكلٌّ قَد اجمعَ اَن ذالكَ فِى سائرِ البلدانِ سواءٌ فالنظرُ على ذٰلكَ اَن يكونَ مَانُهِى عنهُ مِن الصلَوات فِى الاوقاتِ التىْ نُهِىَ عنِ الصلوات فِيهَا فِى سائرِ البلدانِ كلِّها علٰى السواءِ فبطَلَ بذالكَ قولُ مَن ذهبَ اِلى اباحةِ الصلٰوةِ للطوافِ فِى الاوقاتِ المنهِىِّ عنِ الصلٰوةِ فيهَا، ثُم اختلفَ الذينَ خالَفُوا اهلَ المقالةِ الاولٰى فِى ذالكَ علٰى فِرقتينِ

فقالت فرقة منهم لايصلى فى شئ من هذه الخمسة الاوقات للطواف كما لايصلى فيها للتطوع وممن قال ذالك ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى .

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

যেরূপভাবে কোন কোন সময় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, এরূপভাবে কোন কোন দিনে রোযা রাখতেও নিষেধ করা হয়েছে। যেমন– ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন। এবার লক্ষ্য করুন, রোযার এই নিষেধে মক্কা ও অমক্কা সব শহরই সর্বসম্মতিক্রমে সমান। এসব দিনেই রোযা রাখা যেরূপ মক্কা ছাড়া অন্যত্র নিষিদ্ধ এরূপভাবে মক্কায়ও নিষিদ্ধ। অতএব, নামাযের এই নিষেধাজ্ঞায়ও মক্কা ও অন্য সব শহর সমান হবে।

**দ্বিতীয় ও তৃতীয় দল ঃ**

২. আরেক দলের মতে এই পাঁচ মাকরূহ সময়ের মধ্য হতে আসরের পর সূর্য হলুদ হওয়ার পূর্বে এবং ফজরের পর সূর্যোদয়ের আগে তাওয়াফের এই নামায আদায় করা যাবে। অবশিষ্ট তিন ওয়াক্তে এই নামায পড়া মাকরূহ। এটিই হল, হযরত আতা, তাউস, কাসিম, উরওয়া, শাফিঈ ও আহমদ র. এর মাযহাব।

৩. ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ র. এবং এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী ইমাম মালিক র. এর মাযহাব হল, তাওয়াফের এই নামায পঞ্চ মাকরূহ ওয়াক্তের কোনটিতেই আদায় করা যাবে না। মুজাহিদ সাঈদ ইবনে জুবাইর ও হাসান বসরী র. এ মত পোষণ করেন। ইমাম তাহাভী র. এ মাসআলায় ইমাম শাফিঈ ও আহমদ র. এর মত অবলম্বন করে যুক্তির আলোকে এর প্রাধান্য দিয়েছেন।

وكان النظر فى ذالك لما اختلفوا هذا الاختلاف انا رأينا طلوع الشمس وغروبها ونصف النهار يمنع من قضاء الصلوات الفائتات وبذالك جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تركه قضاء الصبح التى نام عنها الى ارتفاع الشمس وبياضها فاذا كان ماذكرنا ينهى عن قضاء الفرائض الفائتات

فَهو عنِ الصلواتِ للطوافِ انهىٰ وقد قالَ عقبةُ بن عامرٍ ثلٰثُ ساعاتٍ كانَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يَنهانا ان نُصلِّيَ فِيهنَّ وان نقبُرَ فيهنَّ موتَانا حين تطلعَ الشمسُ بازغةً حتى ترتفعَ وحينَ يقومُ قائمُ الظهيرةِ حتى يَميلَ وحينَ تضيفَ الشمسُ للِغروبِ حتى تغربَ ـ

وقد ذكرنَا ذالك باسنادِه فيمَا تقدمَ مِن كتابنَا هٰذا،فإذا كانتْ هٰذه الاوقاتُ تنهىٰ عن الصلٰوة على الجنائزِ فالصلٰوةُ للطوافِ ايضا كذالكَ وكذالكَ كانتِ الصلٰوةُ بعدَ العصرِ قَبلَ تغيرِ الشمسِ وبعدَ الصبحِ قبلَ طلوعِ الشمسِ مباحةً على الجنائزِ ومباحةً فى قضاءِ الصلٰوةِ الفائتةِ ومكروهةً فى التطوعِ وكانَ الطوافُ يوجبُ الصلٰوةَ حتى يكونَ وجوبُها كوجوبِ الصلوةِ على الجنائزِ ـ

فالنظرُ على ماذكرنَا ان يكونَ حكمُها بعد وجوبِها كحكمِ الفرائضِ التى قد وجبتْ وحكمُ الصلٰوة علىٰ الجنازةِ التى قد وجبتْ فَتكونُ الصلٰوةُ للطوافِ تصلّى فى كلِّ وقتٍ يصلّى فِيه على الجنازةِ وتقضىٰ فيه الصلوةُ الفائتةُ ولا تصلّى فى كل وقتٍ لايصلّى فيهِ على الجنازةِ ولا تقضى فيه صلوةٌ فائتةٌ فهٰذا هو النظرُ عندنَا فى هٰذا الباب على ما قالَ عطاءٌ وابراهيمُ ومجاهدٌ وعلىٰ ما قدروِى عن ابنِ عمرَ رض واليه نذهبُ وهو قولُ سفيانَ وهو خلافُ قول ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمهم الله تعالى ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও দ্বিপ্রহরের সময় নফল নামাযের সাথে সাথে কাযা নামায ও জানাযার নামায পড়াও নিষিদ্ধ। বিভিন্ন রেওয়ায়াতের আলোকে তা প্রমাণিত। অতএব, যেহেতু কাযা নামায ও জানাযা নামায এ সব সময়ে পড়া নিষিদ্ধ,

সেহেতু তাওয়াফের নামায পড়াও উত্তমরূপেই নিষিদ্ধ হবে। এর পরিপন্থী আসরের পর সূর্য হলুদ হওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়। কারণ, এগুলোতে শুধু নফল নামায নিষিদ্ধ। কাযা ও জানাযা নামায নিষিদ্ধ নয়। তাওয়াফের নামায যেহেতু তাওয়াফের কারণে ওয়াজিব হয়, সেহেতু এর সাদৃশ্য রয়েছে কাযা ও জানাযা নামাযের সাথে। কারণ, ওয়াক্তিয়া নামায ছুটে গেলে কাযা এবং জানাযা উপস্থিত হলে নামাযে জানাযা ওয়াজিব হয়। এ কারণে যেসব ওয়াক্তে কাযা ও জানাযা নামায পড়া যাবে সেসব ওয়াক্তে তাওয়াফের নামাযও পড়া যাবে। যেসব ওয়াক্তে এ দু'টো নিষিদ্ধ হবে, এটিও নিষিদ্ধ হবে। অতএব, যেহেতু আসরের পর সূর্য হলুদ হওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত কাযা ও জানাযার নামায পড়া মাকরূহ নয়, সেহেতু তাওয়াফের নামায পড়াও মাকরূহ হবে না।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ফাতহুল বারী ঃ ৩/৪৮৮, মাআরিফুস সুনান ঃ ৬/১৬৫, আওজাযুল মাসালিক ঃ ৩/৫০৪, নুখাবুল আফকার ঃ ৬/১৬৭, উমদাতুল ক্বারী ৯/২৭১, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/৪৫৮-৪৬৫।

## باب من احرم بحجة فطاف لها قبل ان يقف بعرفة

## অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বেঁধে আরাফায় অবস্থানের পূর্বে এর জন্য তাওয়াফ করে

**মাসআলার ব্যাখ্যা ঃ**

হজ্জের রোকন দু'টি– ১. আরাফায় অবস্থান। এর সময় হল, যিলহজ্জের ৯ তারিখে সূর্য হেলা থেকে ১০ই যিলহজ্জের ফজর উদয় পর্যন্ত।

২. তাওয়াফে যিয়ারত এর ওয়াক্ত শুরু হয় ১০ তারিখের ফজর উদয় থেকে। আসল হুকুম হল, হজ্জের ইহরামকারী ব্যক্তি ৯ তারিখে আরাফায় অবস্থান এবং ১০ তারিখে তাওয়াফে যিয়ারতের পর কুরবানী করে স্বীয় ইহরাম খুলে হালাল হয়ে যাবে।

১. যদি হজ্জের ইহরামওয়ালা ব্যক্তি আরাফায় অবস্থানের পূর্বে তাওয়াফ করে, তবে একদল আলিমের মতে যদি সে কুরবানীর পশু নিয়ে না যায়, তবে এই তাওয়াফের মাধ্যমে কুরবানীর দিনের পূর্বেই এ ব্যক্তি হালাল হয়ে যাবে।

তন্মধ্যে রয়েছেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, আতা, দাউদ, জাহিরী ও আসহাবে জাওয়াহির। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা, মালিক, শাফিঈ বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হল, হজ্জ আরম্ভ করার পর তার সমস্ত বিধান পূর্ণ করার পূর্বে কারও জন্য হজ্জ থেকে বেরিয়ে আসার অনুমতি নেই। কাজেই কুরবানীর দিনের আগেই তাওয়াফ অথবা অন্য কোন কিছুর মাধ্যমে এ ব্যক্তি হালাল হতে পারবে না। ইমাম তাহাভী র. সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকেই যুক্তির আলোকে প্রাধান্য দিয়েছেন। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وامَّا وجهُ ذالكَ من طريقِ النظرِ فانَّا قد وجدنَا الاصلَ انَّ مَن احرمَ بعمرةٍ وطافَ لها وسعٰى انه قد فرغَ منها ولهٗ ان يحلِقَ ويحلَّ، هٰذا اذا لم يكنْ ساقَ هديًا ورأينَاهُ اِذا كانَ قد ساقَ هديًا لِمتعةٍ فطافَ لعمرتهٖ وسعٰى لم يحلَّ مِن عمرتِه حتّٰى يومَ النحرِ فَيحلُّ مِنها ومِن حجتِه اِحلالا واحدًا ـ

وبذالكَ جاءتِ السنةُ عن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم جوابًا لِحفصةَ رض لَمَّاقالتْ له مابالُ الناسِ حلُّوا ولم تحلَّ انتَ مِن عمرتِك؟ قالَ انى لبَّدتُّ رأسِىْ وقلدتُ هدِيىْ فلاَ اَحلُّ حتى انحرَ فكانَ الهدىُ الذى ساقَ للمتعةِ التى لايكونُ عليهِ فيها هدىٌ الّاَبان يحجَّ بعدهَا يَمنعُهُ مِن ان يحلَّ بِالطوافِ حتى يومِ النحرِلانَّ عقدَ احرامِه هٰكذا كانَ ان يدخلَ فى عمرةٍ فيُتِمَّها فَلاَ يحلُّ مِنها حتى يُحرمَ بحجةٍ ثم يحلَّ منهَا ـ ومَنَ العمرةِ التى قدَّمها قبلَها معًا وكانتِ العمرةُ لواَحرمَها منفردةً حلَّ مِنها بفَراغِهٖ مِنها اذا حلقَ ولم يَنتظِرْبه يومَ النحرِ وكانَ اذا ساقَ الهدىَ لحجةٍ يحرمُ بِها بعدَ فراغِه مِن تلكَ العمرةِ بقىَ على احرامِه اِلٰى يومِ النحرِ، فلمَّا كانَ الهدىُ الذىْ هوَ مِن سببِ الحجِّ يَمنَعُه

الاحلالُ بالطوافِ بالبيتِ قبلَ يومِ النحرِ كانَ دخولُه فى الحجِّ احرٰى اَن يمنعَه مِن ذالكَ الٰى يومِ النحرِ، فهٰذا هُو النظرُ ايضا عندَنا وهُو قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمَّدٍ رحمهمُ اللهُ تعالٰى ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

যে উমরার ইহরাম বেঁধেছে এবং উমরার তাওয়াফ ও সাঈ করেছে সে উমরা থেকে অবসর হয়েছে। সে মাথা মুণ্ডন করে হালাল হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সে হজ্জের জন্য কুরবানীর পশু নেয়, তবে উমরার তাওয়াফ ও সাঈ করার পরেও হালাল হতে পারে না। বরং কুরবানীর দিন পর্যন্ত তাকে স্বীয় ইহরামের উপর থাকতে হয়। অথচ সে এ পর্যন্ত হজ্জের কাজ শুরুও করেনি। বরং শুধু হজ্জের জন্য কুরবানীর পশু নিয়ে এসেছে। অতএব, কুরবানীর দিনের পূর্বে তাওয়াফের মাধ্যমে হালাল হওয়া থেকে যেহেতু কুরবানীর পশু আনয়নই প্রতিবন্ধক, যেটি হজ্জের শুধু কারণ, সেহেতু হজ্জের কাজ শুরু করা উত্তমরূপেই এরজন্য প্রতিবন্ধক হবে। কারণ, হজ্জের কারণেই এর প্রতিবন্ধক। কাজেই হজ্জ শুরু প্রতিবন্ধক হবে না কেন?

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নুখাবুল আফকার ঃ ৬/১৮২, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/৪৬৬-৪৭৪।

## باب القارن كم عليه من الطواف لعمرته ولحجته

## অনুচ্ছেদ ঃ কিরানকারীর হজ্জ ও উমরার জন্য কয় তাওয়াফ?

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. ইমামত্রয় ইসহাক ইবনে ইবরাহীম, আতা, হাসান বসরী, দাউদ জাহিরী র. প্রমুখের মতে কিরান আদায়কারীর উপর একটি তাওয়াফ ও একটি সায়ী যথেষ্ট। দুটি তাওয়াফ ও দুটি সায়ী আবশ্যক নয়– তাঁদের মতে কিরান আদায়কারীর জন্য মুফরিদের মত এক স্বতন্ত্র তাওয়াফ ও সায়ী উমরা করতে হয়। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. হযরত উমর, আলী, ইবনে মাসউদ রা. ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, আওযাঈ, সুফিয়ান সাওরী র.-এর মতে কিরান আদায়কারীর

উপর দু' তাওয়াফ ও দু' সায়ী আবশ্যক। এক তাওয়াফ ও এক সায়ী যথেষ্ট নয়। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মোটকথা, হানাফীদের মতে কিরান আদায়কারী উমরা ও হজ্জের জন্য আলাদা আলাদা দু'টি তাওয়াফ করবে। ইমামত্রয়ের মতে উভয়টির জন্য এক তাওয়াফ। ইমাম তাহাভী র. হানাফীদের মাযহাবকে প্রাধান্য দিয়ে যুক্তি পেশ করেছেন।

وامَّا وجهُ ذالكَ من طريقِ النظرِ فانَّا رأينَا الرجلَ اذا احرمَ بحجةٍ وجبتْ عليهِ بمَا فيهَا مِن الطوافِ بالبيتِ والسعيِ بينَ الصفَا والمروةِ ووَجبَ عليهِ فى انتهاكِ ماقدحرمَ عليهِ باحرامِه بهِا مِن الكفاراتِ مايجبُ عليهِ فى ذالكَ وكذالكَ اذا احرمَ بعمرةٍ وجبتْ عَليهِ ايضا لِمَا فيهَا من الطوافِ بالبيتِ والسعيِ بينَ الصفَا والمروةِ وجبَ عليهِ فى انتهاكِ ما حرمَ عليهِ باحرامِه بهَا من الكفاراتِ ما يجبُ عليهِ فى ذالكَ۔ وكانَ اذا جَمعَهما فكلُّ قَداجمعَ انَه فى حُرمتينِ حُرمةِ حجةٍ وحُرمةِ عمرةٍ،فكانَ يجئُ فى النظرِ اَن يُجيبَ لكلِّ واحدٍ منهمَا من الطوافِ والسعيِ وغيرِ ذالكَ مِنَ الكفاراتِ فى انتهاكِ الحرمِ التى حرمتْ عليه بِها ماكانَ يجبُ عليهِ لَها لَو افردَهَا ۔

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

যদি কেউ শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধে, তবে তাকে হজ্জের কাজ তথা বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ ইত্যাদি করতে হয়। ইহরাম পরিপন্থী কোন কাজ করলে তার উপর নির্ধারিত কাফফারা ওয়াজিব হয়। এরূপভাবে যদি কেউ শুধু উমরার ইহরাম বাঁধে তবে তাকে উমরার কাজ তথা বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করতে হয়। ইহরাম পরিপন্থী কোন কাজ করলে তার উপর নির্ধারিত কাফফারা ওয়াজিব হয়। যদি কেউ হজ্জ ও উমরা উভয়টি একত্রে করে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে সে ব্যক্তির দু'টি

ইহরাম রয়েছে– হজ্জের ইহরাম ও উমরার ইহরাম। অতএব, যুক্তির দাবি হল, যেহেতু ইহরাম দু'টি, সেহেতু প্রতিটি ইহরামের জন্য তার উপর স্বতন্ত্র তাওয়াফ ও সাঈ আবশ্যক হওয়া, ইহরাম পরিপন্থী কোন কাজ করলে তার উপর কাফফারা আবশ্যক হওয়া। মোটকথা, যেহেতু কিরান আদায়কারীর ইহরাম দ্বিগুণ, সেহেতু তাওয়াফ, সাঈ ও কাফফারাও দ্বিগুণ হওয়া উচিত।

فادخلَ على هٰذا القولِ فقيلَ فقدْ رأينَا الحلالَ يصيبُ الصيدَ فِى الحرمِ فيجبُ عليهِ الجزاءُ لحرمةِ الحرمِ ورأينَا المحرِمَ يصيبُ صَيدًا فى الحلِّ فيجبُ عليهِ الجزاءُ لحرمةِ الاحرامِ ورأينَا المحرِمَ اذا اصابَ صيدًا فى الحرمِ وجبَ عليهِ جزاءٌ واحدٌ لِحرمةِ الاحرامِ ودخلَ فيهِ حرمةُ الجزاءِ لِحرمةِ الحرمِ وهوَ فى وقتِ مااصابَ ذالكَ الصيدَ فى حرمتينِ فى حرمةِ احرامٍ وحرمةِ حرمٍ، فلمْ يجبْ عليهِ لكلِّ واحدةٍ من الحرمتينِ مَاكانَ يجبُ عليهِ لهَا لَوافردَها قَالُوا فكذالكَ القارنُ فِيما كانَ يجبُ عليهِ لكلِّ واحدةٍ من عمرتهِ وحجتهِ لو افردَها لايجبُ عليه فى ذالكَ لَمَّا جَمعَهما اِلَّامِثْلَ مَايجبُ عليهِ فى احدٰيهما ويدخلُ ماكانَ يجبُ عليهِ للاخرىٰ لَوكانتْ مفردةً فى ذالكَ ـ

প্রশ্ন হতে পারে, আমরা দেখি, কোন অমুহরিম ব্যক্তি হেরেমে শিকার করলে তার উপর হেরেমের সম্মানার্থে একটি বদল ওয়াজিব হয়। যদি কোন মুহরিম ব্যক্তি হেরেমের বাইরে হিল্লে শিকার করে, তবে তার উপর ইহরামের সম্মানার্থে একটি জাযা আবশ্যক হয়। যার ফলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হেরেম শরীফ এবং ইহরামের সম্মান স্বতন্ত্র ও আলাদা বিষয়। অতএব, যদি কোন মুহরিম ইহরাম অবস্থায় হেরেম শরীফে কোন শিকার করে, তবে তার উপর দু'টি সম্মানের কারণে দু'টি জাযা ওয়াজিব হওয়া উচিত ছিল। একটি ইহরামের সম্মানার্থে আর একটি হেরেমের সম্মানার্থে। কিন্তু সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে শুধু একটি বদল ওয়াজিব হয় এবং এগুলো পরস্পরে প্রবিষ্ট হয়ে যায়। অতএব, যেরূপভাবে দু'টি হুরমত তথা ইহরামের সম্মান ও হেরেমের সম্মানের জাযায় একটি অপরটিতে

প্রবিষ্ট হয়ে যায়, এরূপভাবে দু'টি ইহরামের কাজে পরস্পরে প্রবিষ্ট হয়ে যাবে। কিরান আদায়কারীর উপর শুধু একটি তাওয়াফ ও একটি সাঈ ওয়াজিব হবে।

**উত্তর॥** এর উত্তরে বলা হবে, হেরেমের ভিতরে কোন শিকার মারার কারণে মুহরিমের উপর একটি জাযা ওয়াজিব হওয়ার প্রশ্ন মজবুত নয়। কারণ, এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ র. এর উক্তি হল যে, যুক্তি তো ছিল মুহরিমের উপর দু'টি জাযা ওয়াজিব হওয়া। কিন্তু তাঁরা সেখানে কিয়াস ছেড়ে ইসতিহসান (সূক্ষ্ম কিয়াস) এর উপর আমল করে একটি জাযা ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন।

কিন্তু ইমাম তাহাভী র. বলেন, আমি তাদের মত বলি না, আমার বক্তব্য হল, তারা যেটিকে ইসতিহসান সাব্যস্ত করেছেন, এটি আমার মতে হুবহু কিয়াস। কারণ, এ বিষয়ে সবাই একমত যে, এক ইহরামের মাধ্যমে হজ্জ ও উমরা উভয়টি একত্রিত করা জায়েয আছে। কিন্তু দু'টি হজ্জ কিংবা দু'টি উমরা একত্রিত করা জায়েয নেই। এর ফলে বুঝা যায়, এক ইহরাম দ্বারা দু'টি আলাদা বিষয় একত্রিত করা যায়। কিন্তু সমজাতীয় দু'টি জিনিস একত্রিত করা যায় না, অন্যথায় দু'টি হজ্জ অথবা দু'টি উমরা একত্রিত করা জায়েয হয় না কেন? এদিকে ইহরামের সম্মান ও হেরেমের সম্মান দু'টি আলাদা আলাদা হুরমতের বিষয়। এগুলোর জাযাও আলাদা আলাদা। ইহরামের সম্মানের জাযায় রোযা রাখাই যথেষ্ট। কিন্তু হেরেমের সম্মানের জাযায় রোযা রাখা যথেষ্ট নয়। যেহেতু সম্মানের বিষয়টি আলাদা আলাদা, জাযাও ভিন্ন ভিন্ন, সেহেতু সেখানে উভয় জাযা পরস্পরে প্রবিষ্ট হওয়া সহীহ। একটি আদায় করলে অপরটিও আদায় হয়ে যাবে। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন দুটি জিনিসে পারস্পরিক প্রবিষ্ট হওয়া জায়েয আছে। আর কিরান আদায়কারীর উভয় হুরমত (হজ্জের হুরমত ও উমরার হুরমত) এক প্রকারের। কারণ, হজ্জ ও উমরা যদিও আলাদা আলাদা বিষয় কিন্তু এগুলোর হুরমত এক রকম। কাজেই উভয়টির হুরমত এক রকম হওয়ার ফলে এখানে জাযায় প্রবিষ্ট হওয়া জায়েয হবে না। বরং দু'টি হুরমতের স্বতন্ত্র দু'টি জাযার প্রয়োজন হবে।

তাছাড়া, হজ্জ ও উমরার হুরমতের ন্যায় এগুলোর তওয়াফও একরকম। কারণ, হজ্জের তাওয়াফ ও উমরার তাওয়াফে কোন পার্থক্য নেই। অতএব, প্রত্যেক তাওয়াফ স্বতন্ত্রভাবে আদায় করতে হবে। যেরূপভাবে সমজাতীয়তার কারণে দু'টি হজ্জ অথবা দু'টি উমরার মধ্যে পারস্পরিক অনুপ্রবেশ হয় না, এরূপভাবে এখানেও দু'টি তাওয়াফে অনুপ্রবেশ হবে না। এটাই মূলনীতির দাবি।

فَإِن قَالَ قَائِلٌ فَقَدْ رَأَيْنَاهُ يَحِلُّ مِن حَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ بِحَلْقٍ وَاحِدٍ وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَالِكَ فَكَذَالِكَ ايضا يَطُوفُ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا وَيَسْعٰى لَهُمَا سَعْيًا وَاحِدًا لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَالِكَ۔

قِيلَ لَهُ قَد رَأَيْنَاه يَحِلُّ بِحَلْقٍ وَاحِدٍ مِن احرامَيْنِ مختلفَيْنِ لايجزيه فِيهِمَا الا طَوَافَانِ مختلفَانِ ۔ وذالك ان رجلًا لواحرَم بعمرة فطَافَ لَهَا وسعٰى وسَاقَ الهدىَ ثم حجَّ مِن عامِهِ فصارَ بذالكَ متمتعًا اَنه كانَ حكمُه يومَ النحرِ ان يحلِقَ حلقًا واحدًا فيحلُّ بذالكَ منهُما جميعًا ، فكانَ يحلُّ بحلقٍ واحدٍ مِن احرامينِ مُختلفينِ قد كانَ دخلَ فيهِمَا دخولاً متفرقًا ولم يكنْ مَا وجبَ مِن ذالكَ مِن حكمِ الحلقِ موجبًا اَنَّ حكمَ الطوافِ لهمَا كانَ كذالكَ وانه طوافٌ واحدٌ بل هوَ طوافانِ فكذالكَ ماذكرنَا من حلقِ القارنِ لِعمرتِه وحجتهِ حلقًا واحدًا لايجبُ بهِ ان يكونَ كذالكَ حكمُ طوافِه لهمَا طوافًا واحدًا ، ولما كانَ قد يحلُّ فى الاحرامينِ الذينِ قَد دَخلَ فِيهما دخولاً مُتفرقًا بِحلقٍ واحدٍ كانَ فِى الاحرامينِ اللذينِ قد دَخل فِيهمَا دخولاً واحدًا احرىٰ ان يحلَّ مِنهما كذالكَ، فَهٰذا هوَ النظرُ فى هٰذا البابِ ۔

**আর একটি প্রশ্নোত্তর ঃ** এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, কিরান আদায়কারী ব্যক্তি হজ্জ ও উমরা থেকে শুধু মাথা মুণ্ডানোর মাধ্যমে হালাল হয়ে যায়। অতএব, যেরূপভাবে হজ্জ ও উমরা উভয়টির জন্য একবার মাথা মুণ্ডান যথেষ্ট, এরূপভাবে উভয়টির জন্য এক তাওয়াফ ও একই সাঈ যথেষ্ট হবে।

উত্তরে বলা হবে, একবার মাথা মুণ্ডন যথেষ্ট হওয়ার ফলে এক তাওয়াফ অথবা এক সাঈ যথেষ্ট হওয়ার উপর প্রমাণ পেশ করা যায় না। কারণ, এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি প্রথমত শুধু উমরার ইহরাম বেঁধে তাওয়াফ ও সাঈ করেছেন এবং কুরবানীর পশু নিয়েছেন, অতঃপর সে বছরই হজ্জ করেছেন ও তামাত্তু আদায়কারী হয়েছেন, তার জন্য কুরবানীর দিন একবারই মাথা মুণ্ডানোর

হুকুম। দু'টি এবং আলাদা আলাদা ইহরাম থেকে এ ব্যক্তি একবার মাথা মুণ্ডানোর মাধ্যমে হালাল হয়ে যায়। কিন্তু এ তামাত্তুকারীর জন্য যদিও একবার মাথা মুণ্ডানো যথেষ্ট। কিন্তু তার জন্য এক তাওয়াফ যথেষ্ট নয়, বরং সর্বসম্মতিক্রমে তাকে দু'তাওয়াফ করতে হবে– একটি উমরার জন্য আর একটি হজ্জের জন্য। এতে বুঝা গেল, একবার মাথা মুণ্ডানো যথেষ্ট হওয়ার ফলে এক তাওয়াফ যথেষ্ট হওয়া আবশ্যক হয় না। অতএব, কিরান আদায়কারীর জন্য একবার মাথা মুন্ডন যথেষ্ট হওয়ার ফলে এক তাওয়াফ ও এক সাঈ তার জন্য যথেষ্ট প্রমাণিত হবে না। তাছাড়া, তামাত্তু আদায়কারীর দু'টি আলাদা আলাদা ইহরাম, যেগুলোতে সে আলাদা আলাদাভাবে প্রবেশ করেছিল, এগুলো থেকে তার বের হওয়ার জন্য যেহেতু একবার মাথা মুণ্ডন যথেষ্ট হয়, সেহেতু কিরান আদায়কারীর জন্য উভয় ইহরামের জন্য একবার মাথা মুণ্ডন উত্তমরূপেই যথেষ্ট হবে। যেগুলোতে সে একই সাথে প্রবেশ করেছিল।

যুক্তির আসল দাবি এটাই ছিল যে, কিরান আদায়কারীর উপর হজ্জ ও উমরার জন্য আলাদা আলাদা দু'টি তাওয়াফ জরুরি, এক তাওয়াফ যথেষ্ট নয়।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য উমদাতুল ক্বারী ৯/১৮৪, নুখাবুল আফকার ঃ ৬/১৮৯, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ ১/৩৪৬, নায়লুল আওতার ঃ ৪/৩০৫, মুগনী ঃ ৩/২৪১, নববী ঃ ১/৩৮৭, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/৪৭৫-৫০৪।

## باب حكم الوقوف بالمزدلفة

## অনুচ্ছেদ ঃ মুযদালিফায় অবস্থানের হুকুম

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. হযরত আলকামা, ইবরাহীম নাখঈ, শা'বী, হাসান বসরী, হাম্মাদ এবং আবু উবাইদ কাসিম ইবনে সাল্লাম র. প্রমুখের মতে মুযদালিফায় রাত্রি যাপন হজ্জের একটি রোকন ও ফরয। অতএব, মুযদালিফায় রাত্রি যাপন বর্জন করলে তার হজ্জ ছুটে যাবে। فذهب قوم الى ان الوقوف بالمزدلفة فرض الخ দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম চতুষ্ঠয়, সুফিয়ান সাওরী, কাতাদা, মুজাহিদ, আবু সাওর বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে মুযদালিফায় অবস্থান রোকন ও ফরয নয়; বরং ওয়াজিব অথবা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। এখানে ইমাম তাহাভী র. وخالفهم فى ذالك اخرون الخ দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

অবশ্য কিছুটা পার্থক্য হল– ইমাম মালিক র.-এর মতে যদি মুযদালিফায় অবস্থান ব্যতীত অতিক্রম করে তবে একটি দম ওয়াজিব হবে। আর যদি মুযদালিফায় অবস্থান করে যদিও সামান্য সময়ের জন্যই হোক না কেন, তবে দম ওয়াজিব হবে না।

ইমাম শাফিঈ র.-এর মতে যদি অর্ধ রাত্রির আগে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, তবে একটি দম ওয়াজিব হবে। অর্ধ রাত্রির পর রওয়ানা হলে দম ওয়াজিব হবে না। ইমাম আহমদ র.-এর মাযহাবও এটাই। (মুগনী ঃ ৩/২১৫)

ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। ফজর উদয়ের পর সূর্যাস্তের পূর্বে অবস্থান করা ওয়াজিব। অতএব, যদি মুযদালিফায় রাত্রি যাপন ছুটে যায়, তবে দম ওয়াজিব নয়। কিন্তু যদি মুযদালিফায় অবস্থান ছুটে যায় তবে দম ওয়াজিব হবে। আর যদি ভীষণ ভীড়ের কারণে তা বাদ দেয়া হয় এবং মিনায় রওয়ানা হয়ে যায় তবে দম ওয়াজিব নয়।

৩. ইমাম আতা, ইবনে আবু রাবাহ ও আওযাঈ, র.-এর মতে মুযদালিফায় অবস্থান ফরয ওয়াজিব কিছুই না। বরং সুন্নতে মুয়াক্কাদা। অতএব, তা ছুটে গেলে দম ওয়াজিব হবে না। (নায়লুল আওতার ঃ ৪/২৮৯)

ইমাম তাহাভী র. এর যুক্তি মুযদালিফায় রাত্রি যাপন রোকন না হওয়ার পক্ষে।

وَامَّا وجهُ ذٰلكَ من طريقِ النظرِ فانا قدرأينَا الاصلَ المجتمعَ عليهِ اَن للضعَفةِ ان يتعجلُوا من جمعٍ بليلٍ وكذالكَ امرَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ اغيلمةَ بنَ عبدِ المطلبِ وسنذكرُ ذالكَ فِى موضعِه من كتابِنا هٰذا ان شاءَ اللهُ تعالٰى ورخَّص لِسودةَ رض فِى تركِ الوقوفِ بهَا، حدثنَا محمدُ بنُ خزيمةَ قال ثنَاحجاجٌ قالَ ثنَا حمادٌ قالَ انا عبدُ الرحمٰنِ بنُ القاسمِ عن ابيهِ عن عائشةَ رض قالتْ كانتْ سودةُ رض امرأةً ثبطةً ثقيلةً فاستأذتِ النبىَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ ان تفيضَ من جمعٍ قبلَ ان تَقِفَ فاذِن لَها ولودِدتُ اَنى كنتُ استأذنتُه فاذِنَ لِىْ -

قَال اَبو جعفرٍ فسقطَ عنهم الوقوفُ بِمزدلفةَ للعذرِ ورأينَا عرفةَ لابدَّ من الوقوفِ بِها ولا يسقط ذالكَ لعذرٍ فَمَا سقَط بالعذرِ فَهو الذىْ لَيس مِن صلبِ الحجِّ ومَا لابدَّ منه فلايسقُط بعذرٍ ولَا بِغيرهٖ فهو الذىْ مِن صلبِ الحجِّ ۔ الاَترى ان طوافَ الزيارةِ هو مِن صلبِ الحجِّ وانه لايسقُطُ عن الحائضِ بالعذرِ واَن طوافَ الصدرِ ليسَ مِن صُلبِ الحجِّ وهوَ يسقُطُ عن الحائضِ بالعُذرِ وهُو الحيضُ، فلمَّا كانَ الوقوفُ بمزدلفةَ مِما يسقطُ بالعذرِ كانَ مِن شكلِ مَاليسَ بفرضٍ فَثبتَ بذالكَ ماوصفنَا وهو قولُ ابى حنيفةَ رحـ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمهمُ اللهُ تعالىٰ ۔

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

দুর্বল তথা নারী, শিশু, কমজোর, বৃদ্ধ ও রোগীদের জন্য সুবহে সাদিক হওয়ার পূর্বে মুযদালিফা থেকে মিনায় রওয়ানা হওয়া জায়েয। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু মুত্তালিবের কয়েকজন ছোট শিশু ও হযরত সাওদা রা.কে এর অনুমতি দিয়েছিলেন। এতে বুঝা যায়, মুযদালিফায় অবস্থান ওজরের কারণে বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু আমরা হজ্জের রোকন আরাফায় অবস্থানকে দেখছি, এটি ওজরের কারণে রহিত হয় না। অতএব, যে জিনিস ওজরের কারণে রহিত হয় না, সর্বাবস্থায় আবশ্যক থাকে সেটি রোকন হবে। আর যে জিনিস ওজরের কারণে বাতিল হয়ে যায়, সেটি রোকন হবে না। দেখুন, তাওয়াফে যিয়ারত হজ্জের রোকন। এটি ওজরের কারণে বাতিল হয় না। কিন্তু তাওয়াফে সদর মাসিকের কারণে বাতিল হয়ে যায়। অতএব, যে উকুফে মুযদালিফা ওজরের কারণে রহিত হয়ে যায়, এটি হজ্জের রোকন হতে পারে না।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নায়লুল আওতার ঃ ৪/২৮৯, ই'লাউস সুনান ঃ ১০/১৩৪, ১৩৫, উমদাতুল ক্বারী ঃ ১০/১৬, মাআরিফুস সুনান ঃ ৬/২৩২, মুগনী ঃ ৩/২১৫, ফাতহুল বারী ঃ ৩/৫৩৯, আওজাযুল মাসালিক ঃ ৩/৫৭৭, নুখাবুল আফকার ঃ ৬/২১১, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/৫০৫-৫১২।

## باب الجمع بين الصلوتين بجمع كيف هو؟

## অনুচ্ছেদ ঃ মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার নামায কিভাবে একত্রে পড়বে?

### মাযহাবের বিবরণ ঃ

মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করার বিষয়টি ইজমায়ী। কিন্তু এর ধরন সম্পর্কে মতবিরোধ আছে–

১. ইমাম মালিক, আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ, আসওয়াদ র.-এর মতে দুই আযান ও দুই ইকামত হবে। অর্থাৎ, মাগরিব ও ইশা প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদা আযান ও ইকামত হবে। গ্রন্থকার قال ابو جعفر فذهب قوم الى هذين الحديثين الخ দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, সাঈদ ইবনে জুবাইর, সুফিয়ান সাওরী র. প্রমুখের মতে মাগরিবের জন্য আযান ও ইকামত হবে। ইশার জন্য আযানও নেই, ইকামতও নেই। ইমাম শাফিঈ র. এর পুরনো উক্তিও এটিই। ইমাম আহমদ র. এর একটি রেওয়ায়াত অনুরূপ। মালিকীদের মধ্য থেকে ইবনে মাজিশূন র.-এর মতও এটাই। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. ইমাম আহমদ, শাফিঈ, আবু সাওর, আবদুল মালিক ইবনে মাজিশূন র. প্রমুখের মতে এক আযান ও দুই ইকামত সহ দুই নামায একত্রে আদায়ের নির্দেশ। প্রথমে এক আযান ও ইকামত দ্বারা মাগরিবের নামায অতঃপর এক ইকামতে ঈশার নামায আদায় করবে। দ্বিতীয় وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইমাম তাহাভী র. যুক্তির আলোকে এটাই প্রমাণ করেছেন যে মাগরিবের জন্য আযান ও ইকামত, আর ইশার জন্য শুধু ইকামত। শায়খ ইবনে হুমাম র. ও স্বীয় যুক্তির আলোকে তা প্রমাণ করেছেন, শায়খ ইবনে হুমাম র. এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

فَقَدِ اختلفَ عن النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ فى الصلاتينِ بمزدلفةَ هل صلّاهما مَعًا او عمِل بينهمَا عملاً؟ فروِىَ فى ذالكَ

مَا قدْ ذكرنَا فى حديثِ ابن عمرَ رض واسامةَ واختلفَ عنهُ كيفَ صلاهمَا فقالَ بعضُهم باذانٍ واقامةٍ وقالَ بعضُهم باذانٍ واقامتينِ وقالَ بعضُهم باقامةٍ واحدةٍ ليس معهُما اذانٌ فلمَّا اختلفُوا فِى ذالكَ على ماذكرنَا وكانتِ الصلاتانِ يجمعُ بينهُما بمزدلفةَ وهُمَا المغربُ والعشاءُ كما يجمعُ بين الصلاتينِ بعرفةَ وهما الظهرُ والعصرُ، فكانَ هٰذا بجمعُ فى هذينِ الموطِنينِ جميعًا لايكونُ الالمحرِمٍ فى حرمةِ الحجِّ، فَلا يكونُ لحلالٍ ولا لمعتمرٍ غيرِ حاجٍّ وكانتِ الصلاتانِ بعرفةَ تصلّٰى احدٰيهما فِى اثرِ صاحبتِها ولَا يعملُ بينهمَا عملاً وكانتَا يؤذنُ لهمَا اذانًا واحدًا ويقامُ لهمَا اقامتينِ كانَ النظرُ علٰى ذالكَ ان يكونَ الصلاتانِ بمزدلفةَ كذالكَ وان يكونَ احدهُمَا تصلّٰى فى اثرِ صاحبتِهمَا ولا يعملُ بينهُما عملاً وان يؤذنَ لهمَا اذانًا واحدًا ويقامَ لهمَا اِقامَتينِ كمَا يفعلُ بعرفةَ سواءً، هٰذا هو النظرُ فى هٰذا البابِ وهو خِلافُ قولِ ابىْ حنيفةَ وابِى يوسفَ رحـ۔

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

মুযদালিফায় দুই ওয়াক্ত নামায একত্রে আদায় করা সম্পর্কে ইমাম তাহাভী র. কয়েকটি রেওয়ায়াত পেশ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা এক সাথে আদায় করেছেন, নাকি মাঝখানে কোন কাজও করেছেন? সেখানে শুধু এক আযান ও এক ইকামত অথবা এক আযান দুই ইকামত, আযান ছাড়া শুধু দুই ইকামত? এ প্রসঙ্গে রেওয়ায়াত বিভিন্নমুখী। এর ফলে ইমামগণের মত পার্থক্য হয়ে গেছে। ইমাম তাহাভী র. বলেন, দুই নামায একত্রে আদায়ের হুকুম যেরূপভাবে মুযদালিফায় হয়, এরূপভাবে আরাফায়ও হয়। অবশ্য মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা, আর আরাফাতে জোহর ও আসর একত্রে পড়া হয়। এই একত্রিকরণ উভয় স্থানে শুধু

হজ্জের ইহরাম যারা বেঁধেছেন তাদের জন্য, অমুহরিম ও উমরাকারীদের জন্য নয়। যেহেতু মুযদালিফায় একত্রিকরণ সম্পর্কে মতবিরোধ হয়ে গেছে, সেহেতু এটিকে আরাফার একত্রিকরণের উপর কিয়াস করবে। কাজেই যেরূপভাবে আরাফায় উভয় নামায এক সাথে আদায় করা হয়, মাঝখানে অন্য কোন কাজ করা হয় না, উভয়ের আগে শুধু একটি আযান হয়, অবশ্য প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদা ইকামত বলা হয়, অতএব এরূপভাবে মুযদালিফায়ও উভয় নামায এক সাথে আদায় করা হবে, মাঝখানে অন্য কোন কাজ করা হবে না, উভয়ের জন্য শুধু একটি আযান দেয়া হবে, অবশ্য প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদা ইকামত বলা হবে। যুক্তির দাবি এটিই।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বিদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ ১/২০৪, আওজাযুল মাসালিক ঃ ৩/৬২৮, নববী ঃ ১/৩৯৮, মুগনী ঃ ৩/৪৩৮, উমদাতুল ক্বারী ঃ ১০/১২, নুখাবুল আফকার ঃ ৬/২১৭, ই'লাউস সুনান ঃ ১০/১২১, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/৫১২-৫২৩।

## باب وقت رمى جمرة العقبة للضعفاء

## الذين يرخص لهم فى ترك الوقوف بمزدلفة

## অনুচ্ছেদ ঃ যেসব দুর্বলের জন্য মুযদালিফায় অবস্থান বাদ দেয়ার অবকাশ দেয়া হয়, তাদের জন্য জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপের সময়

### মাযহাবের বিবরণ ঃ

দুর্বল তথা নারী, শিশু, কমজোর বৃদ্ধ এবং রুগ্ন ব্যক্তিরা যাদেরকে সুবহে সাদিকের পূর্বে মুযদালিফা থেকে মিনায় রওয়ানা হওয়ার অবকাশ দেয়া হয়েছে, তাদের জন্য কি জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপেরও অবকাশ দেয়া হবে, যাতে সূর্যোদয়ের পূর্বেই তারা পাথর নিক্ষেপ করতে পারে? এ সম্পর্কে মতানৈক্য আছে।

১. ইমাম শাফিঈ র. এর মতে এসব দুর্বলের জন্য সূর্যাস্তের পূর্বেই পাথর নিক্ষেপ করা জায়েয আছে, এতে কোন অসুবিধা নেই। এটি হল আতা, তাউস, মুজাহিদ, ইবরাহীম নাখঈ, শা'বী ও সাঈদ ইবনে জুবাইর র. এর মত। فذهب قوم الى ان للضعفة ان يرموا جمرة العقبة الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা, মালিক, আহমদ ইবনে হাম্বল, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ র. বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে ফজর উদয়ের পূর্বে মাজুরদের জন্যও

জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করা জায়েয নেই। যদি করে তবে পুনরায় তা করতে হবে। ফজর উদয়ের পর মাকরূহ সহ জায়েয। তবে পুনরায় করা অবশ্যক নয়। সূর্যোদয়ের পরই মাজুরদের জন্য জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করা সুন্নত, এর পূর্বে মাকরূহ। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইমাম তাহাভী র. এর মত সংখ্যাগরিষ্ঠের ন্যায়। তিনি যুক্তির আলোকে এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

حدثنا ابنُ مرزوقٍ قالَ ثناوهبٌ قالَ ثنَا شعبةُ عنْ ابى اسحاقَ ح وحدثَنا يزيدُ بن سِنانٍ قالَ ثنَا ابو عاصمٍ عنْ سفيانَ عن ابىْ اسحاقَ عن عمرِو بنِ ميمونٍ قالَ كنا وُقوفًا مَع عمرَ رض بجمعٍ فقالَ اِن اهلَ الجاهليةِ كانُوا لايُفيضونَ حتى تَطلُعَ الشمسُ ويقولونَ اَشرِق ثبيرُ وانّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ خالَفَهم فافاضَ قَبل طلوعِ الشمسِ -

حدثَنا ربيعٌ المؤذنُ قالَ ثنا اسدٌ وحدثَنا فهدٌ قالَ ثنَا ابو غسانٌ قالاَ ثنَا اسرائيلُ عن ابى اسحاقَ عن عمرِو بنِ ميمونٍ قالاَ كُنا وقوفًا معَ عمرَ رض بجمعٍ فقالَ اِن اهلَ الْجاهِليَّةِ كانُوا لايُفِيضونَ حتّٰى تطلُعَ الشمسُ ويقولونَ اَشرِقْ ثَبيرُ كَيمَا نُغيرُ وانّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ خالفَهم فافاضَ قبلَ طلوعِ الشمسِ بقدرِ صلوةِ المسافرِ صلوة الصبحِ -

فلمَّا كانَ غيرُ الضعفاءِ انمَا يفيضونَ من مزدلفةٌ قبل طلوعِ الشمسِ بهٰذه المدةِ اليسيرةِ امكنَ الضعفاءُ الذينَ قد تقدمُوهم الى منًى ان يرمُوا الجمرةَ بعد طلوعِ الشمسِ قبلَ مجئ الاخرينَ

اليهم، فلم يكنْ للرخصةِ للضعفاءِ ان يرمُوا قبلَ طلوعِ الشمسِ معنىً، لِانِ الرخصةَ انما تكونُ فى مثلِ هذا للضرورةِ وهذا لاضرورةَ فِيه، فثبتَ بذالكَ ماذكرنَا من حديثِ ابن عباسٍ رض الذى روينَاهُ فِى تاخيرِ رميِ جمرةِ العقبةِ الى طلوعِ الشمسِ وهو قولُ ابِى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمهمُ اللهُ تعالىٰ ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

এখানে হযরত উমর রা.-এর দুটি রেওয়ায়াত পেশ করা হয়েছে। এ দুটোর সারনির্যাসও কিয়াসই। কারণ, তিনি বলেন, বর্বরতার যুগে লোকজন সূর্যোদয়ের পূর্বে মুযদালিফা থেকে রওয়ানা হত না। যেদিক থেকে সূর্য উদিত হত সেদিকে একটি উঁচু পাহাড় রয়েছে। এর নাম হল জাবালে ছাবীর। বর্বরতার যুগে লোকজন এ পাহাড়ের দিকে ফিরে বলত– اَشرِقْ ثَبِيرُ كيمَا نغيرُ অর্থাৎ হে ছাবীর পাহাড়! সূর্যের কিরণ দেখাও, যাতে আমরা এখান থেকে যেতে পারি। نغير এর অর্থ হল আমরা যেতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরোধিতা করেছেন এবং সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পূর্বেই মুযদালিফা থেকে রওয়ানা হয়ে যান।

স্পষ্ট বিষয়, যখন ওজরহীন লোকেরা সূর্যোদয়ের নিকটবর্তী সময়ে মুযদালিফা থেকে রওয়ানা হবে তখন তাদের জামরায়ে আকাবা পর্যন্ত পৌঁছার অনেক পূর্বেই মাজুররা কংকর নিক্ষেপ করে অবসর হয়ে যেতে পারবে। অতএব বিনা প্রয়োজনে সূর্যোদয়ের পূর্বে কংকর নিক্ষেপের অনুমতি থাকবে না। যদি কেউ করে তবে তা মাকরূহ শূন্য হবে না।

দুর্বলদেরকে রাত্রেই মুযদালিফা থেকে রওয়ানা হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে, যাতে এরা সহজে মিনায় পৌঁছে আরামে আরামে পাথর নিক্ষেপ করতে পারে। এদিকে যারা দুর্বল নয়, তাদের জন্য অন্ধকার থাকতেই ফজর পড়ে সূর্যোদয়ের সামান্য আগে মিনা অভিমুখে রওয়ানা হবার নির্দেশ। অতএব, তারা মিনায় পৌঁছার পূর্বেই সূর্যোদয় হয়ে যাবে। অতএব, যেসব দুর্বল আগে মিনায় পৌঁছে যাবে, তাদের জন্য সূর্যোদয়ের পর পাথর নিক্ষেপে কোন জটিলতা নেই। কারণ, অন্যরা তো তখন পথেই রয়ে গেছে। অতএব, সূর্যোদয়ের পূর্বে না তাদের

পাথর নিক্ষেপের প্রয়োজন আছে, আর না সূর্যোদয়ের পর পাথর নিক্ষেপে তাদের কোন জটিলতা আছে, না কোন ওজর। কাজেই কোন ওজর ছাড়া সূর্যোদয়ের পূর্বে তাদেরকে পাথর নিক্ষেপের অবকাশ দানের কোন কারণ নেই। অবকাশ তো সেখানেই হয়, যেখানে ওজর থাকে, এখানে কোন ওজর নেই।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ফাতহুল বারী ঃ ৩/৪১৫, উমদাতুল ক্বারী ঃ ১০/১৮, মুগনী ঃ ৩/৪৪৯, নায়লুল আওতার ঃ ৪/২৯১, মাআরিফুস সুনান ঃ ৬/২৩৩, ই'লাউস সুনান ঃ ১০/১৪১, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ ১/২০৬, নুখাবুল আফকার ঃ ৬/২২৫, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/৫২৩-৫২৯।

## باب رمى جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر

## অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যোদয়ের পূর্বে কুরবানীর রাতে জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপ

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

আগের অনুচ্ছেদ ছিল দুর্বলদের সম্পর্কে যে, তারা সূর্যোদয়ের পূর্বে পাথর নিক্ষেপ করতে পারে কি না। এ অনুচ্ছেদে দুর্বল-সবল সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এখানে বর্ণনা দিতে চাচ্ছেন যে, সূর্যোদয়ের পূর্বে রাত্রেই জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করা জায়েয আছে কি না, এ বিষয়ে মতবিরোধ আছে।

১. ইমাম শাফিঈ, আমির শাবী, মুজাহিদ, তাঊস, আতা র. প্রমুখের মতে মাজুরদের জন্য ফজর উদয়ের পূর্বে রাত্রেই জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করা জায়েয আছে। فذهب قوم الى ان رمى جمرة العقبة فبل طلوع الفجر الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা, মালিক, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী ও আবু সাওর র. বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে সুবহে সাদিক উদয়ের পূর্বে অর্থাৎ, রাত্রে জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করা মাজুরদের জন্যও জায়েয নেই। যদি কেউ রাত্রেই পাথর নিক্ষেপ করে, তবে তা বেকার। যথার্থ সময়ে পুনরায় তা করা জরুরি। যুক্তির আলোকে ইমাম তাহাভী র. তা প্রমাণ করেছেন। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وامَّا مِن طريقِ النظرِ فانَّا قد رأينَاهم اجمعُوا اَنَ مَن رمٰى جمرةَ العقبةِ لليومِ الثانِىْ بعدَ يومِ النحرِ فِى الليلِ قبلَ طلوعِ

الفجرِ اَن ذالكَ لايُجزِيه حتى يكونَ رميُه لهَا فِى يومِها فالنظرُ علىٰ ذالكَ ان يكونَ كذالكَ هِى فى يومِ النحرِ لايجوزُ ان ترمى اِلاَّ فِى يومِها وانِ كانَ بعضُ يومِها فِى ذالكَ افضلَ من بعضٍ كَما ان بعضَ اليومِ الثانِى الرمىُ فيه افضلُ منَ الرمىِ فى بعضِه وهٰذا قولُ ابىْ حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمهمُ اللهُ تعالىٰ ۔

যৌক্তিক প্রমাণ ঃ

কুরবানীর দিনের পরবর্তী দিন অর্থাৎ, ১১ তারিখের পাথর নিক্ষেপ সম্পর্কে সবার ঐকমত্য রয়েছে যে, রাত্রে পাথর নিক্ষেপ করা সহীহ হবে না। যদি কেউ ১১ তারিখে এই পাথর নিক্ষেপ দিনের পরিবর্তে এর রাত্রেই করে, তবে তা আদায় হবে না। দিনে পুনরায় তা করা জরুরি। অতএব, যুক্তির দাবি হল, ১১ তারিখের মত ১০ তারিখের পাথর নিক্ষেপও রাত্রে আদায় না হওয়া, বরং ফজর উদয়ের পর তা আদায় করা। অবশ্য দিনের বেলা সম্পর্কে এতটুকু বিবরণ রয়েছে, যেরূপভাবে ১১ তারিখের দিনের সময়ের ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। কিন্তু এতটুকু জরুরি যে, রাত্রিবেলায় তা আদায় হবে না, দিনের বেলায়ই তা করতে হবে। ফজরোদয়ের পর দিনের কোন অংশে পাথর নিক্ষেপ অন্য অংশের তুলনায় উত্তম হতে পারে।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ফাতহুল বারী ঃ ৩/৪১৫, মাআরিফুস সুনান ঃ ৬/২৩৩, নুখাবুল আফকার ঃ ৭/২, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ ৬/২০৬, ই'লাউস সুনান ঃ ১০/১৪১, মুগনী ঃ ৩/৪৪৯, নায়লুল আওতার ঃ ৪/২৯১, উমদাতুল ক্বারী ঃ ১০/১৮, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/৫২৯-৫৩৫।

## باب الرجل يدع رمى جمرة العقبة يوم النحرثم يرميها بعد ذالك

## অনুচ্ছেদ ঃ যে কুরবানীর দিন জামরায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপ ছেড়ে পরবর্তীতে তা করে

মাযহাবের বিবরণ ঃ

১. ইমাম মালিক, সুফিয়ান সাওরী র. প্রমুখের মতে কুরবানীর দিন দিবসে জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপ না করে সূর্যাস্ত হয়ে যায়। এরপর পাথর নিক্ষেপ করে তবে বিলম্বের কারণে মাকরূহ সহকারে আদায় হবে তবে একটি দমও ওয়াজিব হবে।

২. ইমাম আবু হানীফা র. এর মতে সূর্যাস্তের পর মাকরূহ তবে যদি দ্বিতীয় দিন সুবহে সাদেকের পূর্বে পাথর নিক্ষেপ করে ফেলে তবে দম ওয়াজিব নয়। আর যদি সুবহে সাদেক হওয়ার পর পাথর নিক্ষেপ করে তবে বিলম্বের কারণে মাকরূহ সহকারে আদায় হবে তবে দম ওয়াজিব হবে। এ ধারা তৃতীয় দিনের সূর্যাস্ত পর্যন্ত থাকবে। এরপর পাথর নিক্ষেপ জায়েয হবে না। বরং শুধু فذهب ابو حنيفة الخ দ্বারা তাঁরাই উদ্দেশ্য।

৩. ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ শাফিঈ, আহমদ, ইসহাক ইবনে ইবরাহীম, তাহাভী র. প্রমুখের মতে দ্বিতীয় দিনের সুবহে সাদিকের পর পাথর নিক্ষেপ করা মাকরূহ। তবে কোন দম অথবা জরিমানা ওয়াজিব নয়। আর দম ওয়াজিব না হওয়ার বিষয়টি তৃতীয় দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত থাকবে। এরপর পাথর নিক্ষেপ জায়েয হবে না। কংকর নিক্ষেপ এবং ওয়াজিব ছুটার কারণে একটি দম ওয়াজিব হবে। وخالفه فى ذالك ابو يوسف ومحمد الخ দ্বারা তাঁদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

ثم النظرُ فِى ذالكَ يشهدُ لهٰذا القولِ ايضًا وذالكَ أنا رأينَا اشياءَ تُفعلُ فى الحجِّ الدهرُ كلُّه وقتٌ لهَا مِنها السعىُ بينَ الصفَا والمروة وطوافُ الصدْرِ ومِنها اشياءُ تفعلُ فى وقتٍ خاصٍّ هوَ وقتُها خاصةً منهَا رمىُ الجمارِ فكانَّما الدهرُ وقتٌ له مِن هٰذه الاشياءِ متى فعلَ فلاشيئَ علٰى فاعلِه معَ فعلِه اِياهُ مِن دمٍ وَلا غيرِه ومَا كانَ منهَا له وقتٌ خاصٌّ من الدهرِ اِذا لم يَفعلْ فى وقتِه وجبَ علٰى تارِكه الدمُ فكانَ ماكانَ منها يفعلُ لبقاءِ وقتِه فلاشيَئ علٰى فاعلِه غيرَ فعلِه ايَّاه ومَا كانَ منهَا لايفعلُ لعدمِ وقتِه وجبَ مكانَه الدمُ وكانتْ جمرةُ العقبةِ اِذا رميتْ من غدِ يومِ النحرِ قضاءً عنْ رميِ يومِ النحرِ فقد رميتْ فى يومٍ هو مِن وقتِها ولَولاَ ذالكَ لما اُمر برميِها كمَا لايؤمرُ تاركُها الى بعدِ انقضاءِ ايامِ

التشريق برميها بعد ذالك.فلمّا كانَ اليومُ الثانىْ من ايامِ النحرِ هو وقتٌ لهَا وقد ذكرنَا مِما قَد اجمعُوا عليهِ انّ مافعلَ فى وقتِه من امورِالحجّ فلاَ شئَ علىٰ فاعلِه كانَ كذٰلكَ هٰذا الرامىْ لَها لَمّا رمَاها فِى وقتِها فلاَشئَ عليهِ.

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

হজ্জের কাজগুলো দুই প্রকার–

১. যে সব কাজের কোন নির্দিষ্ট ওয়াক্ত নেই, বরং সর্বদাই এগুলোর ওয়াক্ত। যেমন– তাওয়াফে সদর ও সাফা-মারওয়ার মাঝে দৌড়ান।

২. যে সব কাজের জন্য কোন ওয়াক্ত নির্ধারিত আছে, যেমন– কংকর নিক্ষেপ করা।

যে সব কাজের জন্য কোন সময় নির্ধারিত নেই, সেগুলো যখনই আদায় করা হবে, তখনই যথেষ্ট হবে। কোন দম ইত্যাদি দেয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ, এগুলো যথার্থ সময়েই আদায় করা হয়েছে। সময়মত আদায়ের ফলে জরিমানা আসার প্রশ্নই উঠে না। বাকি রইল যে সব কাজের জন্য সময় নির্ধারিত আছে, এগুলো যদি নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা না হয়, তবে সময় ছুটে যাওয়ার কারণে যথার্থ সময়ে আদায়ের আর অবকাশ নেই বলে এর পরিবর্তে দম ও জরিমানা দিতে হবে।

এতে বুঝা গেল, হজ্জের কোন কাজ যখন সময়মত আদায় হয়, তাতে দম ওয়াজিব হয় না। এ কাজটুকু যে কোন সময় আদায় করলেই যথেষ্ট হবে। আর যে সব কাজ নির্ধারিত সময়ে আদায় করা হয় নি, সময় শেষ হয়ে গেছে বলে এখন আর সে সময়ে আদায় করা যায় না, সেগুলোতে দম দিতে হবে। পক্ষান্তরে ১০ তারিখের জামরায়ে আকাবার রমি যেহেতু ১১ তারিখে আদায় করা হয়েছে, তাই এটা সময় মতই আদায় করা হয়েছে। কারণ, আইয়্যামে তাশরীক সবটুকুই পাথর নিক্ষেপের সময়। কারণ, যদি আইয়্যামে তাশরীক পাথর নিক্ষেপের সময় না হত, তবে এ সময়ে পাথর নিক্ষেপের হুকুম দেয়া হত না। এতে প্রমাণিত হয় গোটা আইয়্যামে তাশরীকই রমির সময়। অতএব, ১১, ১২, ১৩ যে কোন তারিখেই জামরায়ে আকাবার রমি আদায় করা হোক না কেন, সময় মতই তা আদায় করা হবে। আমরা আগেই বলেছি, সময়মত কাজ আদায় হলে, দম ওয়াজিব হবে না। অতএব আইয়্যামে তাশরীকে জামরায়ে আকাবার রমি তথা

কংকর নিক্ষেপ হলে কোন দম ওয়াজিব হবে না। যুক্তির আলোকে এটাই প্রমাণিত হয়।

فَانْ قَالَ قَائِلٌ انما اوجبنَا عليهِ الدمَ بتركهِ رميَها يومَ النحرِ وفِى الليلةِ التى بعدَه للاساءةِ التىْ كانتْ مِنه فِى ذالكَ

قِيلَ لهُ فقَد رأينَا تاركَ طوافِ الصدرِ حتى يرجِعَ الى اهلِه وتاركَ السعيِ بينَ الصفَا والمروةِ حتّٰى يرجِعَ الى اهلِه مُسيئينِ وانتَ تقولُ انهمَا اِذا رجعَا ففعلاَ ماكانَا تركَا مِن ذالكَ اَنَّ اساءتَهما لاَ توجبُ عليهِما دَمًا لِانهمَا قد فعلاَ مافعلاَ من ذٰلكَ فى وقتِه وكذٰلكَ الرامىْ اليومَ الثانىَ مِن ايامِ منىٰ جمرةَ العقبةِ لِمَا كانَ وجبَ عليهِ فى يومِ النحرِ راميًا لهَا فى وقتِها فَلاشىْءَ عليهِ فى ذالكَ غيرُ رميِها، فهٰذا هو النظرُ فى هٰذا البابِ وهوَ قولُ ابىْ يوسفَ ومحمدٍ رحمهم اللهُ تعالٰى۔

**একটি প্রশ্ন ও এর উত্তর :** এবার প্রশ্ন হতে পারে, যেহেতু জামরায়ে আকাবার রমি কুরবানীর দিন অথবা তার পরদিন আদায় না করা এবং বিলম্ব করা একটি মন্দ কাজ, সেহেতু আমরা বলব, দম ওয়াজিব সময় ছুটে যাওয়ার কারণে নয়।

**উত্তর॥** শুধু মন্দ কাজের ফলে দম ওয়াজিব হয় না। যেমন– কেউ যদি তাওয়াফে সদর অথবা সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ বাদ দেয়, এরপর সে বাড়িতে চলে যায়, তবে এটা মন্দ কাজ অবশ্যই। কিন্তু যদি এ ব্যক্তি পুনরায় ফিরে এসে এই তাওয়াফ অথবা সাঈ করে তবে যেহেতু সে এগুলো স্বীয় সময়মতই আদায় করেছে, সেহেতু আপনিও তার উপর দম ওয়াজিব বলেন না। যেহেতু সময় মত আদায় হয়ে যাওয়ার কারণে এই সাঈ অথবা তাওয়াফকারীর উপর দম ওয়াজিব হয় না, সেহেতু কুরবানীর দিনের পর আইয়্যামে তাশরীকের মধ্যে জামরায়ে আকাবার পাথর নিক্ষেপকারীর উপরও একই কারণে দম ওয়াজিব না হওয়া উচিত।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য মাআরিফুস সুনান : ৬/২৩৪, নুখাবুল আফকার : ৭/১৭, হাশিয়ায়ে বযলুল মাজহুদ : ৯/২৯০, উমদাতুল ক্বারী : ৭/১৭, ১০/৮৬, বিদায়াতুল মুজতাহিদ : ১/৬০৭, আওজাযুল মাসালিক : ৩/৫৮৭, বাদায়ি' : ২/১৩৭, ঈযাহুত তাহাভী : ৩/৫৩৫-৫৪০।

## باب اللباس والطيب متى يحلان للمحرم

## অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিমের জন্য পোশাক ও সুগন্ধি কখন হালাল হয়?

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ, আহমদ, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, আবু সাওর, আলকামা, সালিম, নাখঈ, উমর ইবনে আবদুল আযীয র. এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে মাথা মুণ্ডনোর পর তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে শুধু মহিলা ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত ইহরাম প্রতিবন্ধক জিনিস হালাল হয়ে যায়।

২. ইমাম মালিক ও হাসান বসরী র. এর মাযহাব হল, তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে যেরূপভাবে সহবাস জায়েয নেই, এরূপভাবে সুগন্ধি ব্যবহার করাও জায়েয নেই। এটি ইমাম আহমদ র. এর একটি রেওয়ায়াত। গ্রন্থকার فذهب الى هذا قوم الخ দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

৩. হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর এবং আরেকটি দলের মতে তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে সহবাসের ন্যায় না সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়েয, না সেলাইকৃত পোশাক পরিধান করা জায়েয। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইমাম তাহাভী র. এর যুক্তি দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠের মত প্রাধান্য পেয়েছে।

ثُمَّ رجعنَا الى النظرِ بينَ هٰذينِ الفريقَينِ جميعًا وبينَ اهلِ المقالةِ الاولىٰ الذينَ ذهبُوا الىٰ حديثِ عُكاشةَ فرأينَا الرجلَ قبلَ ان يحرِمَ يحلُّ له النساءُ والطيبُ واللباسُ والصيدُ والحلقُ وسائرُ الاشياءِ التىْ تحرمُ عليهِ بالاحرامِ، فاِذا احرَم حرمَ عليهِ ذالكَ كلُّه بسببَبٍ واحدٍ وهو الاحرامُ، فاحتملَ ان يكونَ كمَا حرمتْ عليهِ بسببٍ واحدٍ ان يحلَّ منهَا ايضًا بسببٍ واحدٍ واحتملَ ان يحلَّ مِنها باشياءَ مختلفةٍ احلالاً بعدَ اِحلالٍ، فاعتبرنَا ذالكَ فرأينَاهم قَد اَجمعُوا انهُ اِذا رمىٰ فقد حلَّ له الحلقُ، هٰذا مِمَّا لَا اختلافَ فِيهِ

بينَ المسلمينَ ۔ واَجمعُوا اَن الجماعَ حرامٌ عليهِ علىٰ حالِه الاولىٰ فثبتَ اَنه حلّ مِما قدكانَ حرمَ عليهِ بسببٍ واحدٍ باسبابٍ مختلفةٍ فبطلَ بهذه العلةِ التىْ ذكرنَا ۔

فلمَّا ثبتَ ان الحلقَ يحلُّ لهٗ اِذا رمىٰ وانه مباحٌ له بعدَ حلقِ رأسِه ان يحلقَ مَا شاءَ مِن شعرِ بدنِه ويقصَّ اظفارَه اردنَا ان ننظرَ هلْ حكمُ اللباسِ حكمُ ذالكَ اوحكمُه حكمُ الجماعِ فلاَ يحلُّ حتّٰى يحلَّ الجماعُ، فاعتبرنَا ذالكَ، فرأينَا المحرمَ بالحجّ اِذا جَامعَ قَبلَ ان يقِفَ بعرفةَ فسدَ حجُّه ورأينَاه اِذا حلَقَ شعرَه او قصَّ اظفَارَه وجبتْ عليهِ فِى ذالكَ فديةٌ ولم يفسُدْ بذالكَ حجُّهُ ورأيناهُ لولبِسَ ثيابًا قبلَ وقوفِه بعرفةَ لم يفسدْ عليهِ بذالكَ احرامُه ووجبتْ عليهِ فِى ذالكَ فديةٌ فكانَ حكمُ اللباسِ قبلَ عرفةَ مثلَ حكمِ قصِّ الشعرِ والاظفارِ لاَمثلَ حكمِ الجماعِ، فالنظرُ على ذالكَ ان يكونَ حكمهٗ ايضًا بعدَ الرميِ والحلقِ كحكمِهما لاكحكمِ الجماعِ فهٰذَا هوَ النظرُ فىْ ذالكَ ۔

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

ইহরামের পূর্বে পুরুষের জন্য মহিলা, সুগন্ধি, সেলাইকৃত পোশাক ব্যবহার, শিকার, মাথা মুণ্ডন ইত্যাদি জায়েয ছিল। কিন্তু ইহরামের কারণে এসব জিনিস তার উপর হারাম হয়ে গেছে। এগুলোর হারাম হওয়ার কারণ শুধু ইহরাম। এবার এগুলো হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. এগুলো যেরূপ একটি কারণ তথা ইহরামের ফলে হারাম হয়েছে, এরূপভাবে এগুলো হালাল হওয়ার কারণও একটাই হবে, একাধিক নয়।

২. দ্বিতীয় সম্ভাবনা হল– এসব জিনিস যদিও একটি কারণ তথা ইহরামের ফলে হারাম হয়েছে, কিন্তু এগুলো হালাল হওয়ার কারণ বিভিন্ন রকমের। কারণ,

হারাম হওয়ার কারণ এক হওয়ার ফলে হালাল হওয়ার কারণও এক হওয়া জরুরি নয়।

তাছাড়া কয়েকটি জিনিস এক সাথে হারাম হলে এগুলো এক সাথে হালাল হওয়াও জরুরি নয়।

আমরা দেখছি কংকর নিক্ষেপের পর সর্বসম্মতিক্রমে মাথামুণ্ডন হালাল হয়ে যায়। কিন্তু সহবাস হালাল হয় না, বরং সহবাস হালাল হওয়ার কারণ আলাদা। অর্থাৎ, তাওয়াফে যিয়ারত করা। এতে প্রমাণিত হয়, এসব জিনিস যদিও একই কারণ, তথা ইহরামের ফলে হারাম হয়েছিল, কিন্তু এগুলো হালাল হওয়ার কারণ সর্বসম্মতিক্রমে বিভিন্ন রকম। এদিকে কংকর নিক্ষেপের পর যখন তার জন্য মাথামুণ্ডন হালাল হয়ে যায়, এ কারণে মাথা মুণ্ডনের পর তার জন্য শরীরের যে কোন অংশের পশম মুণ্ডানো, নখকাটা হালাল হয়ে যায়, অতএব আমাদের পোশাক সম্পর্কে ভেবে দেখতে হয়, এর সাদৃশ্য মাথা মুণ্ডানোর সাথে, না সহবাসের সাথে। যদি মাথা মুণ্ডানোর সাথে হয়, তবে এটাও হালাল হয়ে যাবে, আর যদি সহবাসের সাথে হয়, তবে এটা সহবাসের ন্যায় তাওয়াফে যিয়ারত পর্যন্ত হারাম থাকবে।

আমরা লক্ষ্য করছি, হজ্জের ইহরামকারী ব্যক্তি যদি আরাফায় অবস্থানের পূর্বে সহবাস করে, তবে তার হজ্জ নষ্ট হয়ে যায়। যদি মাথা মুণ্ডায় বা নখ কাটে, তবে তার হজ্জ নষ্ট হয় না। শুধু ফিদিয়া ওয়াজিব হয়। এদিকে আরাফায় অবস্থানের পূর্বে সেলাইকৃত পোশাক পরলে তার উপর ফিদিয়া ওয়াজিব হয়, তার হজ্জ নষ্ট হয় না। এতে প্রমাণিত হল, আরাফায় অবস্থানের পূর্বে পোশাকের হুকুম, মাথা মুণ্ডন ও নখ কাটার মত। অতএব যুক্তির দাবি হল, কংকর নিক্ষেপ ও মাথা মুণ্ডনের পরেও এই পোশাকের হুকুম এগুলোর মত হওয়া, সহবাসের মত নয়।

فَإِن قَالَ قَائِلٌ فَقَدْ رَأَيْنَا الْقُبْلَةَ حَرَامًا عَلَى الْمُحْرِمِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِقَ وَهِيَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فِي حُكْمِ اللِّبَاسِ لَا فِي حُكْمِ الْجِمَاعِ، فَلِمَ كَانَ اللِّبَاسُ بَعْدَ الْحَلْقِ أَيْضًا كَهِيَ ؟

قِيلَ لَهُ إِنَّ اللِّبَاسَ بِالْحَلْقِ أَشْبَهُ مِنْهُ بِالْقُبْلَةِ، لِأَنَّ الْقُبْلَةَ هِيَ بَعْضُ أَسْبَابِ الْجِمَاعِ وَحُكْمُهَا حُكْمُهُ تَحِلُّ حَيْثُ يَحِلُّ وَتَحْرُمُ

حيثُ يحرمُ فى النظرِ فِى الاشياءِ كلِّها والحلقُ واللباسُ ليسَامِن اسبابِ الجماعِ اِنما هُما مِن اسبابِ اصلاحِ البدنِ فحكمُ كلِّ واحدٍ منهُمَا بحكمِ صاحبِه اشبهُ مِن حكمِه بالقُبلةِ. فقدْ ثبتَ بمَاذكرنَا انَه لابأسَ باللباسِ بعدَ الرميِ والحلقِ ـ

**একটি প্রশ্ন ঃ**

প্রশ্ন হতে পারে, কংকর নিক্ষেপ ও মাথা মুণ্ডনের পর মুহরিমের জন্য স্বীয় স্ত্রীকে চুম্বন করা হারাম থেকে যায়। অথচ আরাফায় অবস্থানের পূর্বে এই চুম্বন পোশাক, মাথা মুণ্ডন ও নখ কাটার ন্যায় ছিল, সহবাসের ন্যায় নয়। এজন্য আরাফায় অবস্থানের পুর্বে চুম্বন করলে ফিদিয়া ওয়াজিব হয়, হজ্জ নষ্ট হয় না। কাজেই আরাফায় অবস্থানের পূর্বে কোন জিনিসের হুকুম, মাথা মুণ্ডন ও নখ কর্তনের মত হলে কংকর নিক্ষেপের পরও এর হুকুম এগুলোর মত হওয়া জরুরি নয়। অতএব কংকর নিক্ষেপ ও হলকের পর পোশাকের হুকুম চুম্বনের মত থাকলে অসুবিধা কি?

**উত্তর॥** চুম্বন সহবাসের একটি কারণ। অতএব উভয়ের হুকুম এক থাকবে, যতক্ষণ সহবাস হালাল না থাকবে, আর পোশাক সহবাসের কারণের অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই এটাকে চুম্বনের উপর কিয়াস করা বিশুদ্ধ হবে না। বরং পোশাক মাথা মুণ্ডনের ন্যায় দৈহিক সৌন্দর্যও সংস্কারের একটি কারণ। কাজেই পোশাক ও মাথা মুণ্ডন উভয়ের হুকুম এক রকম হবে। হলকের সাথে সাথে পোশাকও হালাল হয়ে যাবে। এবার থাকল সুগন্ধির কথা, পক্ষান্তরে সুগন্ধির সাদৃশ্য পোশাকের সাথে, সহবাস বা চুম্বনের সাথে নয়। কাজেই কংকর নিক্ষেপ ও মাথা মুণ্ডনের পর পোশাকের ন্যায় সুগন্ধি ব্যবহারও হালাল হবে।

**একটি সন্দেহের অপনোদন ঃ**

সন্দেহটি হল, পোশাক এবং সুগন্ধির হুকুম যেহেতু মাথা মুণ্ডনের ন্যায়, সেহেতু পাথর নিক্ষেপের পরও মাথা মুন্ডন, পোশাক এবং সুগন্ধি তিনটি এক সাথে হালাল হওয়া উচিত। অথচ এই তিনটি এক সাথে হালাল হয় না। কংকর নিক্ষেপের পর মাথা মুন্ডনের পূর্ব পর্যন্ত পোশাক ও খুশবু হারামই থাকে। মাথা মুণ্ডনের পর এ দুটো হালাল হয়।

✪ এর উত্তর হল, যদিও এ তিনটি জিনিস এক সাথে হালাল হওয়া এবং মাথা মুণ্ডনের উপর অবশিষ্ট নিষিদ্ধ বিষয়গুলো স্থগিত না হওয়াই যুক্তির দাবি, কিন্তু শরীয়ত নিজের পক্ষ থেকে সেখানে তরতীব বা ক্রমবিন্যাস স্থির করেছে। পাথর নিক্ষেপের পর প্রথমত মাথা মুণ্ডন হালাল হবে, এরপর অন্যান্য নিষিদ্ধ বস্তু। এ কারণে উমরার ইহরামেও এই তরতীবই অর্থাৎ, তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈর পর প্রথমে মাথা মুণ্ডন হালাল হয়, এরপর অন্যান্য নিষিদ্ধ বস্তু। হজ্জ ও উমরার ইহরাম যেহেতু অন্যান্য আহকামে এক রকম, সেহেতু উপরোক্ত এই হুকুমও বরাবর থাকবে। তথা প্রথমত হলক হালাল হবে এবং অবশিষ্ট নিষিদ্ধ বস্তুগুলোর বৈধতা এর উপর মওকুফ থাকবে। মোটকথা, পাথর নিক্ষেপের পর মাথা মুন্ডনের সাথে সাথে সহবাস ও চুম্বন ছাড়া ইহরামের অন্যান্য নিষিদ্ধ বস্তুগুলো হালাল হবে, যুক্তির দাবি এটাই।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য উমদাতুল ক্বারী ঃ ১০/৯৩, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ ১/২১৮, নুখাবুল আফকার ঃ ৭/৪৯, ই'লাউস সুনান ঃ ১০/১৬১, আওজাযুল মাসালিক ঃ ৩/৬৬৯, মাআরিফুস সুনান ঃ ৬/২৯১, মুগনী ঃ ৩/৪৬২, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/৫৪৯-৫৫৭।

## باب من قدم من حجه نسكا قبل نسك

## অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার হজ্জের কোন বিধান অন্যটির আগে পালন করেছে

### কুরবানীর দিনের চার কাজে তরতীব ঃ

যিলহজ্জের ১০ তারিখের কাজ মোট চারটি–

১. জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপ, ২. অতঃপর কুরবানী, ৩. অতঃপর মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছাটা, ৪. অতঃপর তাওয়াফে যিয়ারত।

সর্বসম্মতিক্রমে এই ক্রমবিন্যাস কাম্য। কিন্তু এর হুকুমে মতবিরোধ আছে।

১. ইমাম শাফিঈ, আহমদ, আবু ইউসুফ, ইসহাক ইবনে ইবরাহীম, মুজাহিদ, দাউদ জাহিরী ও মুহাম্মদ র. এর মতে উপরোক্ত তরতীব সুন্নত। অতএব, এর খেলাফ করলে কোন দম অথবা জরিমানা ওয়াজিব হবে না।

২. ইমাম আবু হানীফা, যুফার, জাবির ইবনে যায়েদ, ইবরাহীম নাখঈ র. এর মতে তাওয়াফে যিয়ারত ছাড়া বাকি তিনটি কাজে তরতীব ওয়াজিব। খেলাফ করলে দম ওয়াজিব হবে।

এ মাসআলায় ইমাম মালিক র. থেকে তিনটি মত পাওয়া যায়।

(১) দম ওয়াজিব, (২) ফিদিয়া ওয়াজিব, (৩) ওয়াজিব নয়।

এ অনুচ্ছেদে ইমাম তাহাভী র. প্রথমত এই তরতীব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, এরপর তিনি উল্লেখ করেছেন যে, কিরানকারী যদি এই তারতীবের খেলাফ করে, কুরবানীর আগে মাথা মুণ্ডায়, তবে তার উপর কয়টি দম ওয়াজিব হবে? এ ব্যাপারে স্বয়ং হানাফীদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে।

**উপরোক্ত তারতীবের খেলাফ করলে কিরানকারীর উপর দম ওয়াজিব কিনা?**

১. ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ র. ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে যেহেতু এই তরতীবই ওয়াজিব নয়, সেহেতু ইফরাদকারী, তামাত্তুকারী অথবা কিরানকারী কারও উপর কোন দম ওয়াজিব হবে না। وقال ابويوسف ومحمد لا شي عليه الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদের কথা বলেছেন।

২. ইমাম যুফার র. এর মতে কিরানকারীর উপর দুটি দম ওয়াজিব হবে। وقال زفر عليه دمان الخ দ্বারা তাঁর মাযহাব উল্লেখ করেছেন।

৩. ইমাম আবু হানীফা র. এর মতে এমতাবস্থায় কিরানকারীর উপর শুধু একটি দম ওয়াজিব হবে। فقال ابو حنيفة الخ দ্বারা তাঁর মাযহাব বর্ণনা করেছেন। ইমাম তাহাভী র. এর যুক্তি ইমাম আবু হানীফা র. এর পক্ষে।

**দ্বিতীয় দলের প্রমাণ**

وحجةٌ اخرىٰ وهِيَ اَن السائلَ لِرسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلمَ لَم يعلَمْ هَل كانَ قارنًا او مُفردًا او متمتِّعًا، فاِن كانَ مفرِدًا فابُوحنيفةَ وزفرُ رحـ لاينكرانِ ان يكونَ لايجبُ عليه فِى ذالكَ دمٌ لِاَنَّ ذالكَ الذبحَ الذىْ قدمَ عليهِ الحلقُ ذبحٌ غيرُ واجبٍ ولٰكنْ كانَ افضلَ لهٗ ان يقدمَ الذبحَ قبلَ الحجِّ ولكنهُ اِذا قدَّم الحلقَ اجزاهُ ولاَ شيئَ عليه واِن كانَ قارنًا او متمتعًا فكانَ جوابُ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ له فِى ذالكَ علىٰ ماذكرنَا

فقَد ذكرنَا عن ابنِ عباسٍ رضـ فى التقديمِ فى الحجِّ والتاخيرِ اَن فيهِ دمًا وانَّ قولَ النبيِّ صلّى اللهُ عليهِ وسلمَ لاحرجَ لايدفعُ ذالكَ

فَلمَّا كانَ قولُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ في ذالكَ لاحرجَ لاينفئ عندَ ابنِ عباسٍ رضـ وجوبَ الدمِ كانَ كذالكَ ايضًا لاينفيهِ عندَ ابى حنيفةَ رحـ وزفرَ رحـ وكانَ القارنُ ذبحُه ذبحٌ واجبٌ عَليهِ يَحلُّ بِهٖ

فَاردنَا ان ننظرَ فِى الاشياءِ التىْ يحِلُّ بِها الحاجُّ اِذا اخرَها حتى يحلَّ كيفَ حكمُهَا ؟ فوجدنَا اللهَ عزَّ وجلَّ قد قالَ ولاَ تحلِقُوا رُءُوسَكُم حتّٰى يَبْلُغَ الهدىُ مَحِلَّه فكانَ المحصرُ يحلقُ بعدَ بلوغِ الهدىِ محلَّه فيحلُّ بذالكَ وانِ حلَق قبلَ بلوغِه بمحلَّه وجبَ عَليهِ دمٌ وهٰذا اِجماعٌ فكانَ النظرُ علىٰ ذالكَ ان يكونَ كذالكَ القارنُ اِذا قدَّم الحلقَ قبلَ الذبحِ الذىْ يَحلُّ بهِ ان يكونَ عليهِ دمٌ قياسًا ونظرًا علىٰ مَا ذكرنَا مِن ذالكَ

فَبطلَ بهٰذا مَاذهبَ اليه ابويوسفَ رحـ ومحمدٌ رحـ وثبتَ مَا قالَ ابوُ حنيفةَ او مَا قالَ زفرُ رحـ

فَنظرنَا فِى ذالكَ فاِذا هذا القارنُ قد حلَقَ رأسَه فِى وقتٍ الحلقُ عليهِ حرامٌ وهوَ فِى حرمةِ حجةٍ وفِى حرمةِ عمرةٍ وكانَ القارنُ مااصابَ فى قِرانه مِمَّا لواَصابه وَهو فِى حجةٍ مفردةٍ اَو فِى عمرةٍ مُفردَةٍ وجَبَ عليهِ دمٌ فاِذَا اصابَه وهو قَارِنٌ وجبَ عَليهِ دمانِ فاحتملَ ان يكونَ حلُّه ايضًا قبلَ وقتِهٖ يوجبُ علَيهِ ايضًا دمينِ كمَا قالَ زفرُ رحـ فنظرنَا فِى ذالكَ فوجدنَا الاشياءَ التىْ توجبُ علىٰ القارنِ دمينِ فِيمَا اصابَ فى قِرانِه هىَ الاشياءَ التىْ لَواصابَها وهوَ فِى حرمةِ حجةٍ اَو فِى حرمةِ عمرةٍ وجبَ عليهِ دمٌ

فَاِذَا اصابَهَا فِى حرمتِهَا وجبَ عليهِ دمانِ كالجماعِ ومَا اشبهَه وكانَ حلقهُ قبلَ ان يذبحَ لم يحرمْ عليهِ بسببِ العمرةِ خاصةً ولاَ بسببِ الحجِّ خاصةً انما وجبَ عليهِ بسببِهِمَا وبحرمةِ الجمعِ بينهُمَا لاَبِحرمةِ الحجِّ خَاصةً ولاَ بحرمةِ العمرةِ خاصةً

### ইমাম আবু হানীফা ও যুফার র.-এর মাঝে তুলনামূলক যুক্তি

উল্লেখ্য, যদি কিরানকারী কুরবানীর আগে মাথা মুণ্ডন করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে একটি দম জরিমানারূপে ওয়াজিব হয়। আর ইমাম যুফার র.-এর মতে দুটি দম ওয়াজিব হয়। এ দুটি উক্তির কোনটির প্রাধান্য হবে তা প্রমাণ করার জন্য গ্রন্থকার যৌক্তিক প্রমাণ পেশ করছেন এবং দুটি নজর তুলনামূলক পাশাপাশি কায়েম করে ইমাম আবু হানীফা র.-এর উক্তিটিকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রথমেই পেশ করেছেন ইমাম যুফার র.-এর যুক্তি।

### ইমাম যুফার র.-এর যৌক্তিক প্রমাণ ঃ

فنظرنا فى ذالك থেকে তাঁর যুক্তি পেশ করা হয়েছে।

কিরান আদায়কারী কুরবানীর পূর্বে মাথা মুণ্ডালে তার উপর দম ওয়াজিব হবে কিনা? ওয়াজিব হলে কয়টি? এটি একটি বিতর্কিত বিষয়। কিরান আদায়কারীর উপর প্রথম দায়িত্ব ছিল কুরবানী করা। এরপর হালাল হওয়ার জন্য হলক করা। সে হলক করেছে আগে, অতএব হলক আগে করার হুকুম কি? এ সম্পর্কে দেখতে হবে। আমরা দেখি, মুহসার বা অবরুদ্ধ ব্যক্তি তথা যে ইহরাম বাঁধার পর রোগ, শত্রু অথবা কোন ওজরের কারণে ইহরামের দাবি অনুযায়ী আমল করতে অক্ষম হয়ে যায়, তার জন্য হুকুম হল, সে একটি কুরবানীর জন্তু হেরেমে পাঠিয়ে দিবে এবং একটি সময় সিদ্ধান্ত করে দিবে যে, তখন কুরবানীর পশুটিকে হেরেমে জবাই করে দেয়া হবে, যখন সে সময় আসবে, তখন এই অবরুদ্ধ ব্যক্তি মাথা মুণ্ডন করে হালাল হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–وَلَا تَحْلِقُوْا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ এ আয়াতে কুরবানীর জন্তু স্বীয় স্থানে পৌছার পূর্বে মাথা মুণ্ডাতে নিষেধ করা হয়েছে।

এবার কুরবানীর পশু স্বস্থানে পৌছার পূর্বে যদি এই অবরুদ্ধ ব্যক্তি মাথা মুণ্ডায়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর দম ওয়াজিব। অতএব হলক আগে করার

কারণে যেরূপভাবে অবরুদ্ধ ব্যক্তির উপর দম ওয়াজিব হয়, এরূপভাবে কিরান আদায়কারীর উপরও দম ওয়াজিব হবে। বাকি রইল কিরান আদায়কারীর উপর একটি দম ওয়াজিব, না দুটি?

### ইমাম আবু হানীফা র.-এর যৌক্তিক প্রমাণ

فَاردنَا اَنَ ننظرَ فِى حكمِ مَايجبُ بالجمعِ هلْ هو شَيئانِ او شئٌ واحدٌ فَنَظرنَا فِى ذالكَ فوجدنَا الرجلَ اِذا احرمَ بحجةٍ مفردةٍ اَو بعمرةٍ مفردةٍ لَم يجبْ عليهِ شئٌ وَاِذاَ جمعَهُمَا جَمِيعاً وَجَبَ عَليهِ لِجَمعِهِ بينَهمَا شئٌ لم يكنْ يجبُ عليهِ فى اِفرادِهِ كلّ واحدةٍ مِنها، فكانَ ذالكَ الشئُ دمًا واحدًا فالنظرُ علٰى ذالكَ اَن يكونَ كذالكَ الحلقُ قبلَ الذبحِ الذىْ منعَ مِنه الجمعُ بينَ العمرةِ والحجِ فلايَمنعُ منهُ واحدةً منهمَا لوكانتْ مفردةً ان يكونَ الذىْ يجبُ بِه فيهِ دمٌ واحدٌ فيكونُ اصلُ مايجبُ علٰى القارنِ فى انتهاكِه الحرمَ فى قِرانه اَنَ ننظرَ فِيمَا كانَ مِن تلكَ الحرمِ تحرمُ بالحجةِ خاصةً وبِالعمرةِ خاصةً فَاِذا جمعتَا جميعًا فتلكَ الحرمةُ محرّمةٌ لشيأينِ مختلفينِ فيكونُ علٰى مَنِ انتهكَهمَا كفارتَانِ وكلّ حرمةٍ لاتحرّمها الحجةُ علٰى الانفرادِ ولاَ العمرةُ على الانفرادِ اِنمَا يحرّمُها الجمعُ بينَهما، فاِذَا انتهكتْ فعلٰى الذى انتهكَها دمٌ واحدٌ لِانه انتهكَ حرمةً حرمتْ عَليهِ بسببٍ واحدٍ فهٰذا هو النظرُ فِى هٰذا البابِ وهو قولُ ابى حنيفةَ رحـ وبِه نأخذُ۔

### কুরবানীর পূর্বে হলক করলে কিরানকারীর উপর একটি দম ওয়াজিব না দুটি?

কিরান আদায়কারী ব্যক্তি হজ্জ অথবা উমরা উভয়টির ইহরামে থাকে, কাজেই এখানে দুটি হুরমত (সম্মানের বিষয়) রয়েছে–

১. হুরমতে হজ্জ, ২. হুরমতে উমরা।

এই কিরান আদায়কারী ব্যক্তি কিরান অবস্থায় যদি এরূপ কোন কাজ করে, যেটি হজ্জ বা উমরা অবস্থায় করলে একটি দম ওয়াজিব হত, যেমন– ইহরামে নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে কোন একটিতে লিপ্ত হলে। কারণ, এই কর্মে লিপ্ততা হজ্জ অবস্থায়ও দমের কারণ, উমরা অবস্থায়ও। কাজেই এমতাবস্থায় এ কিরান আদায়কারীর উপর দুটি দম ওয়াজিব হবে। কারণ, কিরান অবস্থায় তার জন্য দুটি হুরমত ভঙ্গ করা আবশ্যক হয়। এই কিরান আদায়কারী যদি কুরবানীর পূর্বে হলক করে, তবে উপরোক্ত হুকুমের উপর কিয়াস করলে, বাহ্যত এর উপর দুটি দমই ওয়াজিব হওয়ার কথা। যেমন– বলেছেন, ইমাম যুফার র.। কিন্তু যদি ভাল করে চিন্তা করা হয়, তবে বুঝে আসবে, উপরোক্ত ছুরতে শুধু একটি দম তার উপর ওয়াজিব হয়। কারণ, যে জিনিসে লিপ্ত হলে, হজ্জ অথবা উমরা অবস্থায় একটি দম ওয়াজিব হয় যদি সে কাজটি কিরান অবস্থায় করে, তবে দুটি দম ওয়াজিব হয়। কিন্তু কুরবানীর পূর্বে হলক করলে সেটি এরূপ কাজ হল না, যার ফলে হজ্জ অথবা উমরা অবস্থায় কারো উপর কোন দম ওয়াজিব হয়। কারণ, শুধু হজ্জ অথবা উমরার ছুরতে তার উপর কোন কুরবানী আসে না। কাজেই ওখানে কুরবানীর পূর্বে হলকের প্রশ্নই আসে না।

এর ফলে স্পষ্ট হয় যে, যবাইয়ের পূর্বে মাথা মুণ্ডন, তার উপর শুধু হজ্জ অথবা উমরার কারণে হারাম হয়নি, বরং উভয়টির সমষ্টির কারণে। হজ্জ ও উমরা একত্রিত হলে যে জিনিসটি আবশ্যকীয়, সেটি দুই নয় বরং একটি হয়। এজন্য কেউ শুধু হজ্জ অথবা উমরা করলে তার উপর কোন কুরবানী নেই। কিন্তু যদি সে হজ্জ ও উমরা একত্রিত করে, তার উপর শুকরিয়ারূপে কুরবানী ওয়াজিব হয়, তবে দুটি নয়, একটি। কাজেই যবাইয়ের পূর্বে হলকের হুরমতের কারণ যেহেতু শুধু হজ্জ অথবা শুধু উমরা নয়, বরং উভয়টির একত্রিকরণ, সেহেতু এতে লিপ্ত হলে একটি দম ওয়াজিব হবে, দুটি নয়। অবশ্য যে হুরমতের কারণ আলাদাভাবে হজ্জ হয়ে থাকে এবং উমরাও, সেখানে দুটি হুরমতের কারণে নিষিদ্ধ জিনিসে লিপ্ত হলে দুটি দম ওয়াজিব হবে। যেমন– কিরান অবস্থায় ইহরামের নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হল। অতএব, যে হুরমতের কারণ আলাদাভাবে হজ্জ ও উমরা উভয়টি হবে, তাতে লিপ্ত হলে, দম ওয়াজিব হবে। এর উপর কিয়াস করে এ হুরমতে লিপ্ত হলেও দুটি দম ওয়াজিব করা সহীহ হবে না। যার কারণ, না হজ্জ না উমরা, বরং উভয়টির একত্রিকরণ। অতএব, ইমাম যুফার র.-এর কিয়াস বাতিল হল, আবু হানীফা র. এর উক্তি প্রমাণিত হল।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নুখাবুল আফকার ঃ ৭/৯৪, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/৫৬৬-৫৭২।

## باب الهدى يصد عن الحرم هل ينبغى ان يذبح فى غير الحرم ام لا

## অনুচ্ছেদ ঃ যে কুরবানীর পশুকে হেরেম থেকে বারণ করা হয়েছে সেটিকে হেরেম ছাড়া অন্যত্র যবাই করা উচিত কিনা?

মাযহাবের বিবরণ ঃ

যে ব্যক্তি ইহরাম বাঁধার পর কোন ওজরের কারণে বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে অক্ষম হয়ে গেছে, যাকে পরিভাষায় মুহসার অর্থাৎ অবরুদ্ধ বলা হয়, তার উপর কুরবানী করার নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

فَاِنْ اُحصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ـ

এ ব্যক্তি কুরবানীর জন্তু কোথায় যবাই করবে? এটি একটি বিতর্কিত বিষয়।

১. ইমাম শাফিঈ, মালিক, আহমদ, যুহরী, মুজাহিদ র. প্রমুখের মতে যেখানে সে অবরুদ্ধ হয়েছে সেখানেই যবাই করবে, চাই সেটি হেরেম হোক অথবা অন্য কোন স্থান। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, হাসান বসরী, ইবরাহীম নাখঈ র. প্রমুখের মতে অবরুদ্ধের জন্তুর যবাইয়ের স্থান শুধু হেরেম, হিল্লে এর যবাই হতে পারে না। এবার যদি সে অবরুদ্ধ ব্যক্তি হেরেমে থাকে, তবে নিজে যবাই করবে আর বাইরে থাকলে সে এই কুরবানীর পশুকে হেরেমে পাঠাবে, যাতে হেরেমে সেটাকে যবাই করা যায়। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। যুক্তির আলোকে ইমাম তাহাভী র. হানাফীদের উক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

وكَانَ مِن حجتِهِم فِى ذالكَ قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ هديًا بالغَ الكعبةِ فَكَانَ الهدىُ قَد جعلَه اللهُ عزَّ وجلَّ مَا بلَغَ الكعبةَ فهوَ كالصيامِ الذىْ جَعَلَه اللهُ عزّوجلَّ متتابِعًا فِى كفارةِ الظهارِ وكفارةِ القتلِ فلَايجوزُ غيرَ متتابِعٍ وإنِ كانَ الذىْ وجبَ عليهِ غيرَ

مطيقِ الاتيانِ بهِ متتابعًا فلاَ تُبيحهُ الضرورةُ اَن يصومَه متفرقًا، فكذالكَ الهدىُ الموصوفُ ببلوغِ الكعبةِ لايُجزِئُ الذىْ هوَ عليهِ كذالكَ وانِ صدَّ عنْ بلوغِ الكعبةِ للضرورةِ اَن يذبحَه فِيمَا سِوى ذالكَ ـ

আল্লাহ্ তা'আলা هديا بالغ الكعبة আয়াতে কাবায় পৌঁছাকে হাদীর সিফাত সাব্যস্ত করেছেন। যেরূপভাবে জিহাদ ও হত্যার কাফফারায় রোযা লাগাতার রাখার শর্ত আরোপ করা হয়েছে, এবার যদি কোন ব্যক্তি জিহার অথবা হত্যার কাফফারায় লাগাতার রোযা রাখতে সক্ষম না হয়, তবে তার ওজরের কারণে তার থেকে লাগাতারের এই শর্ত রহিত হয় না। বরং সর্বাবস্থায় লাগাতার রোযা রাখা তার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে জরুরি। এরূপভাবে হাদী সম্পর্কে কাবায় পৌঁছার যে শর্ত রয়েছে, সেটিও ওজরের কারণে বাদ পড়বে না। এ ব্যক্তি হেরেম পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় তার কুরবানীর পশুর যবাই হেরেমেই হতে হবে, যাতে কাবায় পৌঁছার অর্থ বাস্তবায়িত হয়। কাজেই হানাফীদের মাযহাব প্রমাণিত হল।

وكانَ منَ الحجةِ لهم علىٰ اهلِ المقالةِ الاولىٰ فى نحرِ النبىِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لذالكَ الهدىِ الذىْ نحرَه بالحُديبيةِ لمَّا صُدَّ عنِ الحرمِ وتصدَّقَ بلحمِهِ بقديدٍ ان قَومًا قد زعمُوا اَن نحرَه اياهُ كانَ فى الحرمِ حدثنَا ابراهيمُ بنُ ابى داوٗدَ قالَ ثنَا مِغْوَلُ بنُ ابراهيمَ بنِ مغولِ بنِ راشدٍ عن اسرائيلَ مجزأةَ بنِ زاهرٍ عن ناجيةَ بنِ جندبِ الاسلمىِّ عن ابِيه قالَ اتيتُ النبىَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ حينَ صُدَّ الهدىُ فقلتُ يا رسولَ اللهِ ! ابعثْ معِى بالهدىِ فلَانحرُه فِى الحرمِ قالَ وكيفَ تأخذُ بهِ قلتُ اٰخذُبه فى اَودية لايقدرونَ علىَّ فِيهَا فبعثَه معىْ حتى نحرتُه فى الحرمِ فقدْ دلَّ هٰذا الحديثُ اَن هدىَ النبىِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ ذالكَ نَحرَ فى الحرمِ

فكانَ مِنَ الحجةِ عليهمْ فِى ذالكَ انهمْ لايُبيحونَ لِمن كانَ غيرَ ممنوعٍ من الحرامِ ان يذبحَ فى غيرِ الحرمِ وانما يختلفونَ اِذا كانَ ممنوعًا عنهُ فدلَّ ماذكرنا علٰى ان عليًا لمَّا نحرَ فِى هٰذا الحديثِ فى غيرِ الحرمِ وهو واصلٌ الحرامَ انه لم يكنْ ارادَبه الهدىَ ولٰكنهُ ارادَ به معنىً اخرَ من الصدقةِ على اهلِ ذالكَ الماءِ والتقربِ الى اللهِ تعالٰى بذالكَ مع انهُ ليسَ فِى الحديثِ انه ارادَ به الهدىَ فكمَا يجوزُ لِمن حملَه على انهُ هدىٌ ما حمَله عليهِ مِن ذٰلك، فكذٰلكَ يجوزُ لِمن حمَله علٰى انهُ ليسَ بهديٍ مَا حمَلَه عليهِ مِن ذالكَ وقَد بدأنَا بالنظرِ فى ذالكَ وذكرنَا فِى اولِ هٰذا البابِ فاغنَانَا ذالكَ عن اعادتِه هٰهنَا ـ

যৌক্তিক প্রমাণ ঃ

যে ব্যক্তি হেরেমে পৌঁছতে অক্ষম হয়ে গেছে, সে স্বীয় কুরবানীকে হিল্লেই যবাই করবে। এ দাবির উপর হুদাইবিয়ার ঘটনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়ায় স্বীয় কুরবানীর জন্তু যবাই করেছিলেন, যখন তাঁকে হেরেম থেকে বারণ করা হয়েছিল, অতএব, বুঝা গেল, যে ব্যক্তি হেরেমে পৌঁছতে অক্ষম হবে, সে সেখানেই স্বীয় কুরবানী করে নিবে। ইমাম তাহাভী র. বলেছেন, এ প্রমাণটি বিশুদ্ধ নয়। কারণ, রেওয়ায়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কুরবানীর পশুগুলো হুদাইবিয়ার যে স্থানে যবাই করা হয়েছে, সেটি ছিল হেরেম, হিল নয়। হযরত জুনদুব আসলামী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তিনি বলেছেন– يا رسول الله! ابعث معى بالهدى فلانحره فى الحرم ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে কুরবানীর পশু দিয়ে প্রেরণ করুন, যাতে আমি সেটাকে হেরেমে যবাই করতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হেরেমের ভেতর পাঠান। তিনি সেটাকে সেখানে যবাই করেন। এতে প্রমাণিত হয়, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুরবানীর পশু হেরেমে যবাই করা হয়েছে, হিল্লে নয়।

আরেক রেওয়ায়াতে হযরত সাওদা রা. থেকে বর্ণিত, হুদাইবিয়ায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তাবু ছিল হিল্লে, কিন্তু তাঁর নামাযের স্থান ছিল হেরেমে كان فى الحديبية خباءه فى الحل ومصلاه فى الحرم এই রেওয়ায়াত দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা শরীফে পৌঁছতে অক্ষম থাকলেও হেরেম পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছেন। সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, কোন ব্যক্তি হেরেমে পৌঁছতে অক্ষম না হলে তার জন্য হেরেমের বাইরে সেই কুরবানীর পশু যবাই করা জায়েয নেই। অতএব বলতে হবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু হেরেমে পৌঁছতে অক্ষম ছিলেন না, তাই তিনি স্বীয় কুরবানীর পশু হিল্লে কুরবানী করেননি, বরং হেরেমে যবাই করেছেন। কাজেই হুদাইবিয়ার ঘটনা দ্বারা প্রমাণ ঠিক নয়।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নুখাবুল আফকার ঃ ৭/১০৫, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/৫৭৫-৫৮১।

## باب المتمتع الذى لايجد هديا ولايصوم فى العشر

## অনুচ্ছেদ ঃ যে তামাত্তুকারী কুরবানীর পশু পায় না এবং নির্দিষ্ট ১০ দিনে রোযা রাখে না

### মাযহাবের বিবরণ ঃ

তামাত্তুকারী 'ও কিরানকারীর উপর একটি কুরবানী ওয়াজিব হয়, যাকে তামাত্তুর দম এবং কিরানের দম বলা হয়। এবার যদি কুরবানী করতে অক্ষম হয়, তবে তার উপর মোট ১০ দিন রোযা রাখা আবশ্যক। তন্মধ্যে তিনটি হজ্জে আর সাতটি হজ্জ থেকে অবসর হওয়ার পর। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ـ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ـ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ـ

হজ্জকালীন তিন রোযা সম্পর্কে হুকুম হল– সে ব্যক্তি সেগুলো কুরবানীর দিনের পূর্বে বরং আরাফা দিবসের পূর্বেই রাখবে। যদি কুরবানী থেকে অক্ষম কোন ব্যক্তি কুরবানীর দিনের আগে ঐ তিনটি রোযা রাখতে না পারে, তবে কুরবানীর দিনের পর আইয়্যামে তাশরীকে তথা ১১, ১২, ১৩ তারিখে এই রোযা রাখতে পারবে কি না? এ বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে।

১. যদিও আইয়্যামে তাশরীকে রোযা রাখা নিষিদ্ধ, কিন্তু তামাত্তু ও কিরানকারীর জন্য এটা জায়েয আছে। এটা ইমাম মালিক, আওযাঈ, যুহরী র, প্রমুখের মাযহাব। শাফিঈ র. এর পুরনো উক্তি, আহমদ র. এর একটি উক্তি বরং প্রধান উক্তি। فذهب قوم الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. কারও জন্য আইয়্যামে তাশরীকে রোযা রাখা জায়েয নেই, এটাই হানাফীদের মাযহাব, শাফিঈদের নতুন ও প্রসিদ্ধ উক্তি। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইমাম তাহাভী র. যুক্তি দ্বারা অবৈধতারই প্রমাণ পেশ করেছেন।

وَاَمَّا مِن طريقِ النظرِ فاِنَا قدْ رأينَاهُم اَجمعُوا اَن يومَ النحرِ لاَيصامُ فيهِ شئٌ مِن ذالكَ وهُوَ الى ايامِ الحجِّ اقربُ مِن ايامِ التشريقِ، لِمَا جَاءَ عَن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ مِنَ النهيِ عنْ صومِهِ مِمَّا سنذكرُه فِى هٰذا البابِ اِنْ شاءَ اللهُ تعالىٰ فَكَمَا كانَ نهيُ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ فِى ذالكَ يدخلُ فيهِ المتمتعونَ والقارنونَ والمحصَرونَ كانَ كذالكَ نهيُه عن صيامِ ايامِ التشريقِ يدخلونَ فيهِ ايضًا ـ

فَمِما روىَ عَن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فى النهيِ عَن صومِ يومِ النحرِمَا حدثَنا ابنُ مرزوقٍ قالَ ثنَا عثمانُ بنُ عمرَ قالَ انَا ابنُ ابى ذِئبٍ عنْ سعيدِ بنِ خالدٍ عنْ ابىْ عبيدٍ مولىٰ ابنِ ازهرَ قالَ شهدتُ العيدَ معَ عليٍّ وعثمانَ رضـ فكانَا يُصَليانِ ثم ينصرفانِ يذكرانِ الناسَ فسمعتُهما يقولانِ نهىٰ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن صيامِ هٰذينِ اليومينِ يومِ النحرِ ويومِ الفطرِ حدثَنا يونسُ قالَ انَا ابنُ وهبٍ اَن مالكًا حدثَه عنِ ابنِ شهابٍ عنْ ابِى عبيدٍ قالَ شهدتُ العيدَ مع عمرَ رضـ فقالَ هٰذانِ يومانِ نهىٰ

رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم عنْ صيامِهَا يومُ الفطرِ ويومُ النحرِ فَاَمَّا يومُ الفطرِ فيومُ فطرِكم مِن صيامِكم واما يومُ النحرِ فيومٌ تأكلونَ فيهِ من نُسكِكُم۔

حدثَنا ابوامية قالَ ثنَا عبيدُ اللهِ بنُ موسٰى قالَ انَا ابراهيمُ بنُ اسماعيلَ بنِ مجمعٍ وسفيانُ بنُ عيينةَ عن الزهريِّ عن ابِى عبيدٍ مولٰى عبدِ الرحمٰنِ بنِ عوفٍ قالَ صليتُ العيدَ مع عمرَ فذكرَ مثلَه ۔

حدَّثنا فهدٌ قالَ ثناَ عليُّ بنُ معبدٍ قالَ ثنَا اسماعيلُ بنُ ابى كثيرٍ الانصاريُّ عنْ سعدِ بنِ سعيدٍ عن عمرةَ عن عائشةَ رض عَن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم اَنه نهٰى عن صَومِ يومينِ يومِ الفطرِ ويومِ النحرِ ۔

حدثَنا محمدُ بنُ خزيمةَ قالَ ثنَاحجاجٌ قالَ ثنا حمادٌ عنْ قتادةَعنْ ابِى نضرةَ عن ابى سعيدٍ الخدريِّ رض عن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم مثلَه ۔

حدثنا بحرُ بنُ نصرٍ قالَ ثناَ ابنُ وهبٍ قالَ اخبرَنى عمرُو بنُ الحارثِ اِنَّ المنذرَ بنَ عبيدٍ المدنيُّ حدَّثه ان ابَا صالحٍ السمَّانَ حدَّثه انه سمِع ابَا هريرةَ رض يخبرُ عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ۔

حدَّثنا ابنُ مرزوقٍ قالَ ثنَا سعيدُ بنُ عامرٍ عنِ الربيعِ بنِ صبيحٍ عن يزيدَ الرُقاشيِّ عن انسِ بنِ مالكٍ رض عنِ النبيِّ صَلى اللهُ عليهِ وسلَّم مثلَه ۔

حدَّثنا يونسُ قالَ اخبرنَا ابنُ وهبٍ ان مالكًا حدَّثه عن محمدِ بنِ يحيٰى بنِ حبانَ عن الاعرجِ عنْ ابِىْ هريرةَ رض عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مثله ۔

حدّثنا ابنُ مرزوقٍ قالَ ثنَا وهيبٌ قالَ ثنَا شعبةُ عن عبدِ الملكِ بن عميرعن قَزعةَ عن ابى سعيدٍ رض عن النبيِّ صلى اللّٰهُ عليهِ وسَلّم مثلَه ـ

فلمَّا كانَ يومُ النحرِخارجًامن ايامِ الحجّ التىْ جعَلَ اللّٰهُ عزوجلَّ للمتمتعِ الصومَ فِيهَا بدلاًمن الهديِ، لِمَا قَد اخرَجه النبىُّ صلى اللّٰهُ عليه وسلّمَ مِن الايامِ التىْ يصامُ فيهَا بِنهيهِ عنْ صومِه كَانَ كذٰلك ايامُ التشريقِ خارجةً مِن ايامِ الحجِّ التىْ جعلَ اللّٰهُ عز وجلَّ للمتمتعِ الصومَ فِيهاَ بدلاًمن الهديِ لِما قَد اخرجَها النبىُّ صلى اللّٰهُ عليهِ وسلّم مِن الايّامِ التىْ تصامُ بِنهيهِ عن صومِها فثبتَ بِماذكرنَا اَن ايامَ التشريقِ ليسَ لِاحدٍ صومَها فى متعةٍ ولاقرانٍ ولااحصارٍ ولاغيرِ ذالكَ منَ الكفاراتِ ولاَ مِنَ التطوعِ وهٰذا قولُ ابىْ حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمهم اللّٰهُ تعالىٰ ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

এখানে প্রায় বাইশ লাইনে যৌক্তিক প্রমাণের আলোকে দ্বিতীয় দলের দলীল পেশ করা হয়েছে। এর সারনির্যাস হল– এ ব্যাপারে সমস্ত উলামায়ে কিরাম একমত যে, কুরবানীর দিন কোন প্রকার রোযা রাখা জায়েয নেই। কুরআনে কারীমে فصيام ثلاثة ايام فى الحج الخ আয়াতে কুরবানীর দিনের পূর্বে জিলহজের দশ দিনের তিন দিনে রোযা রাখার নির্দেশ রয়েছে। কুরবানীর দিন আইয়্যামে তাশরীকের তুলনায় আরাফার দিনের অধিক নিকটবর্তী। যেহেতু কুরবানী দিবস জিলহজের দশ দিনের নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও তাতে তামাত্তুকারী, কিরানকারী ও অবরুদ্ধ ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা জায়েয নেই। অতএব, আইয়্যামে তাশরীক যেটি হজের দিবসগুলো তথা দশ জিলহজ থেকে দূরবর্তী সেগুলোতে তামাত্তুকারী, কিরানকারী ও অবরুদ্ধ ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা উত্তম রূপেই নাজায়েয ও নিষিদ্ধ হবে। কাজেই কুরবানীর দিবসে রোযার নিষেধ আইয়্যামে তাশরীকে রোযার নিষেধকে আবশ্যক করবে। অতএব, তাতে রোযা রাখা জায়েয হবে না।

গ্রন্থকার কুরাবানী দিবসে এবং দুই ঈদে রোযার নিষেধের রেওয়ায়াতগুলো সাতজন সাহাবী থেকে নয়টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(১) হযরত উসমান রা. এর রেওয়ায়াত– এক সূত্রে

(২) হযরত আলী রা. এর রেওয়ায়াত– এক সূত্রে

(৩) হযরত উমর রা. এর রেওয়ায়াত– দুই সূত্রে

(৪) হযরত আয়েশা রা. এর রেওয়ায়াত– এক সূত্রে

(৫) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. এর রেওয়ায়াত– দুই সূত্রে

(৬) হযরত আবু হোরায়রা রা. এর রেওয়ায়াত– দুই সূত্রে

(৭) হযরত আনাস রা. এর রেওয়ায়াত– এক সূত্রে

এসব রেওয়ায়াতে প্রিয়নবী সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন ও দুই ঈদের দিবসে রোযা রাখতে সাধারণভাবে নিষেধ করেছেন। এই নিষেধে তামাত্তুকারী, কিরান আদায়কারী ও হজ্বে অবরুদ্ধ ব্যক্তি প্রমুখ সবাই অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতঃ কুরবানীর দিনকে হজ্বের সেসব দিনের বাইরে রাখা হয়েছে, যেগুলোতে তামাত্তুকারী ও কিরানকারীকে রোযা রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। যেহেতু কুরবানীর দিনকে সেসব দিন থেকে বাইরে রাখা হয়েছে, সেহেতু আইয়্যামে তাশরীক উত্তমরূপেই সেসব দিবস থেকে বহির্ভুত হবে। কাজেই যেরূপভাবে কুরবানী দিবসে রোযা রাখা জায়েয নেই, অনুরূপভাবে আইয়্যামে তাশরীকেও তামাত্তুকারী, কিরানকারী ও অবরুদ্ধ ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা জায়েয হবে না। কাজেই কাফ্ফারার রোযা, মান্নতের রোযা, নফল রোযা ইত্যাদি কোন প্রকার রোযাই রাখা জায়েয হবে না। অতএব, এরূপ তামাত্তুকারী কিরান আদায়কারী ও অবরুদ্ধ ব্যক্তির উপর দম ওয়াজিব হবে, যে, কুরবানীর দিনের পূর্বেকার তিন দিন রোযা রাখেনি। এটাই আমাদের আলিমত্রয়ের মাযহাব। এটার উপরই হানাফীদের ফতওয়া।

সারকথা, প্রচুর হাদীসে যে ৫ দিন রোযা রাখা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, তন্মধ্যে আইয়্যামে তাশরীকের ন্যায় কুরবানীর এক দিনও আছে। কিন্তু তামাত্তু অথবা কিরানকারীকে কেউ কুরবানীর দিন রোযা রাখার অনুমতি দেন না, অথচ আইয়্যামে তাশরীকের তুলনায় কুরবানীর দিন হজ্জ দিবসগুলোর অধিক নিকটবর্তী, অতএব কুরবানীর দিন রোযা রাখার নিষেধে যেরূপভাবে তামাত্তু, কিরানকারী এবং অবরুদ্ধ সবাই সর্বসম্মতিক্রমে অন্তর্ভুক্ত, কেউ ব্যতিক্রম নয়,

অনুরূপভাবে আইয়্যামে তাশরীকে রোযা রাখার নিষেধাজ্ঞায়ও সাধারণত সবাই অন্তর্ভুক্ত হবে। কাউকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা ঠিক হবে না। যুক্তির আলোকে তাই প্রমাণিত হয়।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য তিরমিযী শরীফ ঃ ১/১৬৯, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ ১/৩৬৯, মুগনী ঃ ৩/২৪৯, নববী ঃ ১/৪০৩, নুখাবুল আফকার ঃ ৭/১১৪, আওজাযুল মাসালিক ঃ ৩/৫২৭, ৭৪২, উমদাতুল ক্বারী ঃ ৯/২০৭, মাআরিফুস সুনান ঃ ৬/৭৪, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/৫৮২-৫৯০।

## باب حكم المحصر بالحج

## অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জে অবরুদ্ধ ব্যক্তির হুকুম

**مُحصَر-এর অর্থ ঃ**

مُحصَر ইসমে মাফঊলের সীগা। احصار থেকে নির্গত, অর্থাৎ বারণ করা। শরীয়তের পরিভাষায় মুহসার সে, যে হজ্জ অথবা উমরার ইহরাম বাঁধার পর ইহরামের দাবি পূর্ণ করার পূর্বে অক্ষম হয়ে গেছে, যাকে কোন ওজর বারণ করেছে। এই মুহসার ব্যক্তি সম্পর্কে ইমাম তাহাভী র. বিভিন্ন প্রকার মাসআলা উল্লেখ করেছেন। নিম্নে কয়েকটি মাসআলা ক্রমানুসারে উল্লেখ করা হল–

**১. শুধু শত্রুর ভয়ই কি অবরোধের কারণ?**

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, যুফার, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখঈ র. প্রমুখের মতে অবরোধ সে সব জিনিস দ্বারা বাস্তবায়িত হয়, যেগুলো ইহরামের দাবি পূর্ণ করার জন্য প্রতিবন্ধক হয়, চাই শত্রু হোক বা রোগ কিংবা অন্য কিছু। فقال قوم بكل حابس يحبسه من مرض اوغيره الخ দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝানো হয়েছে। ইমাম তাহাভী র. স্বীয় যুক্তি দ্বারা হানাফীদের মাযহাব প্রমাণ করেছেন।

২. ইমামত্রয়, ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ও লাইস ইবনে সা'দ র.-এর মতে শুধু শত্রুভীতিই অবরোধের কারণ, অন্য কোন কারণে মানুষ অবরুদ্ধ হয় না। وقال اخرون لايكون الاحصار الذى الخ দ্বারা গ্রন্থকার তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

وَأَمَّا وجهُه مِن طريقِ النظرِ فانَّا قدرأيناهم اجمعُوا اَن احصارَ العدوِّ يجبُ بهِ للمحصَرِ الاحلالُ كمَا قد ذكرْنَا واختلفُوا فِى المرضِ فقالَ قومٌ حكمُه حكمُ العدوِّ فِى ذالكَ، اِذ كانَ قدمنعَه مِن المضيِّ فِى الحجِّ كمَا منعَه العدوُّ، وقالَ اخرونَ حكمُه بائنٌ مِن حكمِ العدوِّ فاردنَا ان ننظرَ مَاابيحَ بالضرورةِ مِن العدوِّ هلْ يكونُ مباحًا بالضرورةِ بالمرضِ ام لاَ؟ فوجدنَا الرجلَ اذا كانَ يطيقُ القيامَ كانَ فرضُه ان يصلىَ قائمًا واِن كانَ يخافُ اِن قام ان يُعانيَه العدوُّ فيقتلَه او كانَ العدوُّ قائماً على رأسِه فمنعَه منَ القيامِ فكلٌّ قد اجمعَ انه قدْ حلَّ لهُ ان يصلىَ قاعداً وسقَط عنهُ فرضُ القيامِ ـ

واَجمعُوْا اَن رجلاً لواصابَه مرضٌ او زمانةٌ فمنعَه ذالكَ مَن القيامِ اَنه قدْ سقطَ عنهُ فرضُ القيامِ وحلَّ لهُ اَن يصلىَ قاعدًا يركعُ ويسجدُ اذا اطاقَ ذٰلكَ اويُومئْ اِن كانَ لايطيقُ ذالكَ، فرأينَا مَا اُبيحَ لهُ مِن هٰذا بالضرورةِ من العدوِّ قد ابيحَ لهُ بالضرورةِ مِن المرضِ ورأينَا الرجلَ اذا حالَ العدوُّ بينَه وبينَ الماءِ سقَطَ عنهُ فرضُ الوضوءِ وتيممَ وصلّٰى ـ

وكذالكَ لوكانتْ بهِ علةٌ يضرُّهَا الماءُ كانَ كذالكَ ايضًا يسقُطُ عنه فرضُ الوضوءِ ويتيممُ ويصلىْ، فكانتْ هذه الاشياءُ التى قَد عذرَ فيهَا بالعدوِّ وقد عذرَ فيهَا ايضًا بالمرضِ وكانتِ الحالُ ذالكَ سواءً، ثم رأينَا الحاجَّ المحصَرَ بالعدوِّ قد عذرَ، فجعلَ لهُ فِى ذالكَ ان يفعلَ ماجعلَ للمحصَرِ ان يفعلَ حتى يحلَّ، واختلفُوا فى المحصَرِ بالمرضِ،فالنظرُ علٰى ماذكرنَا مِن ذالكَ اَن يكونَ

مَاوجبَ له مِن العذرِ بالضرورةِ بالعدوِّ ويجبُ له ايضًا بالضرورةِ ويكونُ حكمُه فى ذالكَ سواءً كمَا كانَ حكمُه فِى ذالكَ ايضًا سواءً فِى الطهاراتِ والصلواتِ -

**যৌক্তিক প্রমাণ ও উত্তর ঃ**

শত্রুর কারণে অবরোধ বাস্তবায়িত হওয়ার ব্যাপারে কারও কোন মতবিরোধ নেই, রোগের কারণে অবরোধ হবে কি না, এতে মতবিরোধ আছে। আমাদের দেখতে হবে, শত্রুর কারণে যে জিনিস বৈধ হয়, সেটি রোগের কারণে বৈধ হবে কিনা? আমরা দেখি, নামাযের ফরয কিয়াম যেরূপভাবে শত্রুর ভয়ে বাদ পড়ে যায়, এরূপভাবে রোগের কারণেও রহিত হয়। শত্রুর ভয় অথবা রোগ হলে দাঁড়ানো সম্ভব না হলে বসে নামায পড়া জায়েয আছে, এরূপভাবে শত্রুর ভয়ের কারণে, যেমন– ওযুর ফরযিয়ত বাতিল হয়ে তায়াম্মুমের অনুমতি হয়, এরূপভাবে রোগের কারণেও হয়। কাজেই পবিত্রতা, নামায ইত্যাদিতে দেখা দেয়, শত্রুর ভয়কে ওজর মানা হয়, সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে রোগকেও ওজর মানা হয়। কাজেই যুক্তির দাবি হল, হজ্জ ও উমরার এই অবরোধের মাসআলায়ও শত্রুর ভয়ের ন্যায় রোগকে ওজর মানা এবং এ কথা বলা যে, শত্রুর ভয় ও রোগ উভয়টিই অবরোধের কারণ হয়। যুক্তির নিরীখে এটা প্রমাণিত হয়।

**২. উমরাতেও কি অবরোধ হয়?**

১. আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, যুফার, শাফিঈ, আহমদ, ইকরামা, শাবী' র. প্রমুখের মতে হজ্জের ন্যায় উমরায়ও অবরোধ হবে। কাজেই হজ্জের মুহরিমের ন্যায় উমরার মুহরিমও ইহরাম ভেঙ্গে হালাল হয়ে যাবে। فقال قوم يبعث بهدى ويواعدهم الخ দ্বারা তাঁদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ইমাম তাহাভী র. এ মতটিকেই যুক্তির আলোকে প্রমাণিত করেছেন। এটি ইমাম মালিক র. থেকেও একটি রেওয়ায়াত।

২. ইমাম মালিক র. এর এক রেওয়ায়াত মতে এবং ইবনে সীরীন ও কোন কোন আসহাবে জাহিরের মতে উমরায় অবরোধ হয় না। কারণ উমরার জন্য কোন সময় নির্ধারিত নয়। যখন ইচ্ছা আদায় করতে পারে, অতএব হজ্জের ইহরামকারীর জন্য যে অবস্থায় (শত্রুর ভয় অথবা রোগের ফলে) স্বীয় ইহরাম ভেঙ্গে হালাল হওয়া জায়েয হয়, এরূপ অবস্থায় উমরার ইহরামকারীর জন্য ও

স্বীয় ইহরাম ভেঙ্গে হালাল হওয়া জায়েয হবে না, বরং তার জন্য স্বীয় ইহরামের উপর থাকা জরুরি, যতক্ষণ না প্রতিবন্ধকতা দূর হয় ও উমরা করে নেয়।

যেহেতু হজ্জ একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের কাজ। যা ছুটে যাওয়ার ভয় আছে, কিন্তু উমরায় তা নেই। এরজন্য কোন নির্ধারিত সময় নেই। যখন ইচ্ছা আদায় করতে পারে, অতএব এতে ছুটে যাওয়ার ভয় নেই। কাজেই ইমাম মালিক র. উমরায় অবরোধ অস্বীকার করেন। وقال اخرون بل يقيم على احرامه ابدا الخ দ্বারা উপরোক্ত ইমামগণকেই বুঝানো হয়েছে।

وَاَمَّا النظرُ فِى ذالكَ فاِنَّا قدْ رأينَا اشياءَ قد فُرضتْ علٰى العبادِ ممَّا جعلَ لهَا وقتٌ خاصٌّ واشياءَ فرِضتْ عليهِم ممَّا جعلَ الدهرُكلُّه وقتًا لهَا، مِنهَا الصلواتُ فرِضتْ عليهِم فِى اوقاتٍ خاصةٍ تؤدّى فى ذٰلكَ الاوقاتِ باسبابٍ متقدمةٍ لهَا مِن التطهرِ بالماءِ وسترِ العورةِ -

ومِنهَا الصيامُ فِى كفاراتِ الظهارِ وكفاراتِ الصيامِ وكفاراتِ القتلِ جُعلَ ذالكَ علٰى المظاهِرِ والقاتلِ لاَفِى ايامٍ بعينِها بلْ جعلَ الدهرُ كلُّه وقتًا لهَا -

وكذالكَ كفارةُ اليمينِ جعَلهَا اللهُ عزَّ وجلَّ على الحانثِ فِى يمينِه وهىَ اِطعامُ عشرةِ مساكينَ او كسوتُهم اَو تحريرُ رقبةٍ ثم جعلَ اللهُ عزَّوجلَّ لِمنْ فرضَ عليهِ الصلواتِ بالاسبابِ التىْ يتقدمُها والاسبابَ المفعولةَ فِيها فِى ذالكَ عذرًا اِذا منعَ مِنه -

فمِن ذالكَ ما جعلَ لهٗ فى عدمِ الماءِ من سقوطِ الطهارةِ بالماءِ والتيممِ -

ومِن ذالكَ ما جعلَ لِمنْ منعَ من سترِ العورةِ ان يصلىَ بادىَ العورةِ -

ومِن ذالكَ ماجعلَ لمنْ منعَ من القِبلةِ اَن يصلىَ الى غيرِ قبلةٍ -

وَمِنْ ذالكَ ما جعلَ للذىْ منعَ منَ القيَامِ اَن يصلىَ قاعدًا يركعُ ويسجدُ فانِ منعَ من ذالكَ ايضا اَومىٰ ايماءً فجعلَ له ذالكَ وانِ كانَ قد بقىَ عليهِ مِن الوقتِ مَا قديجوزُ اَن يذهبَ عنهُ ذالكَ العذرُ ويعودُ الى حالِه قبلَ العذرِ وهُوَ فِى الوقتِ لم يفُته وكذالكَ جعلَ لِمن لاَ يقدرُ على الصومِ فِى الكفاراتِ التىْ اوجبَ اللهُ عزَّوجلَّ عليهِ فِيها الصومَ لمرضٍ حلَّ بهِ ممَّا قدْ يجوزُ برؤُه منهُ بعدَ ذالِكِ ورجوعُه الىٰ حالِ الطاقةِ لِذالكَ فجعلَ ذالكَ لهٗ عذراً فى اسقاطِ الصومِ عنهُ بهِ ولم يمنعْ مِن ذالكَ اذِا كانَ ماجعلَ عليهِ من الصومِ لا وقتَ لهٗ وكذالكَ فِيمَا ذكرنَا من الاطعامِ فِى الكفاراتِ والعتقِ فِيها والكسوةِ اذاَ كانَ الذىْ فرضَ ذالكَ عليهِ معدِماً وقد يجوزُ ان يجدَ بعدَ ذالكَ فيكونُ قادراً على مَا اوجبَ اللهُ عزَّوجلَّ عليهِ مِن ذالكَ مِن غيرِ فواتٍ لوقتِ شئٍ مِمَّا كانَ اوجبَ عليهِ فعلُه فِيه ـ فلمَّا كانتْ هٰذه الاشياءُ يزولُ فرضُها بالضرورةِ فيْها وانِ كانَ لايخافُ فوتَ وقتِها فجعلَ ذالكَ وماخيفَ فوتَ وقتِه سواءً مِن الصلواتِ فِى اواخرِ اوقاتِها ومَا اشبهَ ذالكَ فالنظرُ علىٰ ماذكرنَا اَن يكونَ كذالكَ العمرةُ وانِ كانَ لاوقتَ لهَا ان يباحَ فِى الضرورةِ فِيها مَايباحُ بالضرورةِ فِى غيرِها ممَّالهٗ وقتٌ معلومٌ ـ فثبتَ بِمَا ذكرْنا قولُ مَن ذهبَ اِلى انَّه قدْ يكونُ الاحصارُ بالعمرةِ كمَا يكونُ الاحصارُ بالحجِّ سواءً وهٰذا قولُ ابىْ حنيفةَ وابىْ يوسفَ ومحمدٍ رحمَهم اللهُ تعالىٰ ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

বান্দার উপর আবশ্যকীয় কাজগুলো দু'প্রকার–

১. যেগুলো আদায়ের জন্য একটি সময় নির্ধারিত আছে, যা ছুটে গেলে সে কাজও ছুটে যায়। কারণ, এর জন্য বিশেষ সময় দেয়া হয়েছে, যাতে বিভিন্ন শর্ত যেমন– পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন, ছতর ঢাকা ইত্যাদি সহকারে কাজটুকু করতে হয়।

২. যে সব কাজের জন্য বিশেষ কোন ওয়াক্ত নেই, বরং সর্বদাই তার ওয়াক্ত। যেমন– জিহারের কাফফারা, রোযার কাফফারা ও হত্যার কাফফারায় যে রোযা রাখতে হয়, তার কোন বিশেষ সময় নেই। আরও যেমন– কসমের কাফফারায় ১০ মিসকীনকে খানা খাওয়ানো বা তাদেরকে পোশাক দান বা একজন গোলাম আযাদ করা, এর জন্য কোন বিশেষ ওয়াক্ত নেই।

আল্লাহ্ তাআলা উভয় প্রকারে ওজর ধর্তব্য রেখেছেন। যেমন– প্রথম প্রকারে নামাযের শর্ত-শরায়েত ও রোকনগুলোতে ওজর ধর্তব্য রেখেছেন। উদাহরণস্বরূপ পানি না পেলে ওযুর হুকুম রহিত হয়ে তায়াম্মুমের হুকুম এসে যায়। ছতর ঢাকার মত কাপড় না পেলে বিবস্ত্র হয়ে নামায পড়া জায়েয হয়ে যায়। কিবলার দিকে ফিরতে না পারলে, অন্য যে কোন দিকে ফিরে নামায পড়তে পারে, দাঁড়াতে না পারলে বসে নামায পড়তে পারে, রুকু-সিজদা করতে না পারলে, ইশারায় নামায পড়তে পারে। শরীয়ত নির্ধারিত ওয়াক্তের আমলগুলোতে ওজর ধর্তব্য রেখেছে। নামাযের উদাহরণ দ্বারা তা স্পষ্ট হল।

অতঃপর দেখতে হবে, যদি কারও নামায সংক্রান্ত কোন ওজর এরূপ সময়ে যুক্ত হয়, যদি সে ওজর না ধরে তাকে সুযোগ না দেয়া হয়, বরং ওজর দূর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার নির্দেশ দেয়া হয়, তবে নামাযের ওয়াক্তই ছুটে যাবে, এমতাবস্থায় যেরূপভাবে ওজর ধর্তব্যে এনে তাকে অবকাশ দিয়েছে, এরূপভাবে যদি তার ওজর এরূপ সময় যুক্ত হয় যে, তা দূরীভূত হওয়ার পর নামাযের ওয়াক্ত বাকি থাকার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, তবে সেখানেও শরীয়ত তা ধর্তব্যে এনে তাকে অবকাশ দিয়েছে। অথচ এখানে এই হুকুম হওয়া অযৌক্তিক ছিল না যে, সে মাজুর ব্যক্তি নিজের ওজর শেষ হওয়ার অপেক্ষা করবে। যেমন– ওজরের কারণে তায়াম্মুম করা, বসে অথবা ইশারায় নামায পড়ার ক্ষেত্রে ওজর আসার সাথে সাথেই অবকাশ গ্রহণ না করে, ওজর দূরীভূত হওয়ার অপেক্ষা করবে। এবার যদি ওজর দূরীভূত না হয়, এরূপভাবে ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা হয়, তবে তখন অবকাশ গ্রহণ করে তায়াম্মুম করে, বসে বা ইশারায় স্বীয় নামায

আদায় করবে। কিন্তু শরীয়ত তাকে এরূপ হুকুম দেয় নি। নির্ধারিত সময়ের আমলগুলোতে ওজর ধর্তব্য হওয়ার উদাহরণ হল এসব। যে সব আমলে সময় নির্ধারিত নেই, সেগুলোতেও ওজর ধর্তব্য হয়।

### ওয়াক্ত অনির্ধারিত আমলে ওজর ধর্তব্য হয়

এরূপ আমলের উদাহরণ– জিহারের কাফফারা, রোযার কাফফারা ও হত্যার কাফফারায় যে রোযা রাখার নির্দেশ রয়েছে, তাতে ওজর ধর্তব্য হয়, চাই সে ওজর দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা থাকুক না কেন, কসমের কাফফারায় খানা খাওয়ানো, পোশাক দেয়া অথবা গোলাম আযাদ করার নির্দেশ রয়েছে, সেখানেও শরীয়ত ওজর ধর্তব্যে এনেছে। যদি সে ব্যক্তির কাছে এ পরিমাণ মাল না থাকে, যদ্বারা কাফফারা আদায় করতে পারে, তখন তার অবকাশ এসে যায়। যদিও সে পরবর্তীতে সম্পদশালী হওয়ার সম্ভাবনা থাকুক না কেন, অথচ সময় অনির্ধারিত থাকার কারণে আমল ছুটে যাওয়ার আশংকা নেই।

যেহেতু উভয় প্রকার আমলে ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা হলে ওজর ধর্তব্য হয়েছে এবং ওয়াক্ত ছুটে যাওয়ার ভয় হওয়া না হওয়া উভয় ছুরতে একই পদ্ধতিতে ওজরকে ধর্তব্যে আনা হয়েছে, সেহেতু আমাদের আলোচ্য উমরায় সময় অনির্ধারিত হওয়ার কারণে যদিও তা ছুটে যাওয়ার আশংকা নেই, তবুও সেখানে ওজর এরূপ পদ্ধতিতেই ধর্তব্য হওয়া উচিত, যেরূপ হজ্জে হয়। তাই বলতে হবে, ওজরের কারণে যেরূপ হজ্জে অবরোধ হয়, ইহরাম ভেঙ্গে হালাল হওয়া যায়, এরূপভাবে উমরাতেও জায়েয হবে। ছুটে যাওয়ার আশংকা হজ্জে থাকা আর উমরায় না থাকার ফলে উভয়ের মাঝে অবরোধের পার্থক্য করা ঠিক হবে না।

### ৩. অবরুদ্ধ ব্যক্তির জন্য কুরবানীর পর হলক করা কি জরুরি?

১. ইমাম আবু হানীফা, মুহাম্মদ, সুফিয়ান সাওরী, নাখঈ র.-এর মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তি কুরবানীর মাধ্যমেই হালাল হয়ে যায়, তার উপর মাথা মুণ্ডানো ইত্যাদি নেই। ইমাম তাহাভী وممن قال ذالك ابو حنيفة رحـ দ্বারা তাঁদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

২. ইমাম আবু ইউসুফ র. থেকে এক রেওয়ায়াত হল, মাথা মুণ্ডানো চাই। অবশ্য যদি না করে, তবে তার উপরে কোন কিছু ওয়াজিব নয়। তাঁর আরেকটি রেওয়ায়াত হল, অবরুদ্ধের জন্য মাথা মুণ্ডানো জরুরি। আতা ইবনে আবু রাবাহ, আবু সাওর, ইমাম তাহাভী র. প্রমুখের মতে কুরবানীর পশু জবাই করার পর

মাথা মুণ্ডন করা মাসনুন। না করলে কোন জরিমানাও আবশ্যক নয়। এটি ইমাম শাফিঈ র.-এরও একটি উক্তি। وقال اخرون بل يحلق الخ দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

৩. ইমামত্রয়, ইসহাক ইবনে ইবরাহীম প্রমুখের মতে, ইমাম শাফিঈ র.-এর একটি উক্তি অনুযায়ী অবরুদ্ধের জন্য মাথা মুন্ডানো বা চুল ছাটা ওয়াজিব। وقال اخرون يحلق ويجب ذالك الخ দ্বারা তাঁদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ইমাম তাহাভী র. এ স্থানে হলক ওয়াজিব– এ মাযহাব অবলম্বন করে যুক্তির আলোকে এটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রথমে ইমাম আবু হানীফা র.-এর প্রমাণ পেশ করেছেন।

فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ ابى حنيفةَ ومحمدٍ فِى ذالكَ اَنه قدْ سقَط عَنه بالاحصارِ جميعُ مناسكِ الحجّ مِنَ الطوافِ والسعىِ بينَ الصفَا والمروةِ وذالكَ مِما يحلُّ المحرمُ بِه مِن احرامِه. اَلاترٰى انّه اذاطافَ بالبيتِ يومَ النحرِحلَّ لَهُ ان يحلقَ فيحلُّ لَهُ بذالكَ الطيبُ واللباسُ والنساءُ، قالُوا فلمَّا كانَ ذالكَ مِما يفعلُه حتى يحلَّ فسقطَ ذالكَ عنهُ كلُّه بالاحصارِ سقَط ايضًا عنهُ سائرُ مايحلُّ بِهِ المحرمُ بسببِ الاحصارِ، هٰذه حجةٌ لابىْ حنيفةَ ومحمدٍ رحمَهم اللهُ تعالٰى ـ

**প্রথম পক্ষের প্রমাণ ঃ**

অবরুদ্ধের কারণে, হজ্জের সমস্ত আহকাম, যেমন– তাওয়াফ ও সাঈ সব রহিত হয়ে যায়। কাজেই হলক (মাথামুণ্ডন)ও রহিত হয়ে যাওয়া উচিত। কারণ, মুহরিমের উপর হজ্জের কয়েকটি কাজ আদায়ের পর হলকের মাধ্যমে হালাল হয়ে যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে। এর ফলে তার জন্য রমণী ছাড়া ইহরামের বাকি সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয় হালাল হয়ে যাবে। অতঃপর তাওয়াফে যিয়ারতের নির্দেশ রয়েছে। এর দ্বারা রমণীও হালাল হয়ে যায়। যেহেতু হলকের পূর্বাপরের সমস্ত কাজ অবরোধের কারণে রহিত হয়ে যায়, অতএব মধ্যবর্তী হলকও রহিত হয়ে যাওয়া উচিত। ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ র. তাই বলেন।

**উক্ত প্রমাণের উত্তর ঃ**

وكان من حجة الاخرين الخ থেকে প্রায় পাঁচ লাইনে প্রথম পক্ষের প্রমাণের উত্তর দেয়া হয়েছে। যার সারনির্যাস হল–

আমরা চিন্তা করে দেখলাম, অবরুদ্ধ অবস্থায় যেসব কাজ একজন মানুষের জন্য করা সম্ভব নয় যেমন– তাওয়াফ, সাঈ, কংকর নিক্ষেপ ইত্যাদি, শুধু এসব কাজ অবরোধের কারণে রহিত হওয়া চাই। এর পরিপন্থী যে সব কাজ আদায়ে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই, সেগুলো রহিত হবে না। অবরোধ অবস্থায় মাথা মুণ্ডানোর কোন প্রতিবন্ধকতা নেই, কাজেই অবরুদ্ধ ব্যক্তি থেকে হলক ওয়াজিবের হুকুম রহিত হবে না। যুক্তির দাবি তাই বুঝা যায়।

**ইমাম আবু ইউসুফ র. প্রমুখের প্রমাণ ঃ**

وقد روى .......... الخ-এ ইবারত দ্বারা (অর্থাৎ অনুচ্ছেদের শেষ পর্যন্ত) দ্বিতীয় দলের প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এর সারনির্যাস হল– মাথা মুণ্ডনের হুকুম এরূপভাবে অবশিষ্ট আছে, যেরূপভাবে বাইতুল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে তার উপর মাথা মুণ্ডন করা আবশ্যক হয়। কারণ হুদাইবিয়াতে সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম মাথা মুণ্ডন করেছিলেন। শুধু একজন আনসারী এবং দু'একজন মুহাজির মাথা মুণ্ডন করেননি।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছেন, 'আল্লাহ্ মাথামুণ্ডনকারীদের প্রতি রহম করুন।' সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, যারা মাথা ছাঁটবে তাদের প্রতি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপরও তিনবার বললেন, আল্লাহ্ মাথামুণ্ডনকারীদের প্রতি রহম করুন। সাহাবায়ে কিরাম বার বার আরজ করতে থাকেন, অবশেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যারা চুল ছাঁটে তাদের প্রতিও রহম করুন। এখানে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারা চুল ছাঁটে তাদের উপর হলককারীদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, যদি এই মাথা মুণ্ডন বা ছাঁটা বৈধ না হত, তবে হলককারী ও কসরকারী সমান হত, কারও উপর কারও শ্রেষ্ঠত্ব হত না। এই শ্রেষ্ঠত্ব দানের ফলে হলক বা মাথা ছাঁটা ওয়াজিব বুঝা যায়।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য আওজাযুল মাসালিক ঃ ৩/৪৫৭; নুখাবুল আফকার ঃ ৭/১৪৫, ১৫৪-১৫৬, ১৬৬, মাআরিফুস সুনান ঃ ৬/৩৪৯, উমদাতুল ক্বারী ঃ ১০/১৪১, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/৫৯০-৬০৮।

## باب حج الصغير

## অনুচ্ছেদ ঃ শিশুর হজ্জ

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. দাউদ জাহিরী, তাঁর অনুসারী ও কোন কোন মুহাদ্দিসের মতে এই হজ্জেই তার ফরয আদায় হয়ে যাবে। বালেগ হওয়ার পর স্বতন্ত্রভাবে তার দায়িত্বে হজ্জ ওয়াজিব থাকবে না। فذهب قوم الى ان الصبي اذاحج الخ দ্বারা তাঁরাই উদ্দেশ্য।

২. ইমাম চতুষ্টয়, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, সুফিয়ান সাওরী, নাখঈ, মুজাহিদ বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মতের মতে নাবালিগের হজ্জও সহীহ। কিন্তু এ হজ্জ নফল হবে, বালেগ হওয়ার পর সামর্থ্য হলে তাকে ফরয হজ্জ স্বতন্ত্রভাবে আদায় করতে হবে। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَكَانَ مِن الحجةِ لهُم عندَنا على اهلِ المقالةِ الاولى اَنَّ هٰذا الحديثَ انما فِيه انَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم اخبرَ اَن للصبِي حجًّا وهٰذا مِمَّا قَد اجمعَ الناسُ جميعًا عليهِ وَلم يختلفُوا اَن للصبيِّ حجًّا كمَا اَنَّ لهٗ صلوةً وليستْ تلكَ الصلوٰةُ بفريضةٍ عليهِ فكذالكَ ايضا قَد يجوزُ اَن يكونَ لهٗ حجٌّ وليسَ ذالكَ الحجُّ بفريضةٍ عليهِ -

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

যদি কোন নাবালিগ শিশু ওয়াক্ত আসার পর সে ওয়াক্তের নামায পড়ে, অতঃপর ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পূর্বেই বালিগ হয়ে যায়, তবে যেহেতু সে ওয়াক্তের ভিতরে বালিগ হয়েছে, এজন্য তার উপর এই ওয়াক্তের নামায আবশ্যক হয়েছে। এমতাবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর দ্বিতীয়বার এই ওয়াক্তের নামায পড়া জরুরি। পূর্বে পঠিত নামায তার জন্য যথেষ্ট নয়। যেটি বালিগ হওয়ার পূর্বে পড়েছিল। এরূপভাবে বালিগ হওয়ার পূর্বেকার হজ্জ, বালিগ হওয়ার পর তার জন্য যথেষ্ট হবে না।

**প্রথম দলের প্রমাণের উত্তর ঃ**

وكان من الحجة لهم عندنا على اهل المقالة الاولى الخ ـ

এখানে প্রায় ১২ লাইনে প্রথম দলের প্রমাণের উত্তর দেয়া হয়েছে। এর সার নির্যাস হল বাচ্চার পক্ষ থেকে সর্বসম্মতিক্রমে হজ্জ সহীহ। যেরূপভাবে নামায ফরয না হওয়া সত্ত্বেও তার হজ্জ সহীহ ও ধর্তব্য এবং সে এর সওয়াব পায়। কিন্তু সে হজ্ব ফরয নয়, নফল। উপরোক্ত হাদীস দ্বারা শুধু হজ্জ সহীহ বলে প্রমাণিত হয়। এবং এ হজ্জ ফরয রূপে আদায় হওয়ার কথা উপরোক্ত হাদীস দ্বারা কোন ক্রমেই প্রমাণিত হয়। অবশ্য যারা হজ্জের বিশুদ্ধতাকে অস্বীকার করে তাদের পরিপন্থী এটি দলীল হতে পারে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের বিপরীতে প্রমাণ হতে পারে না। কারণ, তারা তো হজ্জের বিশুদ্ধতার প্রবক্তা। কাজেই প্রথম দল হাদীসের যে অর্থ বুঝেছে সেটি সহীহ নয়। স্বয়ং এ হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এ হজ্জ ফরয হজ্জ রূপে আদায় হবে না। বরং বালিগ হওয়ার পর তাকে ফরয হজ্জ অবশ্যই আদায় করতে হবে। হযরত ইবনে আব্বাস রা. সমাবেশে লোকজনকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমরা যা বল, তা আমার কাছ থেকে শুনে নাও এরূপ করনা যাতে ভিন্ন রকম কিছু মনে করে অন্যদের কাছে বর্ণনা করতে আরম্ভ কর। অতঃপর বলেন, যে বাচ্চা তার পরিবারের সাথে হজ্জ করে অতঃপর (সে পরিবার) মরে যায় তার পর সে বাচ্চা বালেগ হয়ে যায়, তার উপর পুনরায় হজ্জ করা আবশ্যক। আর যে গোলাম, স্বীয় মনিবের সাথে হজ্জ করে, অতঃপর সে মনিব মারা যায়, এরপর সে গোলাম আযাদ হয়ে যায়, তার উপর পুনরায় হজ্জ করা আবশ্যক এবং তোমরা নিজেরাও বল, যে হাদীস বর্ণনা করে সেই হাদীসের অর্থ বেশি জানে।

প্রথম অনুচ্ছেদের হাদীসের বর্ণনাকারী ইবনে আব্বাস রা. যেহেতু নিজেই বলেছেন, বাচ্চার হজ্জ ফরযরূপে আদায় হবে না, সেহেতু তোমাদের দাবী প্রমাণিত হবে না।

فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ فَمَا الذِىْ دَلَّك عَلٰى اَنَّ ذالِكَ الحَجَّ لَايُجْزِيه مِن حَجَّةِ الاسلامِ ـ

**একটি প্রশ্ন ঃ**

একটি প্রশ্ন হল, আপনি কিভাবে জানতে পারলেন, বাচ্চার হজ্জ ইসলামী হজ্জ তথা ফরয হজ্জরূপে আদায় হবে না?

**উত্তর ঃ** قلتُ قولُ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ رفعَ القلمُ عن ثلثةٍ عنِ الصغيرِ حتى يكبَرَ الحديث الخ . এর উত্তর হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিন প্রকার লোক থেকে শরঈ বিধি বিধান ও ইসলামী ফারায়েযের কলম তুলে নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাদের উপর বিধিবিধানের দায় দায়িত্ব নেই। কাজেই ইসলামী ফারায়েযের বিধান তাদের উপর বাস্তবায়িত হবে না। অতএব যদি কেউ কোন হুকুম আদায় করে তবে তা হবে নফল। সে তিনজন লোক হল– ১. শিশু, ২. পাগল ও ৩. ঘুমন্ত ব্যক্তি (বুখারী ঃ ২/৭৯৪)

যেহেতু তার উপর ফারায়েযের দায় দায়িত্ব নেই, সেহেতু তার উপর হজ্জও ফরয হবে না। অতএব, যখন সে হজ্জ করবে সেটি তার পক্ষ থেকে হবে নফল। যেমনিভাবে বাচ্চা ফরয নামায আদায় করলে সে ওয়াক্তে বালিগ হয়ে গেলে তার উপর নামায পুনরায় পড়া আবশ্যক হয় এবং তাকে সর্বসম্মতিক্রমে সে লোকের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়, যে নামায পড়েনি, কাজেই হজ্জের হুকুমও অনুরূপ হবে। বালেগ হওয়ার পূর্বে হজ্জ অনাদায়কারীদের অন্তর্ভুক্তই তাকে মনে করা হল। বালেগ হওয়ার পর পুনরায় তার উপর হজ্জ করা আবশ্যক।

فَان قالَ قائلٌ فقد رأينا فِى الحج حكمُه يخالفُ حكمَ الصلٰوةِ وذالكَ اَنّ اللهَ عزوجلَّ اِنما اوجبَ الحجَّ علٰى مَن وجدَ اليهِ سبيلاً ولم يُوجبهُ علٰى غيرِه فكانَ مَن لم يجدْ سَبيلاً الٰى الحجّ فلاَ حجَّ عَليهِ كالصبيِّ الذىْ لم يبلغْ ثم قداَجمعُوا اَن مَن لَم يَجِدْ سَبيْلاً اِلى الحجّ فحمَلَ على نفسِه ومشٰى حتّٰى حجَّ اَن ذالكَ يُجزيه واِن وجَدالَيهِ سبيلاً بعدَ ذالكَ لم يجبْ عليه اجزاَه ذالكَ ولمْ يجبْ عليهِ ان يحجَّ ثانيةً للحجةِ التىْ قد كانَ حجَّهَا قبلَ وجوده السبيلَ، فكانَ النظرُ على ذالكَ ان يكونَ كذالكَ الصبىُّ اِذا حجَّ قبلَ البلوغِ ففعلَ مَالم يجبْ عليهِ اجزاَه ذالكَ ولم يجبْ عليهِ ان يحجَّ ثانيةً بعدَ البلوغِ .

قِيلَ لهُ اِن الذىْ لا يجدُ السبيلَ انما سقَط الفرضُ عنهُ لعدمِ الوصولِ الى البيتِ، فاِذاَ مشٰى فصارَ الٰى البيتِ فقد بلغَ البيتَ وصارَ من الواجِدينَ للسبيلِ فوجبَ الحجُّ عليهِ لذالكَ، فلذالكَ قُلنَا اِنه اجزاَه حجُّهُ ولاِنه صارَ بعدَ بلوغِهِ البيتَ كمنْ كانَ منزلُه هنالكَ فعليهِ الحجُّ، وامَّا الصبىُّ ففرضُ الحجِّ غيرُ واجبٍ عليهِ قبلَ وصولِه الى البيتِ وبعدَ وصولِه اليهِ لِرفعِ القلمِ عَنه، فاِذا بلغَ بعدَ ذالكَ فحينئذٍ وجبَ عَليه فرضُ الحجِّ، فلذالكَ قلنَا اِنما قدْ كانَ حجَّه قبلَ بلوغِهِ لَايجزِيه وانَّ عليهِ ان يستأنِفَ الحجَّ بعدَ بلوغِهِ كمنْ لم يكنْ حجَّ قبلَ ذالكَ فهٰذا هوَ النظرُ ايضًا فى هٰذا البابِ وهوَ قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحـ ـ

**আরেকটি প্রশ্ন ও এর উত্তর ঃ**

প্রশ্ন হতে পারে, হজ্জের একটি মাসআলা নামাযের পরিপন্থী। অতএব, হজ্জকে নামাযের উপর কিয়াস করা সহীহ নয়। মাসআলাটি হল, হজ্জ আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ ব্যক্তির উপর ফরয করেছেন, যে যানবাহন ও পাথেয়ের সামর্থ্য রাখে, যার তা নেই, তার উপর হজ্জ ফরয নয়। যেমন– নাবালিগের উপর হজ্জ ফরয নয়। অতঃপর এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, যদি এরূপ ব্যক্তি কষ্ট করে পায়ে হেঁটে হজ্জে যায়, যার পাথেয় ও বাহন নেই, তার জন্য এই হজ্জ যথেষ্ট হবে। পাথেয়ের সামর্থ্য হওয়ার পর তাকে পুনরায় হজ্জ করতে হবে না। পাথেয়ের সামর্থ্য হওয়ার পূর্বেকার হজ্জই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। এরূপভাবে বালিগ হওয়ার পূর্বেকার হজ্জও পরের হজ্জের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত। যুক্তির দাবি তাই।

**উত্তর ॥** পাথেয়ের উপর অসামর্থ্যবান-অক্ষম ব্যক্তির উপর এজন্য হজ্জ ফরয হয়নি যে, সে বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে অক্ষম। এখন যেহেতু সে পায়ে হেঁটে বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, তাই সে অক্ষমদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব, যদিও বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার আগে তার উপর হজ্জ ফরয ছিল না, কিন্তু সেখানে পৌঁছামাত্রই তার উপর হজ্জ ফরয হয়ে গেছে, কাজেই সে ফরয হজ্জ আদায় করেছে, নফল নয়। অতএব, ফরয হজ্জের দায়িত্ব খতম হয়ে গেছে।

তাছাড়া এ ব্যক্তি বাইতুল্লাহয় পৌঁছার পর সে লোকের মত হয়ে গেছে, যার বাড়ি সেখানে। কাজেই তার উপর হজ্জ ফরয হবে, কিন্তু নাবালিগের উপর বাইতুল্লাহয় পৌঁছার পূর্বে যেমন হজ্জ ফরয ছিল না, তেমনিভাবে পৌঁছার পরেও নয়। কারণ, বাইতুল্লাহয় পৌঁছার পূর্বে যেরূপ গায়রে মুকাল্লাফ ছিল, সেখানে পৌঁছার পরও সে অনুরূপই। বরং বালিগ হওয়ার পরে তার উপর হজ্জ ফরয হবে। কাজেই তার হজ্জ নফল হবে। বালিগ হওয়ার পর সামর্থ্য হলে স্বতন্ত্রভাবে তাকে ফরয হজ্জ করতে হবে। যুক্তির দাবি তাই।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য মাআরিফুস সুনান ঃ ৬/৩১২, উমদাতুল ক্বারী ঃ ১০/২১৬, মুগনী ঃ ৩/১০৪, নববী ঃ ১/৪৩১, আওজাযুল মাসালিক ঃ ৩/৫৮৪, বযলুল মাজহুদ ঃ ৩/৮৩, নুখাবুল আফকার ঃ ৭/১৭৮, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/৬০৮-৬১৪।

## باب دخول الحرم هل يصلح بغير احرام؟

## অনুচ্ছেদ ঃ ইহরাম ছাড়া হেরেমে প্রবেশ করতে পারে কিনা?

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. ইমাম যুহরী, হাসান বসরী ইবনে ওয়াহাব, ইমাম বুখারী, দাঊদ ইবনে আলী র. প্রমুখের মতে হেরেমের ভিতর ইহরাম ছাড়া প্রবেশ করা জায়েয। এটি ইমাম শাফিঈ র. এর একটি উক্তি, ইমাম মালিক র. এর একটি রেওয়ায়াত। فذهب قوم الى انه لاباس بدخول الحرم الخ দ্বারা তাঁরাই উদ্দেশ্য।

২. আতা ইবনে আবু রাবাহ, ইবরাহীম নাখঈ, তাউস ও ইমাম তাহাভী র.-এর মতে হেরেমের বাইরে অবস্থানকারী চাই মীকাতের পূর্বে হউক বা পরে তাদের জন্য ইহরাম ব্যতীত হেরেমে প্রবেশ করা জায়েয নেই। فقال بعضهم وكذالك الناس جميعا الخ দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ও আহমদ, হাসান ইবনে হাই, আওযাঈ র. প্রমুখের মতে, ইমাম মালিক র. এর বিশুদ্ধ উক্তি, ইমাম শাফিঈ র. এর প্রসিদ্ধ উক্তি অনুযায়ী মীকাতের বাইরের কোন লোকের জন্য ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা এবং হেরেমে প্রবেশ করা জায়েয নেই। চাই সে হজ্জ বা উমরার ইচ্ছা করুক বা নাই করুক। অবশ্য যাকে একদিনে হেরেমে কয়েকবার প্রবেশ করতে হয়, তার উপর ইহরাম বাঁধার হুকুম নেই। বস্তুত যাদের বাড়ি মীকাত এবং মক্কা শরীফের মাঝে, তাদের জন্য ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করা জায়েয আছে, যখন হজ্জ বা উমরার ইচ্ছা না হবে। বাকি রইল যারা

মীকাতেই থাকবে, যেমন যুলহুলাইফা, জুহফা। কারণ, যাতেইরক এবং ইয়ালমলমের বাসিন্দাদের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করা জায়েয আছে, যখন হজ্জ বা উমরার ইচ্ছা না হবে। وقال اخرون من كان منزله فى بعض الميقات الخ দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৪. ইমাম আহমদ, আবু সাওর র.-এর মতে এবং ইমাম শাফিঈ র.-এর এক উক্তি এবং ইমাম মালিক র.-এর এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী মীকাতওয়ালারা মীকাতের পূর্বেকার লোকদের ন্যায় মীকাতের বাইরের আফাকীদের পর্যায়ভুক্ত হবে। তাদের জন্যও হেরেমে প্রবেশ করার নিয়তে মীকাত অতিক্রম করা জায়েয নেই। وقال اخرون اهل المواقيت حكمهم الخ দ্বারা তাঁরাই উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় ও চতুর্থ দলের দাবী প্রায় একই। গ্রন্থকার শেষোক্ত তিন মাযহাব পন্থীদেরকে وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা বুঝিয়েছেন। কারণ, এই তিন মাযহাব পন্থীগণ মোটামুটি ইহরাম ছাড়া হেরেমে প্রবেশকে না জায়েয বলেন।

ইমাম তাহাভী র. এর মতে মীকাতের বাসিন্দাদের জন্য ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করা জায়েয নেই। কাজেই তাদের হুকুম সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে মীকাতের ভেতরের অধিবাসীদের ন্যায়, ইমাম তাহাভী র. এর মতে তাদের হুকুম মীকাতের বাইরের অধিবাসীদের ন্যায়।

ثُم احتجْنَا بعدَ هٰذا اِلى النظرِ فِى حكمِ مَن بعدَ المواقيتِ اِلى مكةَ هَل لهُم دخولُ الحرم بغيرِ احرامٍ ام لاَ؟ فرأينَا الرجلَ اِذا ارادَ دخولَ الحرمِ لم يدخلْه اِلّاَ باحرامٍ وسواءٌ ارادَ دخولَ الحرمِ لِاحرامٍ او لحاجةٍ غيرِ الاحرامِ ورأينَا مَن ارادَ دخولَ تلكَ المواضعِ التىْ بينَ المواقيتِ وبينَ الحرمِ لِحاجةٍ انَّ لهُ دخولَها بغيرِ احرامٍ، فثبتَ بذٰلكَ اَنَّ حكمَ هٰذه المواضعِ اِذا كانتْ تدخلُ للحوائجِ بغيرِ احرامٍ كحكمِ قبلَ المواقيتِ وان اهلَها لايدخلونَ الحرامَ اِلا كمَا يدخلهُ مَن كانَ اهلَه وراءَ المواقيتِ الى الاُفاقِ فهٰذا هوَ النظرُ عندىْ فِى هذا البابِ وهوَ خلافُ قولِ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمَهم اللهُ تعالىٰ -

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

যে হজ্জের ইচ্ছা করবে, সে যদি ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করে, তার উপর হুকুম হল, ফিরে গিয়ে মীকাত থেকে ইহরাম বেঁধে আসা। এবার যদি এ ব্যক্তি মীকাত থেকে ফিরে আসা ছাড়া মীকাতের ভিতরেই ইহরাম বাঁধে এবং হজ্জের কাজ করে তবে এটা মন্দ কাজ হবে। এর ফলে তার উপরে একটি দম ওয়াজিব হবে। যে ব্যক্তি হজ্জের ইচ্ছায় রওয়ানা করে মীকাতে পৌঁছে ইহরাম বাঁধে তাকে মুহসিন (ভাল কাজ সম্পাদনকারী) সাব্যস্ত করা হয়। সে অন্যায় কাজ করেছে এ কথা বলা হয় না। যে ব্যক্তি মীকাতে পৌঁছার পূর্বে যেমন স্বীয় ঘরে অথবা রাস্তায় ইহরাম বাঁধে, তাকেও ভাল কাজ সম্পাদনকারী বলা হয়, মন্দ কাজ সম্পদানকারী নয়। অতএব যেহেতু মীকাতে ইহরাম বাঁধা মীকাতের বাইরের ইহরামের মত, মীকাতের ভিতরের ইহরামের মত নয়, সেহেতু মীকাতের বাসিন্দাদের হুকুমও মীকাতের বাইরের বাসিন্দাদের মত হবে, মীকাতের ভিতরের বাসিন্দাদের মত নয়। অতএব, যারা মীকাতের বাইরে থাকে, তাদের জন্য ইহরাম ছাড়া হেরেমে ঢুকা যেমন জায়েয নেই, মীকাতের বাসিন্দাদের জন্যও ইহরাম ছাড়া হেরেমে প্রবেশ করা জায়েয হবে না।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য উমদাতুল ক্বারী ঃ ৯/২২৪, ১০/২০৫, আওজাযুল মাসালিক ঃ ৩/৭৩০, মাআরিফুস সুনান ঃ ৬/৯২, নুখাবুল আফকার ঃ ৭/১৯৪, মুগনী ঃ ৩/১১৭, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ ১/৩২৫, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/৬১৪-৬২৯।

## باب الرجل يوجه بالهدى الى مكة ويقيم في اهله هل يتجرد اذا قلد الهدى؟

## অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মক্কা অভিমুখে কুরবানীর পশু পাঠায় এবং নিজের পরিবারে অবস্থান করে সে পশুর গলায় হার লাগালে নিজে মুহরিমের হুকুমে থাকবে কিনা?

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

মিনায় যবেহ করার জন্য কুরবানীর পশুতে কোন নিদর্শন (যেমন, গলায় হার বাঁধা অথবা আহত করা) লাগিয়ে হেরেমের দিকে প্রেরণ করা নেক কাজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রা. এর সাথে কুরবানীর পশু পাঠিয়েছিলেন। এবার এ ব্যক্তি শুধু কুরবানীর পশু প্রেরণের ফলেই মুহরিম হয়ে যাবে কিনা?

১, হযরত কায়েস ইবনে সা'দ, ইবনে উমর রা., ইবরাহীম নাখঈ, আমির শাবী, হাসান বসরী, মুজাহিদ সাঈদ ইবনে জুবাইর, আতা, ইবনে সীরীন র. এবং আরেকটি দল থেকে বর্ণিত আছে যে, তাদের মতে হেরেমের দিকে কুরবানীর জন্তু পাঠালেই কোন ব্যক্তি মুহরিম হয়ে যায়। চাই সে কুরবানীর পশু পাঠিয়ে নিজের ঘরেই অবস্থান করুক না কেন। এবছর তার হজ্জ বা উমরা করার ইচ্ছা না হলেও সে মুহরিমের পর্যায়ভুক্ত থাকবে। অতএব, ইহরামে নিষিদ্ধ সবকিছু থেকে তাকে পরহেয করতে হবে যতক্ষণ না সমস্ত লোক হজ্জ থেকে অবসর হয়। অন্যরা যখন হজ্জের কাজ থেকে অবসর হবে, তখন তার উপর হালাল হওয়ার হুকুম আসবে। فذهب قوم الى ان الرجل اذا بعث الخ দ্বারা তাঁরাই উদ্দেশ্য।

২. ইমাম চুতষ্ঠয়, ইসহাক ইবনে ইবরাহীম, আওযাঈ, সুফিয়ান সাওরী, দাউদ জাহিরী তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামের মতে শুধু হজ্জ বা উমরার ইহরাম বাঁধলেই কেউ মুহরিম হয়। কুরবানীর পশু প্রেরণের ফলে কেউ মুহরিম হয় না এবং ইহরামে নিষিদ্ধ বস্তু থেকে বেঁচে থাকাও জরুরি হয় না। ইমাম তাহাভী র. সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে যুক্তি পেশ করেন। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَان كَانَ ذَالِكَ يُؤخَذُ مِن طَرِيقِ النَّظَرِ فَانَّا قَدرَأينَا الَّذِينَ يَذهَبُونَ الَىٰ حَدِيثِ جَابِرٍ رضـ يَقُولُونَ اِنَّ الحُرمَةَ الَّتِى تَجِبُ عَلىٰ بَاعِثِ الهَديِ بِتَقلِيدِهِ اِيَّاهُ وَاِشعَارِهٖ فَيَحِلُّ عَنهُ اِذَا اَحَلَّ النَّاسُ بِغَيرِ فِعلٍ يَفعَلُهُ هُوَ فَيَحِلُّ بِهٖ، فَارَدنَا ان نَّنظُرَ فِى الاِحرَامِ المُتَّفِقِ عَلَيهِ هَل هُوَ كَذَالِكَ اَم لَا؟ فَرَأينَا الرَّجُلَ اِذَا اَحرَمَ بِحَجٍّ اَوعُمرَةٍ فَقَد صَارَ مُحرِمًا اِحرَامًا مُتَّفَقًا عَلَيهِ وَرَاَينَا غَيرَ خَارِجٍ مِن ذٰلِكَ الاِحرَامِ اِلَّا بِاَفعَالٍ يَفعَلُهَا فَيَحِلُّ بِهَا مِنهُ وَلَا يَحِلُّ بِغَيرِهَا۔

اَلَاتَرىٰ اَنَّهُ اِذَا كَانَ حَاجًّا فَلَم يَقِف بِعَرفَةَ حَتّٰى مَضىٰ وَقتُهَا اَنَّ الحَجَّ قَد فَاتَهُ وَلَا يَحِلُّ اِلَّا بِفِعلٍ يَفعَلُهُ مِنَ الطَّوَافِ بِالبَيتِ وَالسَّعيِ بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ وَالحَلقِ اَوِ التَّقصِيرِ وَلَو وَقَفَ بِعَرفَةَ

وفعلَ جميعَ مَايفعلُه الحاجُّ غيرَ الطوافِ الواجبِ لم يحلَّ له النساءُ ابداً حتى يطوفَ الطوافَ الواجبَ، وكذالكَ العمرةُ لايحلُّ مِنها ابداً اِلابالطوافِ بالبيتِ والسعيِ بينَ الصفا والمروةِ والحلقِ الذىْ يكونُ منهُ بعدَ ذالكَ، فكانتْ هٰذه احكامُ الاحرامِ المتفقِ عليهِ لايخرجُه منه مرورُمدةٍ وانما يخرجُه منه الافعالُ وكانَ مَن احرمَ بعمرةٍ وساقَ الهدىَ وهو يريدُ التمتعَ فطافَ لعمرتِه وسعىٰ لَم يحلَّ حتّٰى يفرغَ مِن حجهٖ وينحَر الهدىَ ـ

فكانتْ هٰذه حرمةٌ زائدةٌ بسببِ الهدىِ لِانهٗ لولاَ الهدىُ لكانَ اِذا طافَ لِعمرتِه وسعىٰ حلَقَ وحلَّ لهٗ فِانمَا منعَه مِن ذالكَ الهدىُ الذى ساقَه ثم كانَ احلالُه مِن تلكَ الحرمةِ ايضًا اِنما يكونُ بفعلٍ يفعلُه لابمرورِ وقتٍ فكانتْ هٰذه احكامُ الاحرامِ المتفقِ عليهِ لايخرجُ مِنها بمرورِ الاوقاتِ ولا بافعالٍ غيرهٖ ولكنْ بافعالٍ يفعلُها هوَ وكانَ مَن بعثَ بهدىٍ واقامَ فى اهلِه وامرَ ان يقلدَ ويشعرَفوجبَ عليهِ بذٰلكَ التجريد فِى قولِ مَن يوجبُ ذالكَ يحلُّ مِن تلكَ الحرمةِ لَابفعلٍ يفعلُه ولكنْ فِى وقتٍ مايحلُّ الناسُ فخالفَ ذالكَ الاحرامَ المتفقَ عليه فِلم يجدْ ثبوتَه لذٰلكَ لِانه انَّما يثبتُ الاشياءَ المختلفَ فيها اِذا اشبهتِ الاشياءَ المجتمعَ عليهَا، فاِذا كانتْ غيرَ مشبهةٍ لَها لم يثبتْ اِلا ان يكونَ معهَا التوقيفُ الذىْ يقومُ بهٖ الحجةُ فيجبُ القولُ بِهَا لذٰلكَ،فاِذا وجبَ ذالكَ انتفىٰ الاختلافُ فثبتَ بِما ذكرنَا صحّةُ قولِ مَن ذهبَ الى حديثِ عائشةَ رضـ وفسادُ قولِ مَن خالَف ذٰلكَ اِلى حديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضـ وهٰذا قولُ ابى حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمهم اللهُ تعالىٰ ـ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

যাদের দাবি শুধু কুরবানীর জন্তু পাঠালেই মুহরিম হয়ে যায়, তাদের মতে জন্তু পাঠালে তখন হালাল হবে, যখন অন্যরা হজ্জ করে ইহরাম খুলে হালাল হয়ে যাবে। অন্যদের হালাল হওয়ার সাথে সাথেই তার উপর হালাল হওয়ার হুকুম আসবে। তাকে হালাল হওয়ার জন্য কিছু করতে হবে না। অথচ সর্বসম্মত মুহরিম, যে হজ্জ বা উমরার ইহরাম বেঁধেছে, সে শুধু ওয়াক্ত শেষ হলেই হালাল হতে পারে না, বরং কিছু কাজ করে তাকে হালাল হতে হয়। যেমন– হজ্জের ইহরামওয়ালা ব্যক্তি আরাফায় অবস্থান না করার ফলে হজ্জ ছুটে গেলে শুধু হজ্জ ছুটে যাওয়ার কারণে সে হালাল হতে পারে না, বরং তাকে অবশিষ্ট কাজগুলো তথা মাথামুণ্ডন অথবা মাথা ছাঁটা এবং তাওয়াফের মাধ্যমে হালাল হতে হবে, কেউ হজ্জের সবগুলো কাজ করেও তাওয়াফে যিয়ারত না করলে তার জন্য স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস হালাল হবে না। এরূপভাবে উমরার ইহরামকারী তাওয়াফ, সাঈ ও হলক ব্যতীত হালাল হতে পারে না। যদি তাওয়াফ, সাঈ করে, তবে হলক বা কসর করা ব্যতীত হালাল হতে পারে না।

বুঝা গেল, কেউ শুধু সময় শেষ হওয়ার ফলে হালাল হতে পারে না, বরং হালাল হওয়ার জন্য কিছু কাজ করতে হয়। যে ব্যক্তি উমরার ইহরাম বেঁধে কুরবানীর পশু পাঠিয়েছে, সে তামাত্তুর নিয়ত করলে শুধু উমরার কাজ তথা তাওয়াফ, সাঈ করে হালাল হতে পারে না, যতক্ষণ না সে হজ্জের সমস্ত কাজ সম্পাদন করবে। শুধু তাওয়াফ ও সাঈ দ্বারা তার হালাল না হওয়ার কারণ সে কুরবানীর পশু পাঠিয়েছে এবং তামাত্তুর নিয়ত করেছে। এই তামাত্তুকারী স্বীয় ইহরাম থেকে নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হলে হালাল হতে পারে না, বরং হজ্জের কাজ করে মাথা মুণ্ডন বা ছাঁটার মাধ্যমে তাকে হালাল হতে হয়।

এ হল সর্বসম্মত ইহরামের বিধান যে, সময় অতিক্রান্ত হওয়ার ফলে কেউ হালাল হয় না, এর জন্য কিছু কাজ করতে হয়। এদিকে যে ব্যক্তি কুরবানীর পশু পাঠিয়ে নিজের পরিবারে অবস্থান করে, তার সম্পর্কে এই বক্তব্য রাখা ঠিক নয় যে, সে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার ফলে হালাল হয়ে যায়, অন্যদের ইহরাম যখন শেষ হবে, সে তার ইহরাম থেকে তখন হালাল হবে, তাকে কিছু করতে হবে না। কারণ, এটা ইহরামের সর্বসম্মত হুকুমের খেলাফ। যদ্বারা বুঝা যায়, শুধু কুরবানীর পশু পাঠালে মানুষ মুহরিম হয় না, অন্যথায় হালাল হওয়ার জন্য তাকে কিছু করতে হত। অতএব, সংখ্যাগরিষ্ঠের মত প্রমাণিত হল।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য মাআরিফুস সুনান ঃ ৬/২৬২, আওজাযুল মাসালিক ঃ ৩/৫৩৯, নায়লুল আওতার ঃ ৪/৩৩৮, নববী ঃ ১/৪২৫, উমদাতুল ক্বারী ঃ ১০/৩৭, নুখাবুল আফকার ঃ ৭/২২৫-২২৮, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/৬৩২-৬৩৯।

## باب نكاح المحرم

## অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিমের বিয়ে

**মাযহাবের বিবরণ ঃ**

১. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, সালিম ইবনে আবদুল্লাহ, কাসিম ইবনে মুহাম্মদ, সুলাইমান ইবনে ইয়াসার, লাইস, আওযাঈ র. ও ইমামত্রয়ের মতে ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করা না জায়েয ও বাতিল। আকদই সহীহ হবে না। গ্রন্থকার فذهب قوم الى هذا الحديث الخ দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন।

২. আতা ইবনে আবু বারাহ, হাকাম ইবনে উমাইয়া, হাম্মাদ, ইবরাহীম নাখঈ, সুফিয়ান সাওরী, ইকরামা মাসরূক র. ও হানাফীদের মতে ইহরাম অবস্থায় যদিও বিয়ে করা সমীচীন নয়; কিন্তু করে ফেললে আকদ সহীহ হয়ে যাবে। কিন্তু সহবাস করা হারাম হবে। وخالفهم فى ذالك اخرون দ্বারা তাঁদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

فَامَّا النظرُ فى ذالكَ فاِنَّ المحرمَ حرامٌ عليهِ جماعُ النساءِ فاحتملَ ان يكونَ عقدُ نكاحِهن كذٰلكَ، فنظرنَا فِى ذٰلكَ فوجدنَا هُم قَد اَجمعُوا انَه لَابأسَ على المحرِمِ بان يبتاعَ جاريةً ولكنْ لايطأُها حتّٰى يَحِلَّ ولابأسَ بان يَشتريَ طيبًا لِيتطيَّبَ بِه بعدَ مَايحلُّ ولابأسَ بِان يشتريَ قميصًا ليلبسَه بعدَ مايحلُّ وذالكَ الجماعُ والتطيبُ واللباسُ حرامٌ عليهِ كلُّه وهوَ محرمٌ فلمْ يكنْ حرمةُ ذالكَ عليهِ تَمنعُه عقدَ الملكِ، ورأينَا المحرمَ لايشتريْ صيدًا، فاحتملَ اَن يكونَ حكمُ عقدِ النكاحِ كحكمِ عقدِ شِرى الصيدِ اَو كحكمِ عقدِ شراءِ ماوصفنَا مِمَّا سوٰى ذالكَ، فنظرنَا فى ذالكَ فاذَا مَن احرمَ وفى يدهٖ صيدٌ امرَ ان يُطلِقَه ومن احرمَ وعليهِ قميصٌ وفى يدهٖ طيبٌ امِرَ ان يطرَحَه عنهُ ويرفعَه ولم يكنْ ذَالكَ كالصيدِ الذىْ يؤمرُبتخليتِه ويتركُ حبسُه.

ورأيناهُ اِذا احرمَ ومعَه امرأةٌ لم يؤمرْ باطلاقِها بَل يؤمرُ بِحفظِها فكانتِ المرأةُ فى ذلكَ كاللباسِ والطيبِ لاكالصيدِ فالنظرُ على ذالكَ اَنْ يكونَ فى استقبالِ عقدِ النكاحِ عليهَا فِى حكمِ استقبالِ عقدِ الملكِ على الثيابِ والطيبِ الذى يحلُّ لهٗ به لبسُ ذالكَ واستعمالُه بعدَ الخروجِ مِن الاحرامِ

**যৌক্তিক প্রমাণ ঃ**

ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা হারাম। হতে পারে সহবাসের ন্যায় বিয়ের আকদ করাও হারাম। এ বিষয়ে আমরা চিন্তা করলে দেখতে পেলাম, সর্বসম্মতিক্রমে ইহরাম অবস্থায় যদিও সহবাস নিষিদ্ধ, কিন্তু কোন বাঁদী ক্রয় করা নিষিদ্ধ নয়। সুগন্ধি বা সেলাইকৃত কাপড় ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হলেও পরবর্তীতে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ইহরাম অবস্থায় এগুলো ক্রয় করা নিষিদ্ধ নয়। অতএব, ইহরাম অবস্থায় সহবাস করা, সুগন্ধি লাগানো, সেলাইকৃত কাপড় পরা যদিও নাজায়েয, কিন্তু এগুলোর মালিক হওয়া, এগুলো অর্জনের উদ্দেশ্যে ক্রয় চুক্তি করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয ও সহীহ। তবে শিকারের বিষয়টি আলাদা। ইহরামের অবস্থায় কোন জন্তু শিকার করা যেমন নাজায়েয ও নিষিদ্ধ, অনুরূপভাবে তা ক্রয় করাও নিষিদ্ধ। এখানে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. বিয়ে বন্ধনের হুকুম বাঁদী, সুগন্ধি ও সেলাইকৃত কাপড়ের চুক্তির হুকুমের মত।

২. অথবা তার হুকুম শিকার জন্তুর চুক্তির মত।

আমরা চিন্তা করে দেখলাম, যদি কেউ এমতাবস্থায় ইহরাম বাঁধে যে, তার হাতে শিকার রয়েছে, তবে তাকে শিকার ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। হাত থেকে ছেড়ে অন্য জায়গায় বেঁধে রাখার অনুমতি দেয়া হয় না। যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় ইহরাম বাঁধে যে, তার হাতে কোন সুগন্ধি অথবা তার দেহে কোন সেলাইকৃত পোশাক রয়েছে, তবে তাকে তা খুলে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়, ছুড়ে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয় না, যাতে সে জিনিস তার মালিকানা ও হেফাজতের বাইরে চলে যায়, বরং তাকে উঠিয়ে নিজের দায়িত্বে রাখার অনুমতি দেয়া হয়। এদিকে আমরা দেখছি, কেউ যদি এমতাবস্থায় ইহরাম বাঁধে যে, তার হাতে তার স্ত্রী, তখন সে ব্যক্তিকে আপন স্ত্রীকে তালাক দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয় না, বরং তার হেফাজতের নির্দেশ দেয়া হয়। বুঝা গেল, ইহরাম অবস্থায় নিজের সাথে স্ত্রী থাকার হুকুম সুগন্ধি ও পোশাকের পর্যায়ভুক্ত, শিকারের মত নয়। কাজেই ইহরাম বাঁধার পর সে মহিলাকে নতুন ভাবে আকদ করে অর্জন করার হুকুমও

সুগন্ধি ও পোশাকের মত হওয়া উচিত, শিকারের মত নয়। বরং ইহরাম অবস্থায় যেরূপভাবে নতুনভাবে সুগন্ধি, পোশাকের মালিক হওয়া সহীহ, এরূপভাবে নতুনভাবে কোন রমণী অর্জন অর্থাৎ, বিয়ের আকদও সহীহ হওয়া উচিত। যুক্তির দাবি তাই।

فقالَ قائلٌ فقدْ رأينَا مَن تزوَّجَ اختَه مِن الرضاعةِ كانَ نكاحُه باطلاً ولو اشتَراها كانَ شراؤُه جائزًا فكانَ الشرٰى يجوزُ اَن يعقَدَ علٰى مَالايحلُّ وطيُه والنكاحُ لايجوزُ ان يعقِدَ الا علٰى مَن يحلُّ وطيُها وكانتِ المرأةُ حرامًا على المحرمِ جماعُها،فالنظرُ علٰى ذالكَ ان يُحرَّم عليهِ نكاحُها ـ

فكانَ مِن الحجةِ للأخرينَ عليهِم فِى ذٰلكَ اَنا رأينَا الصائمَ والمعتكفَ حرامٌ على كلِّ واحدٍ منهمَا الجماعُ وكلٌّ قداَجمعَ اَن حرمةَ الجماعِ عليهِمَا لايمنعُهمَا مِن عقدِ النكاحِ لِانفسهمَا اِذ كانَ ماحرَّم الجماعَ عليهِما مِن ذالكَ اِنما هُو حرمةُ دينٍ كحرمةِ حيضِ المرأةِ الذىْ لايمنعُها مِن عقدِ النكاحِ على نفسِها-فحرمةُ الاحرامِ فِى النظرِ كذٰلكَ وقَد رأينَا الرضاعَ الذىْ لايجوزُ تزويجُ المرأةِ لِمكانه اِذا طرأَ على النكاحِ فسخَ النكاحُ فكذالكَ لايجوزُ استقبالُ النكاحِ عليهِ وكانَ الاحرامُ اذا طرأَ على النكاحِ لم يفسخْه، فالنظرُ على ذٰلكَ ايضًا ان يكونَ لايمنعُ استقبالَ عقدِ النكاحِ وحرمةُ الجماعِ بالاحرامِ كحرمتِه بالصيامِ سواءٌ، فاذَا كانتْ حرمةُ الصيامِ لاتمنعُ عقدَ النكاحِ فكذالكَ حرمةُ الاحرامِ لاتمنعُ عقدَ النكاحِ ايضًا، فهٰذا هوَ النظرُ فِى هٰذا البابِ وهوَ قولُ ابىْ حنيفةَ وابى يوسفَ ومحمدٍ رحمَهم اللهُ تعالٰى ـ

**একটি প্রশ্ন ও এর উত্তর ঃ**

প্রশ্ন হতে পারে, দুধ বোনের সাথে সহবাস করা হারাম। অতএব, যদি কেউ স্বীয় দুধ বোনকে বিয়ে করে, তবে তার এই বিয়ের আকদই বাতিল। কিন্তু যদি

তাকে কেউ ক্রয় করে, তবে এই ক্রয় সহীহ। বুঝা গেল, যে রমণীর সাথে সহবাস হারাম, তাকে ক্রয় করা সহীহ, কিন্তু বিয়ে করা সহীহ নয়। বস্তুতঃ মুহরিমের জন্য স্ত্রী সহবাস করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। অতএব, উপরের মূলনীতির আলোকে এই মুহরিমের জন্য কোন মহিলাকে ক্রয় করা তো সহীহ হতেই পারে, কিন্তু বিয়ে করা সহীহ হতে পারে না। যদি কেউ করে, তবে আকদই বাতিল হবে। কাজেই ইহরাম অবস্থায় কোন মহিলাকে ক্রয় করা সহীহ হলে এর উপর বিয়ের কিয়াস করা যায় না।

**উত্তর॥** ১. 'যে অবস্থায় সহবাস করা হারাম, এ অবস্থায় বিয়ে করাও হারাম'-এই মূলনীতি সহীহ নয়। কারণ, রোযাদারের জন্য রোযা অবস্থায় এবং ইতিকাফকারীর জন্য ইতিকাফ অবস্থায় সহবাস করা হারাম। কিন্তু কোন মহিলাকে বিয়ে করা হারাম নয়, বরং সর্বসম্মতিক্রমে সহীহ। এরূপভাবে মাসিক অবস্থায় কোন স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হারাম, কিন্তু তাকে বিয়ে করা হারাম নয়, বুঝা গেল সহবাস হারাম হলেও বিয়ে হারাম বা বাতিল হওয়া আবশ্যক হয় না। কাজেই ইহরাম অবস্থায় সহবাস হারাম হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে সহীহ হয়ে যাবে।

২. দুধবোনকে বিয়ে করা হারাম। কিন্তু দুগ্ধ দানের এ বিষয়টি বিয়ের পর কোন মহিলার মধ্যে পাওয়া গেলে, যেমন বিয়ের সময় এ মহিলা ছিল পরনারী, কিন্তু পরবর্তীতে কোন কারণে এই মহিলা এই স্বামীর দুধ বোন বা মা হয়ে গেছে, তবে তৎক্ষণাৎ এই বিয়ে রহিত হয়ে যায়। এর পরিপন্থী ইহরাম। কারণ, যদি সে ইহরাম বিয়ের অবস্থায় হয়, যেমন কোন বিবাহিত ব্যক্তি ইহরাম বাঁধল, তবে এর ফলে তার বিয়ে ছুটে যায় না। কাজেই বিয়ে অবস্থায় দুধ পানের বিষয়টি যুক্ত হলে যেহেতু বিয়েকে রহিত করে দেয়, সেহেতু নতুনভাবে বিয়ে করলেও সে দুগ্ধ পান প্রতিবন্ধক হয়ে যাবে। কিন্তু বিয়ে অবস্থায় ইহরাম যুক্ত হলে, যেহেতু বিয়ে রহিত হয় না, তাই নতুনভাবে বিয়ে করলেও সেটি ইহরামের জন্য প্রতিবন্ধক হবে না। অতএব, দুধ পানের উপর ইহরামকে কিয়াস করা ঠিক হবে না। সারকথা, ইহরাম অবস্থায় বিয়ের আকদ করা সহীহ। যুক্তির আলোকে তাই প্রমাণিত হয়।

–বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নুখাবুল আফকার ঃ ৭/২৪৫, ২৪৬, আওজাযুল মাসালিক ঃ ৩/৩৯৯, উমদাতুল ক্বারী ঃ ১০/১৯৫, মাআরিফুস সুনান ঃ ৬/১১১, নায়লুল আওতার ঃ ৪/২৩৩, নববী ঃ ১/৪৫৩, তিরমিযী ঃ ১/১৭২, বযলুল মাজহুদ ঃ ৩/১৩৪, মুগনী ঃ ৩/১৫৮, ঈযাহুত তাহাভী ঃ ৩/৬৪০-৬৫০।

---